বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

(প্রথম খণ্ড)

(শাস্ত্র ও রাজনীতি)

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত বি, এ

(পেনসনপ্রাপ্ত পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, ত্রিপুরা ষ্টেট্)

মূল্য—দেড় টাকা।

উৎসর্গ

মদীয় ইষ্টদেবীর

শ্রীশ্রীচরণ কমলে—

গ্রন্থকারের নিবেদন

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর জীবন-সমস্যার সমাধান বিষয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানের ব্যর্থতা অনুভব করিয়া, আমাদের শাস্ত্রে এ বিষয়ে কি সমাধান আছে, তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে আমি প্রথম শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করি। গত দশ বার বৎসর যাবৎ আমার অন্তর হইতে এক মহাশক্তি যেন আমাকে প্রেরণা দিয়া "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" লিখাইয়াছেন। এই মহাশক্তির প্রভাবেই সহসা অনুভূতি জন্মিল যে জগতের রাজনৈতিক সমস্যায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের স্থান কোথায়, তাহা নির্ণয় না হইলে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য নির্ণয় হইবে না। এই চিন্তামূলেই সর্ব্বপ্রথম শাস্ত্রের সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বাহির করা গেল। শাস্ত্রের সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ ভুলিয়া যাওয়ায়ই আমরা আজ অধঃপতিত হইয়াছি। গ্রন্থকারের ন্যায় ক্ষুদ্র মনুষ্যের পক্ষে এই চেষ্টা ভেলা দ্বারা সাগর লঙ্ঘনের চেষ্টার ন্যায় হইলেও যিনি এই চেষ্টার প্রেরণা দিয়াছেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহারই কার্য্যজ্ঞানে সুধী পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম। যিনি সর্ব্বভূতে বুদ্ধি-রূপিণী হইয়া এই দেশে সর্ব্বমঙ্গলা নারায়ণী শক্তি নামে প্রসিদ্ধা, তিনি সকলের মঙ্গল করুন।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

প্রথম অধ্যায়

ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কনভেনসন

আজ কাল হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্ম্ম সে-কালের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, মুসলমান ধর্ম্ম ও খৃষ্টান ধর্ম্ম পর্য্যন্ত সভ্যতার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। একটা কথা উঠিয়াছে যে, মানুষের জীবনসংক্রান্ত কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের কোনও সম্পর্ক নাই। সমাজের সহিত ধর্ম্মের সংশ্রব নাই। ব্রাহ্ম সমাজ যখন সাকার উপাসনার নিন্দা আরম্ভ করেন, তখনও তাঁহারা মানবজীবনকে একটা স্বেচ্ছাচারী জীবনস্বরূপ গড়াইবার চেষ্টা করেন নাই; তাঁহারাও নীতি বা Moralityকে উচ্চস্থান দিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি প্রত্যেক সমাজই নীতিকে উচ্চ স্থান দেন; কিন্তু আজ কাল ইহার সেই স্থান নাই। সকলেই বলেন যে, নীতি বা Morality মানব-সৃজিত Convention মাত্র। এই মত আজিকালিকার জগতে এইরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, ইহা দ্বারা সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা গুরুতর সামাজিক পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িতেছে। নীতি একটা সুবিধা অসুবিধার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অসুবিধার স্থলে কেন নীতি পালন করিব, ইহাই হইল আজিকালিকার প্রশ্ন। ফলে, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রত্যেক সমাজেই একটা

গুরুতর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ভাল-মন্দ বিচার আজ কাল ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির উপরই হইতেছে, পিতৃ-পিতামহ-ক্রমাগত ভাবরাশির উপর হয় না। এতদ্দেশে সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্ম সমাজই ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির উপর সমাজপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ছিলেন। ইহার উপর দাঁড়াইয়াই তাঁহারা নিজেদের চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহারা বিস্মিত নেত্রে দেখিতেছেন যে, এইরূপ দুর্ব্বল ভিত্তির উপর Morality আর টিকিতেছে না।

মানুষ নিজের সুবিধা অসুবিধা অগ্রে দেখে। তার পর যদি নীতি টিকিয়া যায় তবে ভাল, অন্যথা নীতি পরিত্যাজ্য বলিয়াই সাব্যস্ত হয়। মানব-স্বভাবের এই উন্মার্গগামী প্রবৃত্তি সাধারণতঃই তাহাকে চরিত্রহীন করিতে চাহে। তদুপরি এই প্রবৃত্তি যদি একটা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে আর ইহা কোনও বাধা মানে না। এই জন্য আজ-কাল চরিত্রের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। খৃষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ-মতাবলম্বী চীন-জাপান এই Convention-মতাবলম্বীদিগের নিকট পরাজিত হইয়া সময়ের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন—সভ্যতাকে আলিঙ্গন করিয়া নীতি ও ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এখন জগতে স্বার্থ ব্যতীত কোনও কর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই।

যদিও বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজ এই Convention-মতাবলম্বীদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছেন, তথাপি হিন্দুসমাজ এখনও সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান। এখনও সমাজের কতিপয় উচ্চশ্রেণীর লোক ও সমগ্র নিম্ন শ্রেণীর লোক ধর্ম্মকে মানিয়া চলে। কিন্তু ক্রমে ইহার বন্ধন দুর্ব্বল হইতেছে; নব্যেরা বলেন যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে না চলিলে, হিন্দু সমাজ নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে। কিন্তু নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে অর্থ যে কি, তাহা বুঝা যায় না। যদি সময়ের স্রোতে গা ঢালিয়া

দেওয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দু আর হিন্দু থাকিবে কি? যদি না থাকে, তবে নিষ্পেষণ কি গা ঢালিলে হইবে, অথবা গা না ঢালিলে হইবে? ইহা কি তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? যাহা হউক, ইঁহারা সময়ের স্রোতে গা ঢালিয়াই চলিয়াছেন।

ইঁহাদের মধ্যেও যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারাও প্রত্যেকেই সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রাচীনে নূতনে মিশাইয়া একটা কিছু করার চেষ্টায় আছেন। এই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও নীতির পরিবর্ত্তনীয়তা সম্বন্ধে নীরব। হয়ত, পাশ্চাত্য তর্কবাদাদি-পাঠে ইঁহারা এই বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই; হয়ত তাঁহারাও মনে করেন, যে সময়ানুসারে যতটুকু পারা যায়, ততটুকুই নীতি রক্ষা করিব। যাহা রক্ষা করা যায় না, তাহা পরিবর্ত্তনশীল বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

এইরূপে আজ-কাল হিন্দু সমাজ আর হিন্দু সমাজ নাই। অধিকাংশ লোকই শাস্ত্র মানে না; সকলেই সুবিধাবাদী। অনেকেই মনে করেন যে, ম্লেচ্ছ একটা জাতি; কিন্তু শাস্ত্রকারগণ তাহা বলেন না। যথা:—

"গোমাংসঃখাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহু-ভাষতে।
সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥"

প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব, রঘুনন্দন।

অনুবাদ:—যাঁহারা গোমাংসভোজী এবং বিরুদ্ধ-ভাষী অর্থাৎ যাঁহারা আজ এক কথা এবং কাল আর এক কথা বলিয়া অনবরত পরস্পরবিরোধী কথা বলেন এবং শাস্ত্রকে অমান্য করিয়া সর্ব্বাচারবিহীন হন তাঁহাদিগকে 'ম্লেচ্ছ' এই অভিধানে অভিহিত করা যায়।

বস্তুতঃ, এইভাবে দেখিতে গেলে, আজ-কাল দেশ ম্লেচ্ছে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেবল যে নব্যতন্ত্রীই ম্লেচ্ছ হইয়াছেন, এমন নহে। প্রাচীন-

তন্ত্রীর ভিতরেও ম্লেচ্ছত্ব প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। সকলে অবশ্য গোমাংস ভক্ষণ করেন না; কিন্তু শাস্ত্রবিহিত আচার কেহই এখন সম্পূর্ণ পালন করিতে পারেন না এবং গোখাদকের সংস্রব এখন অনিবার্য্য। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার দরুণ যান-বাহনের পরিবর্ত্তন ও ম্লেচ্ছ-সংস্রবের অবশ্যম্ভাবিতার দরুণ এখন আচার-পালন অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এদিকে প্রাচীন সমাজ বলিতেছেন, ইহা ঘোর কলিকাল। এই সময়ে যাহা হইতেছে, তাহা পুরাণাদি শাস্ত্রেই লিখিত আছে। ইহার গতিরোধ করা মানবের অসাধ্য। যিনি করিবেন, তিনি কল্কীরূপে অবতীর্ণ হইবেন। এই সময়ের অনেক বিলম্ব। অতএব এখন নিশ্চেষ্ট থাকিয়া, যাহা হইতেছে তাহা নিরাপত্যে হইতে দেওয়াই ভাল।

ইঁহাদের কথাতে এই মাত্র বুঝা যায় যে, ইঁহারা নীতিকে অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া মনে করেন বটে; কিন্তু বাধ্য হইয়া তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহাতে পাপ থাকিলেও তাঁহারা ইহা এড়াইতে পারেন না। এই জন্য যদি পরকালে কষ্টভোগ করিতে হয়, তবে তাহা অপরিহার্য্য। এইরূপে তাঁহারা নব্যদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিতেছেন এবং নিজের নিকট নিজে পাপী সাব্যস্ত হইতেছেন। ইঁহাদের অন্তরে আঘাত দিতে কেহ দৃকপাত করেন না, এমন কি আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেকেই ইঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলেন। নব্যগণের বল এই যে, সময় ইঁহাদের অনুকূল। এখন 'সময়' শব্দের অর্থ কি, একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। শাস্ত্রকারগণ বলেন :—

"রাজা কালস্য কারণম্"—কথাটা সহসা বুঝা যায় না। শাস্ত্রকারগণ সংক্ষিপ্ত কথাই ভালবাসেন। এদিকে আমরা না বুঝিয়া, তাঁহাদের গালাগালি দিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করি। বাস্তবিক একটু প্রণিধান

করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, 'সময়' শব্দের অর্থ রাজশক্তি-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্ম্ম ও ভাবমূলক সময়। 'রাজশক্তি' কথা দ্বারা আমি যে কেবল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইতেছি, তাহা নহে। যে সকল রাজশক্তির সমবেত চেষ্টা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট চিন্তাস্রোতঃ সৃষ্টি করিয়া জগৎকে তাহার অনুসরণ করাইতেছে, সেই সকল রাজশক্তিকেই আমি রাজশক্তি বলি। এই সকল রাজশক্তি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। (১) যাঁহারা Capitalism প্রতিষ্ঠা করিয়া তদাহৃত অর্থ-দ্বারা জগৎকে Science নামক অদ্ভুত পদার্থ দান করিয়াছেন। (২) যাঁহারা এই Capitalismকে ধ্বংস করিয়া, তাহার স্থলে ধনের উপযুক্ত বণ্টন প্রতিষ্ঠাক্রমে জগতের দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা করিতেছেন। এই উভয় প্রকার রাজশক্তিই ধর্ম্মের কোনও অপেক্ষা রাখেন না। প্রত্যেকেই কেবল মানবের সুবিধা অসুবিধা দেখাইতেছেন। উভয় মতেই সমাজ ও রাজনীতি (Society and Politics) নীতি বা ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন। উভয়েই আবার সময়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। কারণ এতদুভয় শক্তিকে অবলম্বন করিয়া কাল ধীর পদবিক্ষেপে চলিতেছে। প্রতিদিন সূর্য্য উঠে আর এই দুই রাজশক্তি জগতে এক একটা নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই সকল নূতন কার্য্য নাটকের পট-পরিবর্ত্তনের ন্যায় জগতের সমক্ষে এক একটা নূতন দৃশ্য উপস্থাপিত করে এবং মানব তাহার দিকে চাহিয়া আর মস্তিষ্ক স্থির রাখিতে পারে না। প্রত্যেক নূতনত্বের মধ্যে এমন এক একটা মাদকতা আছে, যাহা মানবকে নেশায় বিভোর করিয়া ফেলে এবং তাহারই ফলে সে পরিবর্ত্তনটাকেই আলিঙ্গন করিতে চায়। এই পরিবর্ত্তনশীলতাই ধর্ম্মের নিত্যতা বা অপরিবর্ত্তনীয়তাকে ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায় এবং ইহাতেই ধর্ম্ম এবং নীতি বস্তুটী মানববুদ্ধি-প্রসূত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া পরিবর্ত্তনশীল সাব্যস্ত

হয়। সুতরাং ধীর ভাবে চিন্তা করিলে ইহাই বুঝা যাইবে যে, রাজশক্তি মানবকে যে ভাবে চালায়, মানব সেই ভাবেই চলে। কারণ, মানবের অসংখ্য স্বার্থরাশি এই পরিচালক রাজশক্তির সহিত জড়িত। সকলেই জানেন যে, স্বার্থ মাত্রই কামনামূলক। এই অবস্থায় মানব যখন বুঝে যে, নীতি ও ধর্ম্মকে বলি দিলেই কাম্যবস্তু লাভ করিতে পারিবে, তখন নীতি ও ধর্ম্ম তৎক্ষণাৎ বলি পড়িয়া যায়। এইরূপে প্রবল রাজশক্তি-মাত্রেই মানব-বুদ্ধিকে চালনা করিয়া স্বীয় ইচ্ছানুরূপ কার্য্যসিদ্ধি করে এবং তাহাতেই কালের সৃষ্টি হয়। তাই বলিতেছিলাম যে, নব্য-তন্ত্রিগণ যে প্রাচীনদের উপেক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহা তাঁহাদের নিজের বলে নহে, রাজশক্তি-প্রতিষ্ঠিত প্রবল কালের বলে। তাঁহারা জয়লাভ করিতেছেন বলিয়াই যে তাঁহাদের কথার মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। কথার মূল্য এই পর্য্যন্ত যে, ইহারা রাজশক্তি-প্রতিষ্ঠিত চিন্তা-স্রোতের দাস। এই দাসত্ব দেখা যায় না, অনুভব করা যায় মাত্র। একটু ভিতরে প্রবেশ না করিলে অনুভবও করা যায় না। মনে হয়, একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মত অবলম্বন করিয়াই বুঝি চলিতেছি। কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, একটা শক্তি তাহার সার্ব্বজনীন ক্রিয়া-প্রভাবে প্রত্যেকের জীবনের ঘটনাবলীকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করিয়াছে যে, তাহার চাপেই সকলকে ঐ শক্তির অনুগামী হইতে হইতেছে। তুমি আঘাত পাইলে, রাজদ্বারে বিচার চাও, ঘাটে ঘাটে টাকা খরচ কর। ইহা কি তুমি এড়াইতে পার? ছেলেপিলে শিক্ষিত না হইলে, চাকুরী পায় না; মেয়ে শিক্ষিতা না হইলে, পাস-করা বর পাওয়া কঠিন। এই শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলেও, তুমি কি তাহা এড়াইতে পার? তদ্রূপ আহার-বিহারের নিয়ম-রক্ষাও এই শক্তির আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্যের উপর নির্ভর করে।

ক্রমে অভ্যাসবশতঃ ভাবরাশিও তদ্রূপ হইয়া পড়ে। যেখানে খাঁটী দুধ পাওয়া যায় না, সেইখানে অভ্যাস-হেতু ক্রমে জল-দেওয়া দুধ ব্যতীত হজম হয় না। সুতরাং ক্রমে মনে হয় যে, খাঁটী দুধ মানব-খাদ্যের অনুপযোগী। খাঁটী দুগ্ধের অভাব আজিকালিকার বন্দোবস্তের ফল। কাজেই মানবের ভাবরাশিও সেই বন্দোবস্তের অনুগমন করিতেছে।

বস্তুতঃ, মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকলেই শক্তিমানের ভাবের অনুগামী হয়। এক সময়ে মুসলমান পৃথিবীতে শক্তিমান্ ছিল। তখন মুসলমানী ভাব, মুসলমানী কায়দা, মুসলমানী আদব জগতে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন মুসলমান সময় সৃষ্টি করিয়াছে, আজ তাহা নাই; কিন্তু এখন ইউরোপ ও আমেরিকা পৃথিবীতে ভাব ছড়াইতেছে। ইহাদের ভাবই জগৎ গ্রহণ করে কেন? কারণ, ইহারা শক্তিমান্। আর আমাদের ভাব গ্রহণ করে না কেন? কারণ, আমাদের শক্তি নাই। কিন্তু সত্য সকল সময়ে শক্তির আশ্রয়ে থাকে না। যখন সত্য ও শক্তি একত্র হয়, তখন জগৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যখন মিথ্যা ও শক্তি একত্র হয়, তখন মিথ্যাই জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং শক্তিই সত্য মিথ্যা উভয়ের প্রতিষ্ঠাতা। নব্যতন্ত্রিগণ আজ যে প্রাচীন-তন্ত্রিগণকে পরাজিত করিতেছেন, শক্তিমানের আনুকূল্যই তাহার কারণ। একটী ষ্টীমার যেমন দুই চারিটী ফ্ল্যাটকে অবাধে টানিয়া লইয়া যায়, নব্যতন্ত্রিগণ প্রাচীন-তন্ত্রিগণকে তদ্রূপই টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। প্রাচীনতন্ত্রিগণ ঘোর কলি ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট ও জড় পদার্থের ন্যায় আচরণশীল। শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই; যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, তাহাকে রক্ষা করার যোগ্যতা বা উদ্যম কিছুই নাই—কেবল ইতর প্রাণীর ন্যায়

একটা জীবিতাকাঙ্ক্ষা লইয়াই তাঁহারা ভারবহ দুর্ব্বিসহ জীবনযাপন করিতেছেন। আর নব্যতন্ত্রিগণ শক্তিমানের মতানুকূল্য পাইয়া তাহারই অনুগামী হইয়া ভাবিতেছেন, আমরা খুব বাহাদুর। কিন্তু ভিতর খুঁজিলে কেবল স্বার্থের পূতিগন্ধ এবং মনুষ্যত্বের আত্মবিক্রয় ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যাইবে না। ইহা-দ্বারাই ধীরে ধীরে কালের সৃষ্টি হইতেছে। শক্তিমান্ যে স্রোতঃ বহাইয়া দিয়াছেন, নব্যতন্ত্রী তাহারই অনুকূলে সাঁতার কাটিয়া 'জয়-জয়' ধ্বনি করিতেছেন। আর প্রাচীন-তন্ত্রী স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটিলে শ্রান্ত হইয়া ডুবিয়া যাওয়ার ভয়ে নব্যতন্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। সুতরাং কেহই নীতি বা ধর্ম্মের কোনও অপেক্ষা রাখিতেছেন না। উভয় পক্ষ কর্ত্তৃকই নীতি ও ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ হইতেছে। তবে প্রাচীন-তন্ত্রিগণ পাপকে পাপ বলিয়া স্বীকার করেন, কুকার্য্যকে গোপন করার চেষ্টা করেন; পক্ষান্তরে, নব্যতন্ত্রী পাপকে পাপ বলিয়া স্বীকার করেন না। যে জন্য প্রাচীনতন্ত্রী লজ্জিত, নব্যতন্ত্রী সেইজন্য গর্ব্বিত। তাঁহারা বলেন, পাপ-পুণ্য নাই, সুতরাং লজ্জার কোনও কারণও নাই। এইরূপে এক দল বাধ্য হইয়া এবং এক দল জোর করিয়া যাহা করিতে নাই তাহা করেন এবং সময়ের স্রোতে যাইয়া একই সমতল ক্ষেত্রে দাঁড়ান। নব্যতন্ত্রী তার্কিকগণ সময়ের এই অবস্থা দেখিয়াই বলেন যে, ধর্ম্মের সহিত সমাজ ও রাজনীতির কোনও সম্বন্ধ নাই এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনও সনাতন সত্য নাই।

যদি বুঝিতাম যে, এইরূপ মতের দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রে কোনও অনিষ্ট হয় না, পরন্তু সমাজের উন্নতি হয়, তাহা হইলে মনে করিতাম যে, ইহা একটী নির্দ্দোষ মতবাদ মাত্র। কিন্তু তাহা নহে। ইহাতে দেশে যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, তাহাতে যাঁহারা সময়ের সঙ্গে চলেন তাঁহারা

যেমন দুঃখ পাইতেছেন, যাঁহারা সময়ের সঙ্গে চলিতে পারেন না তাঁহারাও তেমন দুঃখ পাইতেছেন। মোটের উপর, প্রত্যেকের ভিতরেই আজ অশান্তি। প্রত্যেকেই অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছেন যে, আজ দেশের যে সমস্যা আসিয়াছে তাহার একটা সমাধান আবশ্যক। এমন কি, য়ুরোপ আমেরিকাও আজ এই সমস্যা লইয়া ব্যস্ত। তথায় আজ অন্ন-সমস্যা ও বেকার-সমস্যা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক যত সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার প্রত্যেকটির মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, একটা ঘোর অশান্তি ও অসন্তোষ জগৎকে অনবরত জ্বর-রোগীর ন্যায় পিপাসায় অধীর করিয়া রাখিয়াছে।

এখন জিজ্ঞাসা করি, এই অশান্তির কি কোনও অর্থ নাই? তুমি বলিবে, ইহার অর্থ ক্রমোন্নতি। কিন্তু পূর্ণিমার পর যখন ধীরে ধীরে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার ঘনীভূত হইতে থাকে, তখন কি তুমি ইহাকে শুক্লপক্ষ বলিবে? যদি তাহা না বল, তবে ইহাও ক্রমোন্নতি নহে। অশান্তি কখনও ক্রমোন্নতির লক্ষণ হইতে পারে না। ইহা ক্রমাবনতির লক্ষণ। ধীরে ধীরে জগতে যখন শান্তি আসে, তখন ইহার ক্রমোন্নতি হয় এবং যখন ইহাতে অশান্তি আসে, তখন ইহার ধ্বংস ও ক্রমাবনতির সূচনা করে। শান্তি ধর্ম্মের ফল এবং অশান্তি অধর্ম্মের ফল। এই কারণে নব্যতন্ত্রী যখন গর্ব্বভরে বলেন যে, জগতে কোনও ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা নাই, তখন ইহার অশান্তিই তাঁহার এই বাক্যের দোষ দেখাইয়া বলিয়া দেয় যে, মূঢ়! তুমি তমঃ-সাগরে ডুবিয়া ভালমন্দ কিছুই বুঝিতেছ না। একবার স্থির ভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে জগৎকে দেখিতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে বুঝিবে যে, জগতে ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বহু কথা ও এক কথা—বহু কথা ম্লেচ্ছের লক্ষণ এবং এক কথা আর্য্য-লক্ষণ

প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, ম্লেচ্ছ একটা জাতি নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আজকাল যাহাকে জাতি (Nation) বলা হয়, ম্লেচ্ছ-জাতি বলিতে তাহা বুঝায় না। যাঁহারা আমাদের বর্ণাশ্রমের গণ্ডীর ভিতরে ছিলেন না, তাঁহাদিগকেই আমাদের শাস্ত্রকারগণ ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করিয়াছেন। রঘুনন্দন সত্যই বলিয়াছেন যে, পরস্পর-বিরোধী বহু কথা বলা ইহাদের লক্ষণ। মানুষ যখন জীবনকে সংগ্রাম মনে করে, তখন তাঁহাদের জীবন-সংগ্রামে জয়-পরাজয় উভয়ই হইয়া থাকে। এই জয়-পরাজয় উপলক্ষেই ইহারা পরস্পর-বিরুদ্ধ বহু কথা বলে। প্রথমতঃ, তাহারা জয়ের আশায় উৎসাহিত হইয়া নিজের দলে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য যে সকল কথা বলে, পরাজয়ের পর সেই সকল কথার মূল্য থাকে না। তখন আবার এই কথার বিরোধী অথচ আশ্বাসপ্রদ অন্য কথা তাহাদিগকে বলিতে হয়। এইরূপে নিজের দলে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্যই পাশ্চাত্য জগতে ফিউড্যালিজম্, ক্যাপিটেলিজ্‌ম্, ফ্যাসিজম্ ও কমিউনিজম্ প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেকটি মতবাদ অপর মতবাদের বিপরীত। ফিউড্যালিজ্‌ম্ একাধিপত্য চাহে এবং ক্যাপিটেলিজম্ জনমতের আধিপত্য চাহে। ফ্যাসিজম্ একাধিপত্য চাহে এবং কমিউনিজম্ জনমতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যেকটি মতবাদের লোকাকর্ষণ-শক্তি নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটী নূতন

মতবাদের উৎপত্তি হইয়া পুরাতন মতবাদকে নষ্ট করিয়া দেয়। ইহাতে যদিও ম্লেচ্ছ দেশের মনুষ্যগণ তাঁহাদের ক্রমোন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে করেন, তথাপি একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, যাঁহারা পুরাতন মতবাদ ছাড়িয়া নূতন মতবাদ গ্রহণ করেন, তাঁহারা একমুখে পরস্পর-বিরোধী দুই কথা বলেন। এইরূপে একই মনুষ্য পূর্ব্বে যাহাকে সত্য মনে করিত, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করে এবং তন্মূলে সত্যের নিত্যতা অস্বীকার করে। আবার প্রাচীন মতবাদের সহিত নূতন মতবাদের যে বিরোধ হয়, তাহাতে ভ্রাতা ভ্রাতার কণ্ঠচ্ছেদ করে এবং স্বদেশপ্রেমের গোড়ায় আগুন জ্বালাইয়া দেশবাসী নরনারী ও শিশুবর্গের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করে। ফলে দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্গুণ নষ্ট হইয়া ইহারা ক্রূর কর্ম্মে এমন অভ্যস্ত হয় যে, ইহাদের ভিতরে মানব-হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। সকলেই মনে করে যে, সত্যাদি ধর্ম্ম একটী লোকাচার মাত্র। এই কারণে এই জগতে ধর্ম্মের কোনও নিত্যতা নাই এবং একটা লোকাচার-মূলেই জগৎ চলিতেছে। ইহাই রঘুনন্দনকথিত পরস্পর-বিরোধী বহু কথা।

আজকাল এই দেশের জাতীয় আন্দোলন উপলক্ষেই নেতৃবৃন্দের মুখে এইরূপ অনেক কথার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, তাঁহারা বলিলেন যে, তোমরা যদি সকলে মিলিয়া দেশে আইনসঙ্গত আন্দোলন কর, তাহা হইলে দেশ স্বাধীন হইয়া যাইবে। দেশ তাহা আরম্ভ করিল; ফল কিছুই হইল না। তখন আর এক দল বলিল যে, ইহাতে কিছুই হইবে না; বল-প্রকাশের প্রয়োজন আছে। ইহাতে দেশে উগ্র কর্ম্ম (Violence) আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য যে, ইহাই পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা। কিন্তু ইহাতেও দেশ স্বাধীন হইল না। তখন বহু কথা আরম্ভ হইল। কেহ বলিলেন যে, এই উগ্রকর্ম্মাগণের দোষেই দেশের সর্ব্বনাশ

হইয়াছে। অতএব এই সকল উগ্রকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আবার আইন-সঙ্গত আন্দোলনের পথে চল। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইল না। অনেকেই বলিলেন যে, "ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ।"

এইরূপে পরস্পর-বিরোধী বহু কথা হইয়া শেষে ইহাই স্থির হইল যে, শান্তির পরিবর্ত্তে যুদ্ধই গ্রহণীয়; কিন্তু তাহা চিরন্তন ও গতানুগতিক যুদ্ধ নহে। একটা নূতন প্রণালীর যুদ্ধ করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে স্তম্ভিত করিতে হইবে এবং বুঝাইতে হইবে যে, যুদ্ধের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া জগৎ এখন ক্রমোন্নতির পথে চলিয়াছে। জগৎ যখন এই পথ গ্রহণ করিবে, তখন শান্তির ভিতরে থাকিয়াই মানবের বিবাদ-বিসম্বাদ প্রভৃতি কার্য্য চলিবে, কেহ কাহারও গায়ে একটা আঁচড়ও দিবে না। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দেশ এই কথা গ্রহণ করিল; কিন্তু জগতের উন্নতির লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। সধবার স্বামী কারারুদ্ধ হইলেন, বিধবা পুত্রহীনা হইলেন, অনেকেরই হাত পা ভাঙ্গিল এবং কারাগার সাধু-ইচ্ছা-সম্পন্ন অথচ এই ভ্রান্তিমূলক স্বপ্ন দ্বারা আবিষ্ট কতকগুলি ভ্রান্ত নরনারীতে পূর্ণ হইয়া গেল। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে মানুষ যেমন পুনঃ পুনঃ রজ্জুর উপরই আঘাত করিয়া, প্রভাতে উঠিয়া দেখে যে, ইহা রজ্জু, তদ্রূপ এই ভ্রান্ত মনুষ্যগণ দেখিলেন যে, যুদ্ধের এই সুচিন্তিত অভিনব প্রণালীটি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে! তখন কথা উঠিল যে, এই দেশের কিরূপে উদ্ধার হইবে? এখানে অস্পৃশ্যতা মানুষকে উন্নত হইতে দেয় না; এমন কি, দেবপূজাতে যোগদান পর্য্যন্ত করিতে দেয় না। সর্ব্বোপরি, জাতিভেদ ইহাতে অনন্ত ভেদের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থায় কোনও প্রণালীই ইহাকে অবস্থান্তর করিতে পারিবে না। কিন্তু যাঁহারা এই সকল কথা বলিলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, অস্পৃশ্যতা এদেশে নূতন নহে। জাতিভেদও এদেশে নূতন নহে। এই অবস্থায়

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দ্বারা যে তাঁহাদের সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইবে এবং যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইবে, তাহা চিন্তা করিয়াই তাঁহাদের কার্য্যারম্ভ করা উচিত ছিল। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এই কথা আদৌ চিন্তা করেন নাই। ফলে, যাহা পূর্ব্বে বুঝা উচিত ছিল, তাহা পরে বুঝিয়া এখন পূর্ব্ব-কথার বিপরীত কথা তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, অসহযোগ ও আইন-অমান্য-আন্দোলন ইত্যাদি করিলে দেশে নিশ্চয়ই স্বরাজ আসিবে। কিন্তু এখন বলিতেছেন, তাহা হইবে না। কারণ, দেশের সমাজ-ব্যবস্থা ইহার বাধা। বলি, ইহা তোমরা পূর্ব্বে বুঝিলে না কেন? বস্তুতঃ, ইহাই ম্লেচ্ছবুদ্ধিমূলক বিরুদ্ধ বহুভাষা। ম্লেচ্ছ কখনও মানবপ্রকৃতিকে তলাইয়া বুঝিতে পারে না। এইজন্য আমাদের সমাজের সহিত ম্লেচ্ছ-সমাজের তফাৎ কোথায়, তাহা আমাদের আর্য্যবংশসম্ভূত ম্লেচ্ছগণও বুঝিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, মানব-সমাজ যখন চিরকালই জীবন-সংগ্রাম-নীতিতে চলিয়া আসিয়াছে, তখন এমন একটা বৃহৎ স্বার্থের জন্য হিন্দুসমাজ মুসলমান সমাজের সহিত এক হইবে না কেন? আবার হিন্দুই বা এইরূপ গুরুতর স্বার্থের ক্ষেত্রে নিজের জাতিভেদ ভুলিয়া এক হইবে না কেন? বস্তুতঃ, এইখানেই ইঁহাদের ভুল। তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া ম্লেচ্ছজাতির চিন্তাস্রোতের দাস হইয়াছেন। কাজেই তাঁহারা আমাদের সমাজের ভিত্তি কোথায়, তাহা চিন্তা করিতে অক্ষম হইয়া, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দ্বারা যে সমাজে নীতি-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। ফলে, পরস্পর-বিরুদ্ধ বহু কথা বলিয়া তাঁহারা নিজের ম্লেচ্ছত্বেরই পরিচয় দিতেছেন।

বস্তুতঃ, ম্লেচ্ছত্ব বস্তুটাই জীবন-সংগ্রাম-বুদ্ধিমূলক। এইজন্য ইহা চরিত্রগত। ইহা নেশনগত নহে। তথাপি, আমরা ম্লেচ্ছকে একটা

জাতি বলি ; কারণ, ইহারা বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত। মানুষ যখন জীবনকে সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করে, তখনই তাহার সত্যাদি ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া একমুখে বহু-কথা বলার কারণ হয়। ইদানীং জাতিসঙ্ঘ আবিসিনিয়ার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই ইহার প্রমাণ। জীবনসংগ্রামবুদ্ধি মানুষকে একই নীতিতে স্থির থাকিতে দেয় না এবং যাহা আপাততঃ সুবিধাজনক তাহা গ্রহণ করাইয়া, মানুষকে একমুখে পরস্পর-বিরোধী বহু কথা বলায়। কিন্তু আমাদের সমাজব্যবস্থা এই নীতিমূলক নহে। এই সমাজব্যবস্থা এই সকল সাংগ্রামিক বুদ্ধিকে সমাজগত ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। উগ্রকর্ম্মই বল, আর আইনসঙ্গত আন্দোলনই বল, সমস্তই ম্লেচ্ছের নীতি। এই সকল নীতি আমাদের সমাজে বিষক্রিয়া দ্বারা ভেদের সঞ্চার করে। আবার এই সকল নীতি এই দেশের সমাজে প্রয়োগ করিলে, এই দেশের সামাজিক সংগঠনই এই সকল নীতিকে বাধা দেয়।

এদিকে আমাদের বুদ্ধি এক-কথামূলক। আজ যদিও আমরা ম্লেচ্ছের বহু-কথা গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও দেশে বহু-কথা ছিল না। প্রতিদিন নিদ্রা হইতে উঠিলেই দেখিতাম, পিতামহী অথবা মাতা কিংবা পিসীমাতার একটী ব্রত আছে। বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত এবং আমোদ-প্রমোদও ঈশ্বরের নাম ছাড়া হইত না। দেশভ্রমণ বলিয়া দেশে কোনও কথা ছিল না। মানুষ তীর্থভ্রমণ ব্যপদেশে দেশ-ভ্রমণ করিত। বৃথা পর্য্যটন অপব্যয় মনে করিত। পারিবারিক কর্ত্তব্যকে পারিবারিক ধর্ম্ম বলা হইত এবং সামাজিক ও রাজনীতিক কর্ত্তব্যগুলিও ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইত। ধর্ম্মকথা ব্যতীত আমাদের কথা ছিল না এবং ধর্ম্মজীবন ব্যতীত আমাদের কোনও প্রশংসিত জীবন ছিল না। আমাদের উপন্যাস ও ইতিহাস ধর্ম্মকথা ব্যতীত অন্য কথা বলে না এবং ধর্ম্মজীবন ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার জীবন

গড়িবার প্রয়াস আমাদের কাব্য, নাটক ও সাহিত্যে নাই। এই ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য রাম-রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল, এই ধর্ম্মরক্ষার জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, এই ধর্ম্মরক্ষার জন্য পুরাণাদি কথিত হইয়াছে এবং এই ধর্ম্মরক্ষার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সঙ্গীতে, কথকতায়, আলাপে, বিশ্রামে, শিক্ষায় দীক্ষায় সকল ক্ষেত্রেই ধর্ম্মকথা ব্যতীত অন্য কথা হইত না। নারীর ব্রতকথা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজসভার রাজকার্য্য পর্য্যন্ত প্রত্যেক কথাই ধর্ম্মকথা। জাতির সহিত জাতির কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। প্রত্যেক জাতিই স্বধর্ম্ম পালন করিত। এই কারণে আমাদের সমাজে বহু-কথা ছিল না। এই সমাজে কংস, শিশুপাল প্রভৃতি যাঁহারা বহু-কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অসুর নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

এক কথায় বলিতে গেলে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত হিন্দুর কোনও কর্ম্ম দেখা যায় নাই এবং ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যতীত যে কোনও পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব হইতে পারে, এই ধারণাই হিন্দুর ছিল না। এইরূপে দেখা যায় যে, এক প্রকার সমাজতত্ত্বমূলে হিন্দুর সর্ব্ববিষয়ে একই কথার দিকে দৃষ্টি এবং আর একপ্রকার সমাজতত্ত্ব-মূলে ম্লেচ্ছের বহু কথার দিকে দৃষ্টি। হিন্দু স্বধর্ম্মপালন দ্বারা জগৎকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখিয়া ইহাতে শান্তিস্থাপন করিতে চাহিত এবং ম্লেচ্ছ জীবনসংগ্রাম-মূলে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাতে দাসত্ব ও অশান্তির সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। এই দৃষ্টিভেদ হেতু হিন্দুর জাতিভেদ আছে এবং ম্লেচ্ছের তাহা নাই। আবার এই দৃষ্টিভেদই যথাক্রমে আর্য্য ও ম্লেচ্ছের লক্ষণ। এই দুইটী লক্ষণ পরস্পর এমন বিপরীত যে, ইহার দ্বারা উভয়ের পরস্পর-বিরোধী দুইটী মনোজগতের সৃষ্টি হইয়াছে। পরস্পর বিপরীত এই দুইটী মনোজগতের দরুণ ইহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট অবোধ্য।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, আর্য্য ও ম্লেচ্ছের মধ্যে পরস্পরের এই দৃষ্টি-ভেদের অর্থ কি? বলা বাহুল্য যে, ম্লেচ্ছের বহু কথার উদ্দেশ্য আজকাল পরিষ্কার। সে চাহে বৈষয়িক উন্নতি। এই উন্নতির জন্য সে বহু কথা বলিয়া মানুষের মত পরিবর্ত্তন করিয়া দেয় এবং দল সংগ্রহ করিয়া একতা-মূলে শক্তিসংগ্রহ করে। কিন্তু আমাদের এক কথা মূলে একতা হইয়া কোনরূপ শক্তিসংগ্রহ হইতে পারে কি না, তাহা আমরা বুঝি না। আমরা একমাত্র বুঝি যে, আমাদের এক কথার উদ্দেশ্য মুক্তি। ঈশ্বর-নিষ্ঠার মূলে আমাদের প্রত্যেক জাতির এক একটি নির্দ্দিষ্ট আচার-ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এই আচার পালন করিলে পরিণামে আমাদের মুক্তি হয়। এই কারণে আমরা আচার পালন করি মুক্তির জন্য; কিন্তু এই মুক্তির সহিত আমাদের সাংসারিকতার কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আমরা বুঝি না এবং বুঝিতে চেষ্টাও করি না। এই কারণে আমাদের আচারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া মুক্তির পথও রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কথাটা নিম্নে বুঝান যাইতেছে।

আমাদের ভুল কোথায়?

এইখানে আমাদের ভুল এই যে, আমরা মনে করি যে, আচার পালন করিলেই সহসা একদিন মুক্তি হইয়া যাইবে; এই কারণে আমাদের আচারপালন দ্বারাও আচারের সার্থকতা সম্পাদিত হয় না। বস্তুতঃ, মুক্তি কাহারও এক জীবনে হয় না। বহু জন্মজন্মান্তরের সাধনার ফলে মানবের মুক্তি হয়। আমরা এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আচার পালন করার জন্য শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছি—চরিত্রের নিমিত্ত। আচার চরিত্র নির্ম্মাণ করে, এবং এই চরিত্র যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন এক কথার দিকে দৃষ্টি স্থির হইয়া আমাদের মুক্তি

হয়। বহু কথা মানবের নিকৃষ্ট প্রকৃতিজনিত স্বভাব। আচার এই প্রকৃতিকে পরাজিত করিয়া উৎকৃষ্টা প্রকৃতির জাগরণ করে এবং তাহাতেই আমাদের ভিতরে এই উৎকৃষ্টা প্রকৃতির জাগরণ হয়। তখন চরিত্রের পূর্ণতা হইয়া ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই ক্ষেত্রে চাষ দিলে, জন্মজন্মান্তরে মানবের মুক্তি হয়।

কিন্তু মুক্তি এত কষ্টসাধ্য হইলেও, চরিত্রে উৎকৃষ্টা প্রকৃতির জাগরণের একটি শুভফল আছে। এই শুভফলেই বৈষয়িক উন্নতি হয়। আমাদের আচার-ব্যবস্থা যদি কেবল মুক্তির জন্যই হইত, তাহা হইলে এই ব্যবস্থার ভিতরে থাকিয়া প্রাচীন ভারত এত উন্নত হইত না। সকলেই জানেন যে, মুক্তি বৈরাগ্যমূলক। এই অবস্থায় যে ব্যবস্থা বৈরাগীর সৃষ্টি করে, সেই ব্যবস্থা কিরূপে দেশে শক্তিশালী রাজ্যসমূহের উৎপত্তি করিল, তাহা কি চিন্তার বিষয় নহে? তুমি না হয় রামায়ণ মহাভারত অবিশ্বাস করিলে; কিন্তু মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য, গুপ্তবংশের রাজ্য, চালুক্যবংশের রাজ্য, চোহান রাজ্য অথবা প্রমারবংশীয় বিক্রমাদিত্যের রাজ্য অস্বীকার করিতে পার না। এইগুলি যদি বৈরাগীর রাজ্য হয়, তাহা হইলে বৈরাগ্যকেই বৈষয়িক উন্নতির সোপান বলিয়া বুঝিতে হইবে। তার পর এই সকল রাজ্যের পতন হইল। বৌদ্ধবিপ্লব হইয়া দেশের ধর্ম্ম নষ্ট হইল। নূতন নূতন রাজ্যের উত্থান-পতন হইল। এই সকল কি মিথ্যা কথা? যদি মিথ্যা কথা না হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধবিপ্লবের পর হইতে এই দেশ কিরূপে অধঃপতিত হইল, তাহা চিন্তা করিয়াছ কি? তাহা যদি চিন্তা করিতে, তাহা হইলে বুঝিতে যে, উন্নতি আমাদের চরিত্র-সাধনার ফল এবং অবনতি আমাদের সাধনার অভাবের ফল। তুমি কেবল বর্ত্তমান লইয়াই ব্যস্ত। এই কারণে তুমি মনে করিতেছ যে, আচার দ্বারা বৈষয়িক কোনও উন্নতি নাই। তুমি দেখিতেছ যে, যাঁহারা

আচার পালন করেন, তাঁহারা কেবল পরকালের কথা বলিয়া বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সুতরাং তোমাকেও অধিক দোষ দেই না। দোষ তাঁহাদের, যাঁহারা আচারের দ্বারা ইহকাল নির্ম্মাণ না করিয়াই পরকাল নির্ম্মাণ করিতে চাহেন। বস্তুতঃ, আচার দ্বারা ইহকাল নির্ম্মিত না হইলে, কখনও পরকাল নির্ম্মিত হয় না এবং সমাজের আনুকূল্য না থাকিলে, ব্যক্তিগত মুক্তি হয় না। সামাজিক আনুকূল্য কথার অর্থ, ইহার সাধু মহাপুরুষ প্রস্তুত করার সামর্থ্য। এ সামর্থ্য চরিত্রের দ্বারা হয় এবং চরিত্র বৈষয়িক উন্নতি ঘটাইয়া দেয়। বৌদ্ধবিপ্লব আমাদিগকে এই কথা ভুলাইয়া দিয়াছিল এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণসাধনার দৃষ্টান্ত সমাজের চরিত্র-সাধনার প্রচেষ্টাকে চাপ দিয়া ফেলিয়াছিল। কাজেই আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষ চরিত্রসাধনা ভুলিয়া মুক্তিসাধনা আরম্ভ করিলেন। বাঙালার বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সমাজের মুক্তিসাধনা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ভারতের মুক্তিসাধনাই কতকটা এই পথে অগ্রসর হইয়াছিল। অবশ্য বৈদিক আচার কলিযুগের মনুষ্যের পক্ষে পালন সম্ভবপর হইবে না বলিয়া তন্ত্রাদি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। এইজন্য কলিতে তন্ত্রমতই প্রশস্ত। কিন্তু এই সময়ে বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাধক ব্যতীত আর কেহ তান্ত্রিক আচার জানিতেন না এবং তান্ত্রিক সাধনার দিকেও অগ্রসর হইতেন না। ফলে, মানবের উপেক্ষা বশতঃই তান্ত্রিক ও বৈদিক আচার অসম্যক্‌রূপে প্রতিপালিত হইত। এইরূপে ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। আশ্রম-ধর্ম্ম পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়াছিল। তারপর যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে উপেক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে একটী একটী করিয়া আচার পরিত্যক্ত হইয়া একদিকে যেমন সমাজের সাধু-প্রস্তুতের সামর্থ্য কমিয়া গেল, অপর দিকে তেমন ইহার চরিত্রগত বন্ধনের দৃঢ়তাও কমিয়া গেল। অনেকে বৌদ্ধশ্রমণগণের জীবন দেখিয়া

ভাবিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রীয় আচার ব্যতীতও সন্ন্যাস হওয়ার কোনও বাধা হয় না। ফলে, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, আমরাই বা আচারকে এতটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব কেন? এই বুদ্ধিই বস্তুতঃ পরবর্ত্তী সময়েও আচারকে উপেক্ষা করিতে লাগিল। আজও আমরা মুসলমান ফকীর ও খৃষ্টান পাদরীগণের জীবন দেখিয়া মনে করি যে, যদি মুক্তিই আচারের উদ্দেশ্য হয়, তবে ইহা ব্যতীতও মুক্তি হইবে না কেন? যীশু অথবা মহম্মদ কি আচার পালন করিয়াছিলেন?

বস্তুতঃ, এই ভ্রান্তি আমাদের বৌদ্ধবিপ্লবেই আনিয়াছিল। আচার-হীন মুক্তিসাধনার দৃষ্টান্ত আমাদিগকে বৈষয়িক ক্ষেত্রে আচার পরিত্যাগ করাইয়া সত্য, ন্যায়পরতা ও ধর্ম্মরক্ষার আবশ্যকতা ভুলাইয়া ধর্ম্মকে জীবনযাত্রা হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিল। সকলেই মনে করিয়াছিল যে, ধর্ম্মকার্য্য সংসারত্যাগ ব্যতীত হয় না। ইহাতে সাংসারিকতাই সারবস্তু হইয়া উঠিল। তারপর চরিত্র অতল জলে গেল। ইংরাজী শিক্ষার প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজ যখন হিন্দুসমাজের দোষ অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, তখন এই বস্তুটী তাঁহাদের চক্ষে পড়িল। ম্লেচ্ছবুদ্ধির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা নিজের দোষ না দেখিয়া পরের দোষটা অতি সুন্দর দেখে এবং চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা না করিয়া পরকে শোধন করার জন্য বিশিষ্টভাবে চেষ্টা করে। এই চেষ্টার নাম সমাজ-সংস্কার। এই সংস্কার ব্যপদেশে ব্রাহ্মসমাজ দেখিলেন যে, তাঁহারা এই দেশের যে উন্নতি চাহেন, সেই উন্নতির জন্য হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইংরাজী শিক্ষা প্রাথমিক ব্রাহ্মগণের মনে বৈষয়িক উন্নতি-সাধনার একটা ভাব জাগ্রত করিয়াছিল। এই ভাবটী যদিও অসঙ্গত নহে, তথাপি ইহার সাধনার জন্য ব্রাহ্মসমাজ যে পথ অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই পথটীই আমাদের শাস্ত্রীয় সাধনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কারণে ব্রাহ্ম যখন হিন্দুকে

এই পথে লইতে চাহিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, হিন্দু সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্রকে মান্য করিয়া চলেন না এবং বিষয়-কর্ম্মে অনেক সময়েই সত্যভ্রষ্ট হন। এই সকল দোষ দেখিয়া তিনি হিন্দুর গুণগুলি আর দেখিতে পাইলেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শাস্ত্র পড়িয়া যে সকল সমাধান করিয়াছিলেন, তাহা তিনি অবিচারে গ্রহণ করিলেন এবং শাস্ত্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি চাহিলেন স্বদেশপ্রেম, হিন্দু তাহা বুঝিত না। আবার তিনিও ধর্ম্মকে Religion মনে করিতেন। কাজেই ধর্ম্ম তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। আমরা যদিও ব্রাহ্ম-সমাজের মতের পক্ষপাতী নহি, তথাপি প্রাথমিক ব্রাহ্মগণ হিন্দুসমাজের যে দোষ দেখিয়াছিলেন, তাহা কতক কতক সত্য। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, আজও যাঁহারা মুক্তির পথে চলেন, তাঁহারা বৈষয়িক ব্যাপারের কোনও খবর রাখেন না এবং সর্ব্বতোভাবে বিষয়কে ত্যাগ করেন। ইহাতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, আচার-ব্যবস্থা যদি কেবল এই উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে এমন আচারের কোনও প্রয়োজন নাই। এইরূপে আমরা আচারের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া যেমন বিষয় হারাইয়াছি, তেমনই আচার-বিরোধী একটা মতবাদের উৎপত্তি হওয়ারও পথ করিয়া দিয়া আচার হারাইবার কারণ ঘটাইয়াছি। আচার-বিরোধী মতের প্রাবল্য-হেতু সাধু-সেবা এখন সমাজে নাই এবং সমাজও সাধুর পরিবর্ত্তে ভণ্ডই অধিক প্রস্তুত করিতেছে। দেশের প্রাচীন সাধুমহাত্মাগণ ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের স্থান আর পূর্ণ হইতেছে না। রামকৃষ্ণ, ভাস্করানন্দ, সন্তদাস প্রভৃতির ন্যায় সাধু-মহাত্মা বর্ত্তমানে দেশে অত্যন্ত বিরল। পক্ষান্তরে, এখন বৈষয়িক উন্নতির পথে সদ্‌গুরু ও হিন্দুর নাই। অনবরত কতকগুলি মিথ্যা আন্দোলনের পথে কংগ্রেস তাহাকে লইয়া তাহার নৈতিক মেরুদণ্ড

ভগ্ন করিয়া দিয়াছে। সে এখন অন্নের কাঙ্গাল। যে সমাজের মানুষ কেবল 'হা-ভাত' 'হা-ভাত' করিয়া ফিরে, সেই সমাজে সাধু প্রস্তুত হয় না। বস্তুতঃ, আমরা এইরূপেই ধীরে ধীরে ম্লেচ্ছ হইয়াছি।

ঈশ্বরনিষ্ঠাহীন ভোগতৃষ্ণা যেমন মানুষকে ম্লেচ্ছ করে, আচারহীন মুক্তি-সাধনাও তেমন মানুষকে ম্লেচ্ছ করে। মুসলমান-রাজত্বে এই দেশে আচারহীন মুক্তিসাধনার প্রাবল্য হইয়া সমাজে অনেকটা স্বেচ্ছাচারিতা প্রবেশ করিয়াছিল ও হিন্দুর ম্লেচ্ছত্ব জন্মিয়াছিল। আবার বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন ভোগতৃষ্ণা আমাদিগকে ম্লেচ্ছ করিয়াছে। অতএব আমাদের আচারহীন মুক্তিসাধনাই বর্ত্তমান ঈশ্বরবিশ্বাসহীন ভোগসাধনার উৎপত্তি করিয়াছে। মানুষ যখন বিষয়ভোগে তৃপ্ত হইয়া বলে যে, আর ভোগের প্রয়োজন নাই, ইহা অসার, তখনই সে প্রকৃত বৈরাগী হইয়া ব্রহ্ম-সাধনার যোগ্য হয়। এই অসারতার উপলব্ধি ভোগ ব্যতীত হয় না। যথা—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

—মনু ২য় অধ্যায় ৯৪ শ্লোক।

অনুবাদঃ—বিষয়োপভোগ-দ্বারা কামনার কখনই শান্তি হয় না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়; যেমন ঘৃত দ্বারা অগ্নি-নির্ব্বাণ হয় না, প্রত্যুত আরও প্রজ্জলিত হইয়া উঠে।

যশ্চৈতান্ প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বান্ যশ্চ তান্ কেবলাংস্ত্যজেৎ।
প্রাপনাৎ সর্ব্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে॥

মনু ২য় অধ্যায় ৯৫ শ্লোক

অনুবাদ :—যে ব্যক্তি সমুদায় বিষয় লাভ করে ও যে ব্যক্তি সমুদায় বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে, তন্মধ্যে বিষয়োপভোগী ব্যক্তি অপেক্ষা বিষয়বাসনাবিহীন ব্যক্তিই প্রশংসনীয় হয়।

"ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥"

মনু ২য় অধ্যায় ৯৬ শ্লোক

অনুবাদ :—ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ বিষয়ে আসক্ত, সুতরাং বিষয়ের সেবাদ্বারা বিষয়ের দোষজ্ঞান মূলে তাহাদিগকে বিষয় হইতে যেমন নিবৃত্ত করা যায়, বিষয়াসেবাহীন ত্যাগের দ্বারা তাহা তেমন পারা যায় না। অতএব প্রথমোক্ত উপায়ে ইন্দ্রিয়সংযম করা কর্ত্তব্য।

এই ইন্দ্রিয়সংযমই বৈরাগ্যের জনক। ইহাই আবার চরিত্রের জনক হইয়া বৈষয়িক উন্নতির কারণ হয়।

আচার কাহাকে বলে

সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, বিষয়-সেবা দ্বারা বিষয়ের দোষ-জ্ঞান কিরূপে সম্ভবে ? এইখানে আসিয়াই ম্লেচ্ছের সহিত আমাদের আচার-ভেদ হইয়াছে। সে সংসারকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ করিয়া বিষয়সেবাকেই জীবনের সারবস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে এবং আমরা বিষয়সেবাকে বিষয়ের দোষ-জ্ঞানের উপায় গণ্য করিয়া ইহাকে ইন্দ্রিয়সংযমের সাধক করিয়া লইয়াছি। ইহা হইতে ম্লেচ্ছের সহিত আমাদের আচারের ভেদ হইয়াছে। সুতরাং ম্লেচ্ছের অমুকটা ভাল এবং আমাদের অমুকটা মন্দ, এইরূপ বাছিয়া লইয়া উভয় আচারের সামঞ্জস্য-বিধানের কোনও উপায় নাই। একবার যদি ম্লেচ্ছাচার গ্রহণ কর, তাহা হইলে ম্লেচ্ছের ন্যায় তোমাকেও বিষয়-সেবাকেই জীবনের সারবস্তু বলিয়া ধরিয়া

লইতে হইবে এবং ধীরে ধীরে আমাদের সমস্ত আচার পরিত্যক্ত হইবে। ইন্দ্রিয়গুলির যতটুকু ভোগ-সামর্থ্য আছে, ম্লেচ্ছ ততটুকু ভোগই চাহে এবং তজ্জন্য জড়বস্তুগুলি কি পরিমাণ ভোগ প্রদান করার সামর্থ্য রাখে, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত সে জড়-বিজ্ঞানের (Science) দিকে ধাবিত। এই বিজ্ঞান সে যখন যতটুকু বুঝিতে পারে, ততটুকুই সে ইহাকে তাহার ভোগে লাগাইয়া তাহার আচার ব্যবস্থা করে। পক্ষান্তরে, আমাদের ঋষিগণ জড়-বস্তুর ভোগকে ইন্দ্রিয়সংযমের উপায় সাব্যস্ত করায়, যে পরিমাণ ভোগ ইহাদের অসারতা উপলব্ধি করাইয়া দেয়, সেই পরিমাণ ভোগই আমাদের জন্য ব্যবস্থিত হইয়া আচার দ্বারা এই ভোগের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই আচারের মৌলিক তত্ত্ব মনু নিম্নলিখিত শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যথা :—

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুং ॥

মনু ২য় অধ্যায় শ্লোক ১০০

অনুবাদ :—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগকে আয়ত্ত করিয়া ও মনের সংযমন করিয়া, দেহকে যাতনা না দিয়া, কোন উপায় দ্বারা সমুদায় পুরুষার্থের সাধন করিবে।

এই শ্লোকের সার তত্ত্ব এই যে, মানুষকে সর্ব্বাগ্রে নিজের পুরুষার্থ অর্থাৎ নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ণয় করিতে হইবে এবং তৎপর এই লক্ষ্যে পৌছাইবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম দ্বারা সর্ব্বথা চেষ্টা করিবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই চেষ্টা-মূলে যে সকল আচার পালন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সাধ্বাচার নামে শাস্ত্রে ব্যবস্থিত হইয়াছে। এই আচারই চরিত্রের দ্বারা বৈষয়িক উন্নতি করাইয়া

পরিণামে মুক্তি আনয়ন করে। ম্লেচ্ছের সহিত এইখানেই আমাদের পার্থক্য।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ম্লেচ্ছের বিবাহিত জীবন ও আমাদের বিবাহিত জীবনের তারতম্য দেখ। সে চাহে তাহার স্ত্রীকে এমন ভাবে শিক্ষিতা দেখিতে, যাহাতে তাহার দেহ, মন ও ভাবের পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে! এইজন্য সে প্রথমতঃ বিবাহের নিমিত্ত এমন সুন্দরী ও প্রেমময়ী নারী চাহে, যাহার সৌন্দর্য্য ও ভালবাসা তাহার দেহ-মনের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। তারপর ভাবের তৃপ্তি-সাধনার্থে সে শিক্ষিতা পত্নী চাহে। এই শিক্ষা এমন হওয়া চাই, যাহাতে নৃত্যগীতের দ্বারা, বেশভূষার দ্বারা ও কালোপযোগী বিদ্যাচর্চ্চার দ্বারা সে তাহাকে তৃপ্তি প্রদান করিতে পারে। প্রতি ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি তাহার লক্ষ্য এবং প্রতি ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের চরম সামর্থ্যানুযায়ী ভোগ তাহার জীবনের উদ্দেশ্য। সন্তান-লাভ এই ক্ষেত্রে তাহার উপরি-পাওনা মাত্র। চাকরী করিয়া বেতনের উপরে মানুষ যেমন ঘুষ খায়, তেমনই ভোগের উপরে ম্লেচ্ছ সন্তান লাভ করে। এই সন্তানও আবার এই দম্পতীর ক্রীড়ানন্দের সামগ্রী হইয়া থাকে। তারপর যখন সে বড় হয়, তখন আর তাহার প্রয়োজন থাকে না। পরন্তু ভোগের অন্তরায় ঘটায় বলিয়াই তাহাকে পৃথক্ সংসার সাজাইয়া দেওয়া পিতামাতার চরম কর্ত্তব্যে পরিণত হয়।

পক্ষান্তরে, আমাদের বিবাহের উদ্দেশ্য পতি-পত্নীর পরস্পর ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযমের অভ্যাস। এই জন্য আমরা রূপ চাহিলেও, এমন রূপ চাহি না, যাহাতে দেহ-মনের চরম তৃপ্তি সাধিত হয়। জগতে এইরূপ তৃপ্তি কাহারও হয় না এবং রূপবতী অপেক্ষাও অধিকতর রূপবতী জগতে থাকায়, কোন রূপই দেহ-মনের চরম তৃপ্তি সাধন করিতে

পারে না। কাম-সাধনায় কামের তৃপ্তি নাই বলিয়া মনু হইতে উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এই জন্য আমরা বুঝি যে, সাধারণভাবে স্বভাবতঃ মনোজ্ঞা যুবতীর সাহচর্য্য ও সহবাস দ্বারাই আমাদিগকে যৌন-সম্মিলনের রসাস্বাদন করিয়া এই মিলনজনিত ইন্দ্রিয়সেবার অসারতা উপলব্ধি করিতে হইবে। আমরা পত্নীকে নৃত্য-গীত প্রভৃতি কলাভিজ্ঞা দেখিতে চাহি না। কারণ, ইহাতে পতি-পত্নীর এই সকল ব্যাপারে এত মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, যে ইন্দ্রিয়চর্চ্চাই জীবনের সারবস্তু হইয়া গৃহস্থালী ভৃত্যের কৃপা-সাপেক্ষ হইয়া পড়ে এবং জীবনযাত্রা ব্যয়সাধ্য হইয়া অর্থ-লোভ সংযম-বুদ্ধিকে রুদ্ধ করিয়া দেয়। আমরা পত্নীকে দর্শন-বিজ্ঞান পড়াইয়া পাণ্ডিত্যে ভূষিতা করার প্রয়াস করি না। কারণ, পাণ্ডিত্যজনিত যশোলিপ্সা গৃহ-কর্ম্মে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা মূলে গৃহস্থালীকে বহু-ভৃত্য-সমন্বিত ও ব্যয়সাধ্য করিয়া তুলে। এই জন্য চাকুরী না করিলে, তাঁহাদের চলে না। আজকাল যে অর্থকরী বিদ্যা ইঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার ফলে ইঁহারা চাকুরীতে আকৃষ্টা হইয়া সরকারী অথবা পরের চাকুরীতে প্রবিষ্টা হন। পূর্ব্বে নারীগণ স্বামী ব্যতীত আর কাহাকেও প্রভু বলিতেন না; কিন্তু এক্ষণে ভাতের খাতিরে পরকে প্রভু বলিতে বাধ্য হইতেছেন। এই দুর্নীতির ফলে সমাজে যে দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে সমগ্র জাতির পারিবারিক স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া ইহা একটা দাসের জাতিতে পরিণত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট স্বজাতীয় হউক বা বিজাতীয় হউক, ইহাতে স্বেচ্ছাচারের প্রবেশ অনিবার্য্য। আমাদের শাস্ত্রকার যখন সমাজে সাধ্বাচার প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এই সাধ্বাচার এক সময়ে রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচার মূলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মহাভারত-পাঠে দেখা যায় যে, কোনও কোনও হিন্দু

রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া এই আচার নষ্ট করার চেষ্টা করিয়াছেন। শাস্ত্রকার আচার দ্বারা এই দেশে এক বিশিষ্ট স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আচার নষ্ট হইলে, এই স্বাধীনতা নষ্ট হওয়া অনিবার্য্য জ্ঞানে তাঁহারা প্রত্যেক পরিবারের নারীকে এই স্বাধীনতার রক্ষয়িত্রী-পদে বরণ করিয়া নারী-ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থায় নারীর উপার্জ্জন-ক্ষেত্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, লোভ-হেতু তাহার রক্ষণশীলতা নষ্ট হইয়া যায়। নারীদেহের ধর্ম্মানুসারে তিনি একদিকে যেমন কষ্টসহিষ্ণু, অপর দিকে তেমন ভোগ-পরায়ণা। আবার এই দেহেরই ধর্ম্মানুসারে একদিকে যেমন তিনি রক্ষণশীলা, অপরদিকে তেমন তিনি চঞ্চলা ও চপলা। এই চপলতার দরুণ তিনি লোভ সংবরণ করিতে অক্ষম হইয়া নীচ দাসীবুদ্ধি-হেতু অনেক সময়ে সমাজকে অধঃপতিত করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় শাস্ত্রকার তাঁহার জন্য সকল ক্ষেত্রেই সংযম ব্যবস্থিত করিয়া উপার্জ্জন-ক্ষেত্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ, জননীগণ যখন পরকে অন্নদাতা বলিতে বাধ্য হন, তখন সমাজে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন গবেষণার উৎপত্তি সম্ভব হয় না। শিশু মাতৃ-স্তন্যে পরাধীনতার হলাহল-সেবী হইয়া জাতীয় জীবনকে অধঃপাতে দেয়। পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য-মূলক স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য পতিই নারীর স্বাভাবিক অন্নদাতা। এই অর্থেই আমাদের প্রাচীনা রমণীগণ গ্রাম্য ভাষায় পতিকে "ভাতার" বলিতেন। ইহার অর্থ এই যে, ভাত যেখানে, আবদ্ধতাও সেইখানে। এই আবদ্ধতা যাহাতে নীচ দাসীবুদ্ধি জন্মাইতে না পারে, সেইজন্য আমাদের ঋষিগণ নারীর অন্ন মমতার ক্ষেত্রে রাখিয়া দিয়াছেন। মমতার পাত্র যখন আমাকে ভাত-কাপড় দেয়, তখন সে এই ভাত-কাপড়ের হিসাব রাখে না। পক্ষান্তরে, পরের ঘরে কড়ায় গণ্ডায় ইহার

হিসাব হয়। এই কারণে পতি-পুত্রের অন্ন নারীর স্বাধীনতা রক্ষা করে এবং পরান্ন ইহাকে নষ্ট করে। দুঃখের বিষয়, আমাদের নারীগণ উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্বাধীনতা জ্ঞানে পরান্নে উদর পূরণ পূর্ব্বক ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া রাজপথে বাহির হইতেছেন এবং জাতীয় স্বাধীনতা-রক্ষার পরিবর্ত্তে ইহাকে পরের কল্যাণে উৎসর্গ করিয়া দিতেছেন। শিক্ষিত সমাজ যখন এই দেশে স্ত্রীস্বাধীনতার নিমিত্ত আন্দোলন তুলিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, যাঁহাদের জ্ঞান-গরিমায় পুষ্ট হইয়া তাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহাদের দেশে স্বাধীনতা আদৌ নাই। তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে কেবল পরাধীনতাই শিক্ষা দিয়াছেন। কথাটা এই গ্রন্থে যথাস্থানে বুঝাইব। এইখানে কেবল ইহাই উল্লেখ করা যাইতেছে যে, স্বাধীনতা কর্ম্মগত নহে, অন্নগত। বর্ণাশ্রম যখন জাগ্রত ছিল, তখন স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া এই অন্নগত স্বাধীনতাই রক্ষা করিত। এই সময়ে পুরুষ তাহার জাতীয় বৃত্তি রক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন করিত এবং নারী পতি-পুত্রের অন্নে প্রতিপালিতা হইয়া গৃহকর্ম্ম দ্বারা এই স্বাধীনতার ভিত্তি রক্ষা করিত। তারপর পুরুষ যখন আচার ত্যাগ করিয়া জাতীয় বৃত্তি ত্যাগ করিল, তখন এই স্বাধীনতা অর্দ্ধাপহৃত হইয়া নারীর হস্তে কেবল ইহার ভিত্তিটী রহিয়া গেল। একটী বৃহৎ প্রাসাদ ভগ্ন হইলে যেমন তাহার ভিত্তিটী অনেক দিন থাকিয়া যায়, তেমনই আমাদের আচারমূলক স্বাধীনতা পুরুষের নপুংসকত্বের দরুণ বিনষ্ট হইয়া নারীর হস্তে কেবল ভিত্তিরূপে অবশিষ্ট ছিল। আজ এই স্ত্রীশিক্ষা সেই ভিত্তিও নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ভাই স্বদেশপ্রেমিক, তুমি গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ কংগ্রেস করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অনেক কান্নাকাটা করিয়াছ; কিন্তু ভ্রান্তি-বশে কাচ-মূল্যে কাঞ্চন বিকাইয়া,

ঘরের নারীকে পরের দাসী করিয়াছ। তুমি অজ্ঞান বলিয়া ইহাতে তোমার দুঃখের পরিবর্ত্তে সুখ হয়। কিন্তু একদিন ইহা বুঝিবে। তুমি না বুঝিলে, তোমার সন্তানগণ বুঝিবে। যদি কখনও বুঝিতে পার, তখন কাঁদিয়া মাটী ভিজাইলেও আর এই স্বাধীনতা পাইবে না। আর নারী, তোমাকেও একদিন ইহার জন্য কাঁদিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, সম্রাট্‌নন্দিনী জেবউন্নেছা মবারক আলী নামক জনৈক ক্ষুদ্র সেনাপতির প্রেমে আসক্ত হইয়াছিল। কিন্তু কোনও কারণে ক্রোধের বশে সে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া বিষধর কৃষ্ণ-সর্পের দ্বারা দংশন করাইয়াছিল। মবারক যতক্ষণ জীবিত ছিল, ক্রোধ ততক্ষণ জেবউন্নেছাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পরে যখন মবারকের মৃত্যু হইল, তখন মদন হারাইয়া রতির বিলাপের ন্যায় জেবউন্নেছা অনেক কাঁদিল। মহাকবি কালিদাস রতি-বিলাপের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন ঃ—

বসুধালিঙ্গন-ধূসরস্তনী।
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা॥

তুমিও নারী একদিন ধর্ম্ম হারাইয়া এইরূপ বিলাপ করিবে।

বর্ত্তমান ম্লেচ্ছবুদ্ধির যুগে এই সকল কথার নানা আপত্তি হইতে পারে। ঐসকল আপত্তির খণ্ডন ধর্ম্মালোচনা-প্রসঙ্গে যথাস্থানে করা যাইবে। কিন্তু আপত্তি যাহাই হউক না কেন, তাহা ব্যক্তিগত অথবা নিতান্ত-পক্ষে নারীজাতির কল্পিত অধিকারগত। সমগ্র মনুষ্যজাতির স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া পুরুষ কিংবা নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য বা অধিকার থাকিতে পারে না। ভোগস্পৃহা-হেতু সংযমের অভাব মূলে নারীর উপার্জ্জনস্পৃহা জাগ্রত হইয়া পরকে প্রভু বলার কারণ হয়। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বর্ত্তমানে ধর্ম্ম নিদ্রিত থাকায়, অনেক ক্ষেত্রে অনেক পরিবারে

নারী কষ্ট পায়। কিন্তু অসংযম-রূপী ঔষধ-দ্বারা যদি ইহার চিকিৎসা হয়, তবে সমগ্র জাতির মাতৃস্তন্য পরচর্য্যা-বিষে বিষাক্ত হইয়া কেবল এই বিষই ক্ষরণ করিবে। এই কারণে আমাদের শাস্ত্রকার ধর্ম্মকে কাল-নিরপেক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন। কালকে প্রতিহত করার একমাত্র উপায় তপস্যা। আমরা এই দেশে তপস্বিনী রমণী চাই। ভোগপ্রিয়া ও পরচর্য্যাকুশলা রমণী চাই না। নারীগণ যদি সহিষ্ণুতার তপস্যা না করেন, তাহা হইলে হিন্দু আর কখনও উঠিতে পারিবে না। পুরুষের দাসত্ব-দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের এক পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আবার নারীর দাসত্ব-দ্বারা যদি অপর পা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের উপায় কি হইবে, তাহা স্থির করিতে গ্রন্থকার অক্ষম। আমরা ম্লেচ্ছ-দেশসুলভ যে স্ত্রীশিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তুষানল-দাহন অথবা দীর্ঘকাল-ব্যাপী তপস্যা।

বস্তুতঃ, নারীর শিক্ষা গৃহকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে পতিজীবনের ধর্ম্মকার্য্যের সাহচর্য্য-দ্বারা হইবে। শৈশবে কেবল ব্যাকরণাদি-পাঠে ভাষাজ্ঞান এমন হইতে হইবে, যাহাতে তিনি পতিবাক্য অথবা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের উপদেশ-বাক্য বুঝিতে সক্ষম হন। উপদেশ ব্যতীত ধর্ম্মকর্ম্ম হইতে পারে না বলিয়া বিশ্রাম-কালে কথকতা ও পুরাণাদি-পাঠ শ্রবণ করাইয়া তাহাকে জটিল দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে। আমাদের প্রাচীন মাতৃগণের এই শিক্ষা ছিল। এখন তাহা নাই। ডাক্তারের শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারের শিক্ষা, শিল্পকর্ম্ম ও কৃষিকর্ম্মের শিক্ষা যেমন কর্ম্মের আনুষঙ্গিক, স্ত্রীশিক্ষাও তেমন কর্ম্মের আনুষঙ্গিক। কর্ম্মহীন কোন স্ত্রীশিক্ষা নাই। এইজন্য কালোপযোগী বিদ্যাশিক্ষা তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম নষ্ট করিয়া তাহার জীবনকে দাসী-জীবনে পরিণত করে। কর্ম্মশিক্ষার উদ্দেশ্য সন্তানপালন ও পরিবার-রক্ষা। পতিসেবা এই পালনধর্ম্মের

মৌলিক ভিত্তি। এই কারণে নারীর শিক্ষা পরিবারের বাহিরে হইলে তাহার পারিবারিক মায়ামমতা দুর্ব্বল হইয়া যায়। বিবাহিত জীবনের লক্ষ্য সন্তানোৎপাদন বলিয়া শাস্ত্রকারগণ সাব্যস্ত করিয়াছেন। যদিও ব্যক্তিরূপক্ষে ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য বিবাহ ব্যবস্থিত হইয়াছে, তথাপি মিলিতভাবে সন্তানোৎপাদনই বিবাহের উদ্দেশ্য। ইহাদ্বারা এই মিলনের সার্থকতা হয়। মুক্তির জন্য সংযম প্রয়োজন হইলেও, সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ-শোধ হয়। পিতৃপিতামহ আমাদিগকে সংসারে আনিয়া শরীররূপী যে ঋণ দিয়াছেন, সেই ঋণ তাঁহাদের বংশের ধারা রক্ষা করিয়া আমরা শোধ করি। এই ঋণশোধরূপী কর্ত্তব্যই বিবাহিত জীবনের আচার-রাশি দ্বারা আমাদের ভোগের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়।

অতএব আমাদের ভোগ সীমাবদ্ধ। তাহাদের ভোগ অসীম। যেখানে ভোগের সীমা নাই, সেইখানে ইন্দ্রিয়লালসাই আচার ব্যবস্থা করে বলিয়া আমরা ইহাকে অনাচার বলি। ইন্দ্রিয়লালসা আচার ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনকে এমন ব্যয়সাধ্য করিয়া তুলে যে, লোভের বশে মানুষ তখন তস্করতার (Criminality) দিকে ধাবিত হইতে বাধ্য হয়। এই তস্করতা দুই প্রকার :—(১) ব্যক্তিগত (২) সমাজগত। ব্যক্তিগত তস্করতা চুরি-চামারী দ্বারা এবং সমাজগত তস্করতা জাপানের মাঞ্চুরিয়া-গ্রাস ও ইটালীর আবিসিনিয়া-গ্রাসের ন্যায় দুষ্কর্ম্ম দ্বারা প্রকটিত হয়। এই উভয় প্রকার তস্করতা-নিবারণই আমাদের আচারের উদ্দেশ্য। আবার তস্করবুদ্ধি মানুষকে দাস করিয়া তুলে বলিয়া ইহার পরিহারও আচার-ব্যবস্থার কারণ। কথাগুলি ক্রমে বিস্তারিত ব্যাখ্যাত হইবে।

অতএবই বলিতেছিলাম যে, বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর আচারের চরিত্র-গঠনমূলক উদ্দেশ্যটী ভুলিয়া গিয়া আমরা ভুল করিয়াছি। এই ভুল প্রথমতঃ

ধীরে ধীরে আমাদের সংসার নষ্ট করিয়াছে। তৎপর এই ক্রমাবনতি আজ স্বাভাবিক পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া এখন আমাদিগকে অন্নহীন ও বেকার ম্লেচ্ছে পরিণত করিয়া আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আর্য্যের সহিত ম্লেচ্ছের তফাৎ এক-কথা ও বহু-কথার মধ্যে। এক-কথা সংযমাত্মক এবং বহু-কথা তৃষ্ণাত্মক। যাহারা তৃষ্ণাবশতঃ ঘরে অন্ন থাকিলেও, জীবনযাত্রাকে ব্যয়সাধ্য করিয়া 'হা-অন্ন' হা-অন্ন' করিয়া বেড়ায়, যাহারা কিছুতেই তুষ্ট হয় না, যাহারা অমুকে অধিক খাইয়া ফেলিল বলিয়া শোক করে, তাহারাই শূদ্র অথবা ম্লেচ্ছ। ইহারা জগতে অশান্তি সৃষ্টি করে। আর যাহারা আচার-পালন-দ্বারা ত্যাগাত্মক ভোগে অভ্যস্ত হইয়া জগতে শান্তির দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করে, তাহারাই আর্য্য। এই ভারতবর্ষ আর্য্যের উৎপত্তিস্থান এবং ইহার বহির্ভূত দেশসমূহ ম্লেচ্ছের উৎপত্তিস্থান। এই দেশেও ম্লেচ্ছ আছে বটে ; তবে ইহার বহির্ভূত দেশসমূহ ম্লেচ্ছবহুল। গুণের দ্বারা আর্য্যের সংজ্ঞা ও গুণের দ্বারা ম্লেচ্ছের সংজ্ঞা হয়। যথা :—

ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব ন।
ন শূদ্রো ন চ বৈ ম্লেচ্ছোভেদিতা গুণকর্ম্মভিঃ॥

(শুক্রনীতি ১ম অধ্যায় ৩৮ শ্লোক)

অনুবাদ :—জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা ম্লেচ্ছের ভেদ হয় না, গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা ইহাদের ভেদ হয়।

এইরূপে গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা বর্ণত্ব ও তদনুযায়ী আচারপালন-মূলে আর্য্যত্ব জন্মে এবং আচার হইতে বিচ্যুতিঘটিত ম্লেচ্ছত্ব জন্মে। এই ম্লেচ্ছত্বের বাহ্য লক্ষণ যদিও ইতিপূর্ব্বে রঘুনন্দন হইতে উদ্ধৃত করিয়া

প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি ম্লেচ্ছের সংজ্ঞা অন্যরূপ। রাজনীতি-শাস্ত্রে এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা ঃ—

ত্যক্ত-স্বধর্ম্মাচরণাঃ নির্ঘৃণাঃ পরপীড়কাঃ।
চণ্ডাশ্চ হিংসকা নিত্যং ম্লেচ্ছাস্তে হ্যবিবেকিনঃ॥

(শুক্রনীতি ১ম অধ্যায় ৪৪ শ্লোক)

অনুবাদ ঃ—যাহারা স্বধর্ম্মাচরণ করে না এবং তজ্জন্য বর্ণত্ব হইতে যাহাদের বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, যাহারা নির্দ্দয়, পরপীড়ক, উগ্র প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং সর্ব্বদা হিংসাশীল ও অবিবেকী, তাহারাই ম্লেচ্ছ।

এইরূপে স্বধর্ম্মপালন-মূলে বর্ণত্ব-রক্ষা-দ্বারা আর্য্যত্ব ও তাহার পরিত্যাগ-মূলে ম্লেচ্ছত্ব কীর্ত্তিত হইয়া নিম্নলিখিতরূপে আর্য্যচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। যথা, ঃ—

জ্ঞানকর্ম্মোপাসনাভির্দেবতারাধনে রতঃ।
শান্তো দান্তো দয়ালুশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ গুণৈঃ কৃতঃ॥
লোকসংরক্ষণে দক্ষঃ শূরো দান্তঃ পরাক্রমী।
দুষ্টো নিগ্রহশীলো যঃ স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥
ক্রয়বিক্রয়কুশলা যে নিত্য পণ্যজীবিনঃ।
পশুরক্ষাঃ কৃষিকরাস্তে বৈশ্যাঃ কীর্ত্তিতা ভুবি॥
দ্বিজসেবার্চ্চনরতাঃ শূরাঃ শান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ॥
সীরকাষ্ঠ-তৃণবহাস্তে নীচাঃ শূদ্রসংজ্ঞকাঃ॥

(শুক্রনীতি ১ম অধ্যায় শ্লোক ৪০।৪১।৪২।৪৩)

যিনি জ্ঞান ও কর্ম্মের যথাক্রমে অনুশীলন ও অনুষ্ঠানমূলক তপস্যাদি গুণ-দ্বারা উপলক্ষিত, সর্ব্বদা দেবতারাধনে রত, শান্ত, দান্ত ও দয়ালু, তিনি ব্রাহ্মণ।

যিনি লোকরক্ষণে দক্ষ, শূর, দানশীল, জিতেন্দ্রিয়, পরাক্রমী এবং দুষ্ট-দমনে সমর্থ, তিনি ক্ষত্রিয়।

যিনি সর্ব্বদা ক্রয়-বিক্রয়ে কুশল ও পণ্যজীবী, যিনি পশুরক্ষা ও কৃষি-কার্য্যে রত, তিনিই বৈশ্য বলিয়া জগতে অধিষ্ঠিত।

যাহারা এই ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা-কার্য্যে রত থাকিয়া শূর, কার্য্যক্ষম, সুশীল ও জিতেন্দ্রিয় হয়, যাহারা লাঙ্গল, কাষ্ঠ ও তৃণাদি বহন করে, সেই ক্ষুদ্র কর্ম্মরত মনুষ্যগণ শূদ্র-সংজ্ঞক হয়।

এই কথাগুলি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, এইখানে ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ইন্দ্রিয়সংযম সাধারণ লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই ইন্দ্রিয়সংযম স্বধর্ম্মাচরণমূলক। যাহার স্বধর্ম্ম নাই, তাহার বর্ণত্ব হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়া ম্লেচ্ছত্ব জন্মে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যে সকল কর্ম্ম উপরে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই তাহাদের স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, ইহা পালন করিলে একের কর্ম্মে অপরে হস্তক্ষেপ করার ও তন্মূলে সমাজে জীবন-সংগ্রাম আসিবার কারণ হয় না। এই অর্থে লোভ-সংবরণপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম-পালন দ্বারা জীবন-সংগ্রামকে প্রতিহত করাই আর্য্যলক্ষণ।

পক্ষান্তরে, এই লোভসংবরণ-রূপী ধর্ম্ম যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই ম্লেচ্ছ। এই ম্লেচ্ছত্বের প্রাথমিক ফল নিষ্ঠুরতা। অপরে বাণিজ্য করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে, আমি যাইয়া তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধিলাম, অথচ আমার অন্তরে একটু দাগও লাগিল না। এইরূপ চরিত্র বিশ্বাসের অযোগ্য ও সর্ব্বদা পরপীড়ক হইয়া উঠে। কেন না, সে নিজের সহোদর ভ্রাতা, এমন কি, পিতামাতাকে পর্য্যন্ত জীবনসংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করিয়া তাহাদের সহিত একটা আদানপ্রদানের বুঝপ্রবোধ করিতে চাহে। এই বুঝপ্রবোধ

না হইলে, সে ইহাদের জীবিকায় হস্তক্ষেপ করিতে চাহে এবং এমন ভাবে জীবনযাপন করে, যাহাতে ইহারা না খাইয়া মরিলেও, সে ক্লেশ বোধ করে না! এইরূপে তাহার চরিত্রে যে নৃশংসতা জন্মে, তাহাতে সে অকারণে মানুষের শত্রু হইয়া উঠে। তুমি আহার করিয়া বাঁচিয়া থাকিলেই সে লোভবশতঃ তোমার শত্রু হইবে। তারপর যখন তুমি বাধ্য হইয়া তাহাকে বাধা দিবে, তখন সে চণ্ড হইয়া উঠিবে এবং তোমার মাথায় বাড়ি দিবে। এইরূপে এই চরিত্র চণ্ড ও নিত্য হিংসাকারী।

বর্ত্তমানে এই দেশের ঐতিহাসিক গবেষণার উন্মার্গগামী ধারা পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রকে সাধারণের নিকট এমন ভাবে চিত্রিত করিয়াছে যে, এই সকল গ্রন্থের প্রমাণ বিশ্বাস করিতে নিতান্ত মূর্খও চাহে না। কাজেই আমাদের সর্ব্বপ্রকার প্রামাণ্য গ্রন্থ আজ অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় এইখানে 'আর্য্য'-শব্দের যে অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া অনেকে অবিশ্বাস করিয়া বসিবেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, এদেশে এখনও অস্পৃশ্যতা নামক বস্তুটী বিদ্যমান থাকায়, এই বিষয়ে একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে। সকলেই জানেন যে, ম্লেচ্ছগণ আমাদের অস্পৃশ্য এবং ম্লেচ্ছদেশে গমনও আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞার কারণানুসন্ধান করিলেই মোক্ষ-মূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 'আর্য্য' শব্দের ব্যাখ্যা যে মিথ্যা, তাহা বুঝা যাইবে। অনাদি কাল যাবৎই আচার ও অনাচার বিষয়ে মতভেদ-মূলে আর্য্য ও অনার্য্য পরস্পর পৃথক্। ভারতের কোনও আদিম অসভ্য-জাতি আর্য্যগণের হস্তে পরাজিত হয় নাই। এই সকল মিথ্যা ইতিহাস পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উদ্ভট কল্পনার ফল। পক্ষান্তরে, 'আর্য্য' শব্দের যে ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল, তাহাই সত্য। অস্পৃশ্যতাই ইহার প্রমাণ। এই প্রমাণমূলে চিন্তা করিয়া দেখিলে পাঠক বুঝিবেন যে,

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভ্রান্তিবশতঃ আমাদের দেশের ইতিহাসের কোনও তত্ত্বই তলাইয়া বুঝিতে পারেন নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরাও তাহাদের ভ্রান্ত ইতিহাস পাঠ করিয়া পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি। বস্তুতঃ আর্য্য বলিতে সদাচারীকে বুঝায় এবং অনার্য্য বলিতে অনাচারী ম্লেচ্ছকে বুঝায়। জগতের মৌলিক তত্ত্ব এবং মানবচরিত্র-নির্ম্মাণের তত্ত্ব-বিষয়ে মতভেদমূলে ইহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। জীবনসংগ্রামে জয়-পরাজয়মূলে নহে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এই কথাটি আদৌ বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছেন যে, ম্লেচ্ছদেশের ইতিহাস যেমন জীবনসংগ্রাম-বুদ্ধিমূলে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতির পরাজয় ও বলবান্ জাতির প্রতিষ্ঠার দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে, এই দেশের ইতিহাসও বুঝি তদ্রূপ। কিন্তু তাহা নহে। আমাদের দেশের ইতিহাস মানবের মনুষ্যত্বের ইতিহাস। আর্য্যগণ তাহাদের সদাচারমূলে জগতের মনুষ্যত্বের মহিমা দৃষ্টান্তদ্বারা কীর্ত্তন পূর্ব্বক ইহাতে শান্তিস্থাপন করার চেষ্টা করিয়াছেন। অপরকে পরাজয় পূর্ব্বক শান্তিস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা আর্য্যঋষিগণের ছিল না। নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্যই সময়ে সময়ে যুদ্ধ ঘোষণা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও কোনও নিষ্ঠুর কার্য্যদ্বারা কলঙ্কিত হয় নাই। নৈশ আক্রমণ, গুপ্তহত্যা, বিষদিগ্ধবাণ, বিষাক্তদ্রব্যপ্রয়োগ, মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রপ্রয়োগ আর্য্যশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। এক কথায় বলিতে গেলে এই দেশে কোনও terrorism ছিল না।

জগতে শান্তি স্থাপিত হওয়ার জন্য প্রকৃত নীতিধর্ম্ম এই দেশে আবিষ্কৃত হইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নামে এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্ম চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জগতে শান্তিস্থাপন করে। প্রেম ও মনুষ্যত্ব এই শান্তিস্থাপনের মূল। পক্ষান্তরে, ম্লেচ্ছের শান্তি ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার প্রতিবাদ স্তম্ভিত করিয়া স্থাপিত হয়। পাছে ম্লেচ্ছ-চরিত্র আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া আমাদের চরিত্র দূষিত করে, এই

উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যতার সৃষ্টি। আর্য্য-শব্দের পাশ্চাত্য ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে, ইউরোপীয় জাতিসমূহ আমাদের জ্ঞাতি হইয়া দাঁড়ান। এই অবস্থায় কি মনে হয় না যে, এই জ্ঞাতিবর্গ কোন্ অপরাধে আমাদের অস্পৃশ্য হইলেন? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিক কতকগুলি সূক্ত অবলম্বনে নানা প্রকার যুক্তি দেখাইয়া তাঁহাদের আর্য্যশব্দের ব্যাখ্যা জগতে প্রচলন করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এইখানে এই সকল যুক্তির বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। আমরা পুরুষানুক্রমে অবগত আছি যে, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি বেদমূলক। বেদের জটিল দুরূহ তত্ত্বগুলি সাধারণের বোধগম্য হওয়ার জন্য এই সকল গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে যদি এই দেশের অস্পৃশ্যতার একটি যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং এই ব্যাখ্যামূলে আর্য্য ও অনার্য্যের একটী যুক্তিসিদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইলে নূতন করিয়া বৈদিক সূক্তের বিচার করার আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ, আমাদের সমাজ বৈদিক-সমাজ বলিয়া পরিচিত। বেদের প্রকৃত অর্থ—এই সমাজের জীবন্ত মূর্ত্তির সহিত উপরোক্ত শাস্ত্রগ্রন্থগুলির সামঞ্জস্য বিধান-দ্বারা প্রকটিত হইবে। অস্পৃশ্যতাই এই সামঞ্জস্য বিধান করে। এই অস্পৃশ্যতা কিছু আজকালকার নহে। চিরকালই ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্ততঃ মনুর সময় হইতে যে ইহার অস্তিত্ব চলিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ নাই। যথাঃ—

> কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
> স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরম্॥
> এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
> শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্বৃত্তিকর্শিতঃ॥

(মনু ২য় অধ্যায়, শ্লোক ২৩।২৪)

অনুবাদ :—যেস্থানে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করিয়া বেড়ায়—সেই দেশকে যজ্ঞিয় দেশ বলে, তদ্ভিন্ন স্থানকে ম্লেচ্ছদেশ বলা যায়। দ্বিজাতিগণ অন্য দেশসম্ভূত হইলেও, প্রযত্নসহকারে এই সকল পবিত্র দেশ আশ্রয় করিবেন। কিন্তু শূদ্রেরা আপন জীবিকার জন্য যে কোনও দেশে বসতি করিতে পারে।

এই দুইটী শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন—যচ্চোক্তং ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরং ইত্যেযোঽপি প্রায়িকোঽনুবাদএব। প্রায়েণ হ্যেষু দেশেষু ম্লেচ্ছা ভবন্তি। নত্বনেন দেশসংবন্ধনেন ম্লেচ্ছা বক্ষ্যন্তে স্বতন্তেষাং প্রসিদ্ধের্ব্রাহ্মণাদিজাতিবৎ। অথার্থদ্বারেণায়ং শব্দঃ প্রবৃত্তো ম্লেচ্ছানাং দেশ ইতি। তত্র যদি কথং চিদ্ব্রহ্মাবর্ত্তাদিদেশমপি ম্লেচ্ছা আক্রমেয়ুঃ—তত্রৈবাবস্থানং কুর্য্যুর্ভবেদেবাসৌ ম্লেচ্ছদেশঃ। তথা যদি কশ্চিৎ ক্ষত্রিয়াদি জাতীয়ো রাজা সাধ্বাচরণো ম্লেচ্ছান্ পরাজয়েত চাতুর্ব্বর্ণ্যং বাসয়েৎ, ম্লেচ্ছাংশ্চার্য্যাবর্ত্তেব চাণ্ডালান্ ব্যবস্থাপয়েৎ সোঽপি স্যাদ্ যজ্ঞিয়ঃ। যতো ন ভূমিঃ স্বতো দুষ্টা সংসর্গাদ্ধিসাদুষ্যত্বঽমেধ্যোপহতেব।

যদর্থং দেশসংজ্ঞাভেদকথনং তমিদানীং বিধিমাহ। এতান্ ব্রহ্মাবর্ত্তাদীন্ দেশান্ দ্বিজাতয়োদেশান্তরেঽপি জাতা আশ্রয়েরন্। জন্মদেশং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মাবর্ত্তাদিদেশ-সংশ্রয়ণং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যম্। অত্র কেচিৎ আহুরদৃষ্টার্থএবা য়মেতদ্দেশসংশ্রয়ণবিধিঃ। সত্যপি দেশান্তরেঽপ্যধিকারসংভবে এতেষু দেশেষু নিবাসঃ কর্ত্তব্যঃ। তত্র কল্পাধিকারত্বে যদি বা গঙ্গাদিতীর্থস্নানবদেতদ্দেশ-নিবাসবিধিঃ পাবনত্বেন কল্প্যতে। যথৈব কশ্চিদ্ আপ পরিত্রতরা এবং ভূমিভাগা অপি কেচিদেব পবিত্রাঃ।

নহ্যেতদ্দেশব্যতিরেকেণ কৃৎস্নধর্ম্মানুষ্ঠানসম্ভবঃ। তথাহি হিমবতি তাবৎ কাশ্মীরাদৌ শীতেনার্দ্দিতান্ বহিঃ সন্ধ্যোপাসনা অবধি ক্রিয়ন্তে। ন চ যথাবিধি স্বাধ্যায়সম্ভবঃ। ন হি হেমন্তশিশিরয়োরহরহনদীস্নানাদি-

সম্ভবঃ। ইদমেব চ দ্বিজাতয় ইতি বচনং লিঙ্গং। ন কশ্চিদেব দেশো সতি ম্লেচ্ছসংবন্ধে স্বতএব ম্লেচ্ছদেশঃ। অন্যথা তদ্দেশসংবন্ধাৎ ম্লেচ্ছত্বে কথং দ্বিজাতিত্বম্। অথোচ্যতে ন গমনমাত্রাৎ ম্লেচ্ছতা অপিতু নিবাসাৎ। স চানেন প্রতিষিধ্যতে।

অনুবাদ :—"ইহার পর ম্লেচ্ছদেশ" এই কথা প্রায়িক অনুবাদ মাত্র। প্রায়ই এই সকল দেশে ম্লেচ্ছেরা বাস করে, এই অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। দেশের সহিত সম্বন্ধ হওয়া প্রযুক্ত যে ইহারা ম্লেচ্ছ, এরূপ কখনও বলা যায় না। ব্রাহ্মণাদিজাতিবৎ ইহাদের ম্লেচ্ছ বলিয়া স্বতঃ প্রসিদ্ধি আছে। এই অর্থদ্বারে কথার ভিতর প্রবেশ করিলে, ম্লেচ্ছের দেশ ম্লেচ্ছদেশ এইরূপ অর্থ ই সঙ্গত হয়। যদি ব্রহ্মাবর্ত্তাদি দেশ কখনও ম্লেচ্ছগণ আক্রমণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করে, তাহা হইলে এই সকল দেশও ম্লেচ্ছদেশ হইয়া যাইবে। এইরূপে যদি ক্ষত্রিয়াদি জাতীয় রাজা ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়া তথায় সাধ্বাচার স্থাপন করেন ও চতুর্ব্বর্ণের বাস করাইয়া ম্লেচ্ছগণকে চণ্ডাল ব্যবস্থায় রাখেন, তাহা হইলে ম্লেচ্ছদেশও যজ্ঞিয় দেশ হইয়া যাইবে। কারণ, ভূমি স্বভাবতঃ দুষ্ট হয় না। সংসর্গের দরুণই দোষ বা অপবিত্রতা লাভ করে।

দ্বিতীয় শ্লোকের সারকথা বলিতে যাইয়া মেধাতিথি যাহা বলিয়াছেন, তাহা—"যদর্থং দেশসংজ্ঞাভেদকথনং" ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাষ্যকারের এই সকল বাক্যের তাৎ-পর্য্যার্থঘটিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—যে উদ্দেশ্যে দেশসংজ্ঞাভেদ করা হইয়াছে—তাহা এইখানে বলা হইতেছে। এই সকল ব্রহ্মাবর্ত্তাদি দেশকে দেশান্তরজাত দ্বিজাতিগণও আশ্রয় করিবেন। অর্থাৎ জন্মদেশ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তাদি দেশ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন যে, এই দেশাশ্রয়বিধি দৃষ্টার্থফলকে লক্ষ্য করিয়া প্রণীত হইয়াছে।

এইজন্য দেশান্তরে জাত ব্যক্তিকেও এই দেশ আশ্রয় করিতে বলা হইয়াছে। অথবা গঙ্গাদিতীর্থস্নানের ন্যায় এই দেশে বাস করা দ্বারা মনুষ্য পবিত্রতর হয়, এইরূপ স্থির করা হইয়াছে। যেমন কোনও কোনও জল পবিত্রতর, তেমনি জগতের কোনও কোনও ভূমিভাগও পবিত্রতরা। এতদ্দেশ ব্যতিরেকে সমগ্র ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভবে না। যথা, হিমপূর্ণ কাশ্মীরাদি দেশে মানুষ শীতে কাতর থাকায় বাহিরে বসিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিতে পারে না। যথাবিধি বেদাধ্যয়নও সম্ভবে না। হেমন্ত শিশিরে অহরহ নদীস্নানও সম্ভবে না। কোনও দেশই ম্লেচ্ছ-সম্বন্ধবশতঃ স্বতঃ ম্লেচ্ছদেশে পরিণত হয় না। অন্যথা যে দেশে ম্লেচ্ছ আছে, সেই দেশে দ্বিজাতির কথা উল্লেখ হইত না। অতএব ম্লেচ্ছদেশে গমনমাত্রই ম্লেচ্ছত্ব হয় না—পরন্তু নিবাসের দ্বারা ম্লেচ্ছত্ব হয়। এইজন্য গমন নিষিদ্ধ নহে। এই বিচারে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণাদি জাতি যে দেশে বাস করেন, সেই দেশই যজ্ঞিয় এবং অবশিষ্ট সকল দেশই ম্লেচ্ছদেশ। ইহার অর্থ এই যে, দ্বিজাতি যেখানে চরিত্রদ্বারা দেশকে পবিত্র করে, সেই দেশই যজ্ঞিয় দেশ এবং অবশিষ্ট সমস্ত ম্লেচ্ছদেশ। তবে যজ্ঞিয় দেশ বলার তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞের দ্বারা এই দেশের চরিত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় শ্লোকে দেখা যায়ঃ—"এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ" এই কথাদ্বারা কৃষ্ণসার মৃগের ক্ষুরদ্বারা চিহ্নিত এই ভারতবর্ষ আশ্রয় করিয়া বাস করার জন্যই দ্বিজাতিগণকে উপদেশ করা হইয়াছে। এই অবস্থায় এই ভারতভূমির প্রতি দ্বিজাতিগণের একটা বিশিষ্ট প্রকার আত্মবোধ আমাদের শাস্ত্রকার এই শ্লোকদ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন! এই দেশ ব্যতীত অন্য দেশে আচার সম্ভবে না এবং আচারহীন ব্যক্তির চরিত্র থাকে না। আবার যজ্ঞ ব্যতীত আচারও আসিতে পারে না।

অতএব আমাদের স্বদেশপ্রেম যজ্ঞরক্ষামূলক। এই পুণ্যভূমিতে বাসহেতু যজ্ঞ রক্ষিত হয় বলিয়াই এই ভূমি পুণ্যভূমি। ইহার পুণ্য প্রবাহ রক্ষাই আমাদের দেশরক্ষা। পুণ্যভূমিজ্ঞানে ইহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা এবং ম্লেচ্ছদেশে যাইয়া ইহার পুণ্যস্রোতঃ নষ্ট না করাই ইহার স্বদেশপ্রেম। এই কারণে গঙ্গাস্নানের ফলের ন্যায় এই দেশকে আশ্রয় করিয়া থাকার ফল যেমন পারলৌকিক বলিয়া কথিত হইয়াছে, তেমনই চরিত্রলাভ ইহার ঐহিক ফল বলিয়া শাস্ত্রে ফলশ্রুতি আছে। যথা :—

এতদ্দেশে প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বাং স্বাং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।
(মনু ২য় অধ্যায়, শ্লোক ২০)

অনুবাদ :—এই সমস্ত দেশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য স্ব স্ব চরিত্র-গঠনপ্রণালী শিক্ষা করিবে।

এইরূপে দেখা যায় যে, আমাদের দেশাত্মবোধ চরিত্রে আত্মবোধ-মূলক এবং চরিত্রে আত্মবোধ যজ্ঞে আত্মবোধমূলক। এই কারণে যজ্ঞ-রক্ষাই আমাদের স্বদেশপ্রেমের মূলমন্ত্র। ইহার দ্বারাই আমাদের দেশ-রক্ষার কর্ত্তব্যতা সমাপ্ত হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া যে আমাদের দেশাত্মবোধ আদৌ নাই, তাহা নহে। কিন্তু এই দেশাত্মবোধ মুখ্য নহে, গৌণ। যে দেশ ব্যতীত সমগ্র ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভবে না, যে দেশ ব্যতীত অহরহঃ নদীস্নান সম্ভবে না, সেই দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে বাস করা দ্বিজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ থাকায়, এই দেশের প্রতি আমাদের একটি আত্মবোধ প্রকটিত হইতেছে।

সমগ্র মানবজাতি যখন চারিভাগে বিভক্ত, তখন যদি এই দেশ ব্যতীতও অন্য কোন দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, কিংবা তথায় বর্ণাশ্রমীর বাস থাকে, তাহা হইলে তথাকার দ্বিজাতি কখনও দেশদোষে

তুষ্ট হইবে না। এইজন্য মেধাতিথি তাঁহার উপরোদ্ধৃত ভাষ্যে বলিয়াছেন :—

সংশ্রবোঽত্র শ্রূয়তে স চ দেশান্তরে ভবতস্তত্ত্যাগেন
অত্রদেশসম্বন্ধো, ন সংশ্রিতস্যৈব সংশ্রয়ণম্ ॥

অনুবাদ :—এখানে সংশ্রয় শব্দের যে ব্যবহার হইয়াছে, তদ্দ্বারা দেশান্তরে জাত ব্যক্তির পক্ষে জন্মদেশ পরিত্যাগক্রমে এই দেশকে আশ্রয় করার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। সংশ্রিত ব্যক্তির সংশ্রয়ণবিধি ইহা নহে।

এই বাক্য হইতে একটী পরিসংখ্যা-বিধির উৎপত্তি হইয়াছে। পরিসংখ্যাবিধি বলিতে বিধির তাৎপর্য্যানুসরণমূলক বিধিকে বুঝায়। এই পরিসংখ্যা-বিধি এই :—"অথ সিদ্ধে সংশ্রয়ণে তদ্বচনমন্যনিবৃত্ত্যর্থম্" অনুবাদ :—যেখানে সংশ্রয়ণ একটা সিদ্ধবস্তু অর্থাৎ যেখানে জন্ম হইতেই কেহ এই যজ্ঞিয় দেশের আশ্রিত আছে, তাহার পক্ষে অন্য দেশকে আশ্রয় করা এই বিধিতে নিষিদ্ধ।

এখন এই পরিসংখ্যাতেও মেধাতিথি বিচার করিতেছেন :—

ন দেশসম্বন্ধেন পুরুষাঃ ম্লেচ্ছাঃ—
কিং তর্হি পুরুষসম্বন্ধেন ম্লেচ্ছদেশতা ॥

অর্থাৎ যদি দেশসম্বন্ধে পুরুষের ম্লেচ্ছত্ব না হয়, তবে পুরুষের সম্বন্ধে দেশের ম্লেচ্ছদেশতা কিরূপে হইতে পারে ?

তদুত্তরে বলিতেছেন যে, তাহাও নহে। পুরুষসম্বন্ধেও দেশের ম্লেচ্ছদেশতা হয় না—কারণ, "শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষাবিহিতত্বাত্তদ্দেশনিবাসে সর্ব্বদাপ্রাপ্তে তত্রাজীবতো দেশান্তরনিবাসোঽভ্যনুজ্ঞায়তে।" অনুবাদ :—কেননা, শূদ্রের দ্বিজাতিশুশ্রূষা বিহিত হওয়ায়, এই দেশে যদি সে জীবিকানির্ব্বাহ না করিতে পারে, তাহা হইলে ম্লেচ্ছদেশে যাইয়াও

তথাকার দ্বিজাতিশুশ্রূষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা তাহার জন্য বিহিত হইয়াছে। মনু হইতে উদ্ধৃত ২৪ শ্লোকের ভাষ্য দ্রষ্টব্য। সুতরাং প্রশ্ন এই যে, এইরূপ পরিসংখ্যার তাৎপর্য্য কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:— "যদা বহুকুটুম্বতয়া শুশ্রূষাশক্ত্যা বা দ্বিজাতীয়মাশ্রিতঃ স এনং বিভৃয়াত্তদা দেশান্তরে সংভবতি ধনার্জ্জনে নিবসেত্তত্রাপি ন ম্লেচ্ছভূয়িষ্ঠে—। কিং তর্হ্যযজ্ঞিয়ে ম্লেচ্ছাবৃতে—যানাসনাদিক্রিয়ানিমিত্তস্য সংস্বর্গস্যাপরিহার্য্যত্বাৎ তদ্ভাবাপত্তিপ্রসঙ্গাৎ"। অনুবাদ:—শূদ্র যদি বহু-কুটম্বসম্পন্ন হয়, তবে ম্লেচ্ছদেশে যাইয়াও নিজের শুশ্রূষাশক্তি দ্বারা কিম্বা কোনও দ্বিজাতির আশ্রয়ে থাকিয়া বাস করিবে, ইহাই শূদ্রের দ্বিজাতিশুশ্রূষা দ্বারা ম্লেচ্ছদেশে যাইয়া জীবিকানির্ব্বাহসম্বন্ধীয় ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। অতএব সে এইরূপে তথায় যাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে এবং দেশান্তরে বাস করিয়া ধনার্জ্জন করিবে। কিন্তু তথাপি ম্লেচ্ছবহুল দেশে যাইবে না। কেন না, এইরূপ অযজ্ঞিয় ম্লেচ্ছাবৃত দেশে যানাসনাদি ক্রিয়ানিমিত্ত সংসর্গের অপরিহার্য্যতা নিবন্ধন তদ্ভাবের ভাবুক হওয়া বিষয়ক আপত্তি প্রসঙ্গে ইহা নিষিদ্ধ।

অতএব দেখা যায় যে, ম্লেচ্ছভাবের ভাবুক হওয়া নিবারণ প্রসঙ্গেই এই দেশবাসী বর্ণাশ্রমীর ম্লেচ্ছদেশে গমন নিষিদ্ধ এবং ঠিক এই কারণেই ভিন্নদেশবাসী বর্ণাশ্রমীরও জন্মদেশ পরিত্যাগ-ক্রমে এই দেশকে আশ্রয় করিয়া থাকা বিধি। আবার যজ্ঞবুদ্ধিদ্বারা চরিত্রগঠনের সুযোগ দেয় বলিয়াই ভারতভূমি পূণ্যভূমি—"ধন-ধান্য পুষ্প ভরা" বসুন্ধরার মধ্যে সকল দেশের সেরা দেশ বলিয়া শাস্ত্রে এই দেশ প্রশংসিত নহে। এই দেশবাসের দৃষ্টার্থ ফল চরিত্রলাভ এবং অদৃষ্টার্থ ফল চিত্তশুদ্ধিমূলক পারলৌকিক কল্যাণলাভ। এইজন্য গঙ্গাদিতীর্থস্নানের ন্যায় শাস্ত্রকার এই দেশ-নিবাসের বিধি প্রদান করিয়াছেন।

এই সকল কারণে এই দেশে যে অস্পৃশ্যতা দেখা যায়, তাহার উদ্দেশ্য শাস্ত্রীয় চরিত্র ও তদনুযায়ী পারলৌকিক কল্যাণ-রক্ষা। ম্লেচ্ছদেশ ব্যতীত যে ম্লেচ্ছ থাকিতে পারে না, তাহা নহে। এই দেশেও যাঁহারা পূর্ব্বাপর স্বধর্ম্মহীন অথবা কোনও কারণে স্বধর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাদিগকে ম্লেচ্ছপ্রায় গণ্যে অস্পৃশ্য করিয়া রাখা হইয়াছে। মনুর দশম অধ্যায়ে এতদ্দেশপ্রভব প্রতিলোম সঙ্কর জাতি সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ আছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, এই সকল সঙ্কর জাতিকে বর্ণ বলিয়া যেমন গণ্য করা হয় নাই, তেমনই ইহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়াও গণ্য করা হয় নাই। ইহাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটী আচার-ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, তথাপি ইহাদিগকে জন্মদোষহেতু অস্পৃশ্য করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, জন্মদোষহেতু যদিও ইহাদের অস্পৃশ্য করা হইল, তথাপি স্বধর্ম্ম ও আচার-ব্যবস্থা দ্বারা ইহাদের ইহ-পরলোকের কল্যাণ-বিধানের পথ করা হইল। এই ক্ষেত্রে জন্মদোষজনিত অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি-নিবারণ। এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পিতৃমাতৃ-দোষে সন্তান দণ্ডিত হইবে কেন? এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর কর্ম্মবাদমূলক, ইহা প্রত্যেকের জানা থাকা আবশ্যক যে, জন্মান্তরবাদ কর্ম্মবাদরূপে আমাদের ধর্ম্মের ভিত্তি, ইহাকে যাহারা অবিশ্বাস করেন, তাহাদিগকে ম্লেচ্ছভাবের ভাবুক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই কারণে ইহাদের সহিত এই বিষয়ের তর্ক নিষিদ্ধ। কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধতত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া যেমন জ্যামিতি-শাস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তেমনই জন্মান্তরকে স্বতঃসিদ্ধ গণ্যে আমাদের জাতিভেদ হইয়াছে। এই অবস্থায় যাঁহারা এই বিষয়ের তর্ক করেন, তাঁহাদের সহিত তর্ক কখনও শেষ হইবে না। শাস্ত্রকার এই জন্মান্তরকে স্বতঃসিদ্ধ স্বীকারে ধরিয়া লইয়াছেন যে,

এবম্বিধ জন্ম যাহাদের হয়, তাহাদের নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মের কোনও দুষ্কৃতি আছে। সুতরাং এই বিশ্বাসমূলে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, এই সন্তানের অস্পৃশ্যতারূপী দণ্ড বিধি-নির্দ্দিষ্ট ও বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত। ঠিক এইরূপ বিশ্বাসমূলেই আমরা ধরিয়া লই যে, কোনও বিশেষ দুষ্কৃতি-মূলে অমুক ব্যক্তি শূদ্র অথবা বৈশ্য হইয়াছেন এবং কোনও বিশেষ সুকৃতিমূলে অমুক ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং যে কারণে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব কল্পিত হইয়াছে, ঠিক সেই কারণেই অস্পৃশ্য জাতির অস্পৃশ্যতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি ক্ষত্রিয়াদি জাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে অস্পৃশ্য জাতির অস্পৃশ্যতাও স্বীকার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, বিধিলঙ্ঘনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের অনূঢ়া কন্যাতে অথবা বিধবা কন্যাতে শূদ্রের পুত্রোৎপাদন যদি পাপ বলিয়া স্বীকার কর এবং এই পাপের দ্বারা সমগ্র মানবজাতির সুখশান্তি অপহৃত হয় বলিয়া যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে এই পাপের নিবৃত্তিমূলক দণ্ড (Deterrant punishment) অস্পৃশ্যতা অপেক্ষা কার্য্যকরী আর কিছুই কল্পনা করা যাইতে পারে না। আবার পিতামাতাকে অস্পৃশ্য করিলে, সন্তানকে স্পর্শযোগ্য রাখার কোনও কার্য্যকরী উপায় নাই। এই সকল নানা কারণে শাস্ত্রকার যে অস্পৃশ্যতা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল উদ্দেশ্য যৌন-সম্মিলন-বিষয়ক উচ্ছৃঙ্খলতা-নিবারণ। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাষু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করাঃ॥

হে কৃষ্ণ! কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইলেই কুলনারীগণ ভ্রষ্টাচারিণী হয়। হে বৃষ্ণিবংশধর! কুলকামিনীগণের ব্যভিচারে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।

এই উচ্ছৃঙ্খলতা-নিবারণ দ্বারা শাস্ত্রকার প্রকারান্তরে আমাদের সমাজে ম্লেচ্ছত্বই নিবারণ করিয়াছেন। যৌন-সম্মিলন সম্বন্ধে এই উচ্ছৃঙ্খলতা অপেক্ষা ম্লেচ্ছভাব আর দ্বিতীয় নাই। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, ম্লেচ্ছভাবের মৌলিক ভিত্তি স্বধর্ম্মত্যাগের মধ্যে রহিয়াছে। আবার ইহাও বলিয়াছি যে. স্বধর্ম্মত্যাগের দ্বারা মানুষ নিষ্ঠুর ও পরপীড়ক হয়। এই নিষ্ঠুরতা ও পরপীড়া-প্রবৃত্তি ম্লেচ্ছ-সমাজে এমন ব্যাপক-ভাবে রহিয়াছে যে, তথায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্যেরও ইহা চক্ষে বাধে না। সকলেই মনে করে যে, মানব-সমাজে ইহা অপরিহার্য্য। নিতান্ত পক্ষে কল্পনা করিয়া লয় যে, ইহা বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার দোষ। আজকাল ধনিক কর্ত্তৃক শ্রমিক-পীড়নকে ম্লেচ্ছ-দেশের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ এই চক্ষেই দেখিতেছেন। কেহই কল্পনা করিতে পারেন না যে, সমাজের স্বধর্ম্মহীনতা ইহার মূল। আবার বেকার-সমস্যা সম্পর্কেও পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ এইরূপ সমাধান করিয়া Communism নামক আর একটা নূতন ব্যাধির উৎপাদন করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, স্বধর্ম্মহীনতা মূলেই সমাজে বেকার-সমস্যার উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা বুঝুন আর না বুঝুন, শাস্ত্রকার জানিতেন যে, স্বধর্ম্মহীনতা-মূলেই সমাজে এই সকল দোষের উৎপত্তি হয় এবং বর্ণসঙ্করের উৎপত্তির দ্বারা সমাজে স্বধর্ম্মহীনতা জন্মে। এই কারণে ম্লেচ্ছত্ব-নিবারণের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রকার প্রতিলোম-সঙ্কর জাতি সমূহকে অস্পৃশ্য করিয়া তাহাদের নিমিত্ত এক একটী স্বধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই স্বধর্ম্ম দ্বারাই ইহারা ম্লেচ্ছ হইতে বিশিষ্ট। আজ যদি অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন হয়, তাহা হইলে ইহারা যেমন ম্লেচ্ছ হইবে, আমরাও তেমনি ম্লেচ্ছ হইয়া পড়িব। ইহারা আমাদের সন্তান। অথচ কর্ম্ম-দোষে দুষ্ট। এই জন্য ইহাদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রকার ইহাদের জন্য

স্বধর্ম্ম-ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাদিগকে সর্ব্বধর্ম্ম-বহির্ভূত করিয়া ম্লেচ্ছ করিয়া দেওয়া হয় নাই, ইহাই শাস্ত্রকারের অনুকম্পা। এই জন্য কৃতজ্ঞ না হইয়া ইহারা যদি শাস্ত্রকারকে গালাগালি করেন, তাহা হইলে ইহাদেরই সর্ব্বনাশ হইবে। ম্লেচ্ছত্বের ন্যায় পাপ-জীবন আর নাই। ইহা স্বধর্ম্ম-হীন অসংযত জীবন। যৌন-সম্মিলনে ইহার প্রারম্ভ হয়। গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা মানবের জাতিনির্ণয় করিয়া যদি জাত্যনুসারে যৌন-সম্মিলন হয়, তাহা হইলে উভয়ের রুচি ও প্রকৃতির মিলন হইয়া সুরতালের সমন্বয় ঘটে। ফলে, একের চরিত্র অপরের চরিত্রকে নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে, যদৃচ্ছা যৌন-সম্মিলনে নিম্নাভিমুখী চরিত্র ঊর্দ্ধগামী চরিত্রকে অধঃপাতিত করে। অসংযত কাম-তাড়না এই অধঃপতনের মূল। স্বধর্ম্মহীনতা ইহার ফল। ইহার পর স্বধর্ম্ম-হীনতার মূলে সমাজে দুঃখ ও বেকার-সমস্যা হয়। পূর্ব্ব-বাঙালার গ্রাম্য কবি এ অবাধ যৌন-সম্মিলনের অজ্ঞান-পিপাসার বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন :—

"আমার সঙ্গিলা ভাই, কইও গিয়া মায়ের ঠাঁই।
জাতি দিলাম ভুঁইমালীর ঘরে॥"

এই ভাবটী যে কাম-তাড়না ও সৌন্দর্য্য-পিপাসা হইতে হইয়াছে, সেই কাম-তাড়না ও সৌন্দর্য্য-পিপাসামূলেই বর্ত্তমানে আমাদের দেশে অসবর্ণ-বিবাহ-বিষয়ক আইনের প্রস্তাব চলিতেছে। এই সকল অজ্ঞান স্বদেশপ্রেমিক বুঝিতে পারিতেছেন না যে, তাঁহারা এই দেশে যে জাতি-নির্ম্মাণের (Nation-building) কল্পনা করিতেছেন, তাহা কখনও হইবে না; পরন্তু হিন্দু তাহার মৌলিক চরিত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সকলের অবজ্ঞার পাত্র হইবে। যে ভাব লইয়া আজকাল অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন বিষয়ক আন্দোলন ও অসবর্ণ-বিবাহ-বিষয়ক আন্দোলন চলিতেছে

তাহাই বস্তুতঃ মৌলিক ম্লেচ্ছভাব। শাস্ত্রকার এই ভাব-সংক্রমণ-বিষয়ক আপত্তি-মূলেই আমাদের ম্লেচ্ছদেশে গমন নিষিদ্ধ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ম্লেচ্ছদেশে না যাইয়াও ইংরাজী-শিক্ষার ফলে আমরা এই ভাবটী প্রাপ্ত হইয়াছি অথবা সমাজে বিলাত-ফেরতের সংখ্যাধিক্য বশতঃই এই ভাব সংক্রামিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা এই সকল আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহারা বুঝিতেছেন না যে, এই দুইটী ভাবের দ্বারা তাঁহারা পিতৃপুরুষের ইতিহাস লুপ্ত করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের ইতিহাস বুঝিতে হইলে, বেদ-পাঠের কোনও প্রয়োজন করে না। একমাত্র মহাভারত ও পুরাণাদি পাঠ করিয়া তাহার সহিত সমাজে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার জীবন্তমূর্ত্তি সংযুক্ত করিলেই ইতিহাসটী পরিষ্কার হইয়া যায়। ইতিহাসটী এই যে, আমরা কখনও ভিন্ন দেশ হইতে আসি নাই। যাঁহারা গঙ্গাদি-তীর্থস্নানের ন্যায় এতদ্দেশে বাস করাকে মূল্যবান্ মনে করিতেন, তাঁহারা কখনও ভিন্ন দেশ হইতে আসিতে পারেন না। ভিন্ন দেশ হইতে আসিলে, সেই দেশ কখনও ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া বর্জ্জিত হইত না। যদি বল, এই দেশে আসিবার পর আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিয়া মতভেদের কারণ হইয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, এই দেশে পূর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞান ছিল না। কিন্তু আমাদের ইতিহাস তাহা বলে না—ইতিহাস বলে যে, এই দেশের ঋষিগণ পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা জগতের আদিম অবস্থার একটা নূতন চিত্র আমাদের অন্তরে প্রতিফলিত হইয়া প্রশ্ন আসে যে, জগতের আদিম অবস্থায় মানুষের নিরবচ্ছিন্ন বর্ব্বরতা ছিল কি না? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই বর্ব্বরতা অনুমান করিলেও, কোনও দলিল দ্বারা এই অনুমান প্রমাণিত হয় না। জগৎ চিরকালই জ্ঞানী ও অজ্ঞান এই উভয় শ্রেণীর

মনুষ্য লইয়া চলিয়াছে। ইহার ব্যতিক্রম কেহ কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া লিখিয়া যান নাই। ইংলণ্ডবাসী যখন বর্ব্বর ছিল, রোম তখন সভ্য ছিল। রোম যখন বর্ব্বর ছিল, গ্রীস তখন সভ্য ছিল। গ্রীস যখন বর্ব্বর ছিল, মিশর তখন সভ্য ছিল। আবার ভারতের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান কোনও দেশেই ছিল না। ইহা চিরকালই জ্ঞানিগণের আবাসভূমি বলিয়া পরিচিত। তোমার ঠাকুরদাদা মূর্খ ছিলেন বলিয়া আমার ঠাকুরদাদাও মূর্খ ছিলেন, এমন কথা তুমি বলিতে পার না। জগৎ চিরদিনই জ্ঞানী, অজ্ঞান ও সভ্য, অসভ্য লইয়া চলিয়াছে। অতএব, যদি অনাদি কাল যাবৎই এই জগতে জ্ঞানী ও অজ্ঞান উভয়ের অস্তিত্ব থাকা স্বীকার কর, এবং যদি ইহাও স্বীকার কর যে, অজ্ঞান মনুষ্যগণ তাহাদের সাহচর্য্য দ্বারা অজ্ঞানতাজনিত কামনাপ্রসারণ-বুদ্ধি সংক্রামিত করিয়া জ্ঞানীর জ্ঞান নষ্ট করার সম্ভাবনা আছে—যদি ইহা স্বীকার কর যে, অজ্ঞান মনুষ্যগণ নীতি-ধর্ম্মকে লোকাচারমূলক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া জ্ঞানিগণের ধর্ম্ম-বুদ্ধি নষ্ট করিয়া দেওয়ার সম্ভাবনা আছে—যদি ইহা স্বীকার কর যে, অজ্ঞান মনুষ্যগণ এই জগতে তাহাদের বাহুবলের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়া হাব্‌সীগণের ন্যায় নিরপরাধ মনুষ্যগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করাকে সভ্যতাবিস্তার নামে প্রচারিত করিয়া জগৎকে দূষিত করিতে পারে, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, জ্ঞানিগণের নিকট অজ্ঞানীরা অস্পৃশ্য। এই অবস্থায় আজ যদি অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন হয়, তাহা হইলে জ্ঞানসাধনার পৃথক্ ইতিহাস নষ্ট হইয়া কামসাধনার দুষ্ট ইতিহাসের সহিত মিশিয়া যাইবে এবং আমরা পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাসকে মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া কামসাধনার দিকে চলিতে থাকিব। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ এক-কথা অর্থাৎ ধর্ম্মকথামূলক অপরিবর্ত্তনীয় চরিত্র লইয়া জগতে গুরু-রূপে বিচরণ করিতেন। তাঁহাদের এই গুরুভাবের নাম আর্য্যভাব।

পূর্ব্বপুরুষের এই গুরুভাব যদি আমরা ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে বৃথাই আমরা যজ্ঞিয় দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই দেশ জ্ঞানের জন্মভূমি। সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার আদি ঋষি এই দেশে জ্ঞান লইয়া সর্ব্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মজ্ঞানের উত্তরাধিকারী সাধু মহাত্মাগণ ছিলেন আর্য্য—আর এই জ্ঞানের পরিপন্থী অসাধুগণ ছিলেন অনার্য্য। জ্ঞান এক কথা অর্থাৎ ভগবৎকথামূলক এবং অজ্ঞানতা বহুকথা অর্থাৎ বৈষয়িক উন্নতির অনন্ত চিন্তামূলক। আর্য্যগণ ভগবচ্চিন্তামূলে জ্ঞানী ছিলেন এবং অনার্য্যগণ কি খাইব, কি খাইব, এই চিন্তায় অজ্ঞান ছিলেন। একই পিতৃগণের সন্তান বলিয়া মানুষের সহিত মানুষের জ্ঞাতিসম্বন্ধ থাকিলেও, জ্ঞানের অভাবমূলে অজ্ঞান ম্লেচ্ছগণ জ্ঞানী আর্য্যগণ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই পার্থক্যই অস্পৃশ্যতার মূল।

আজকাল প্রত্যেকে প্রশ্ন করেন যে, অস্পৃশ্যতা থাকিলে আমাদের জাতি-নির্ম্মাণ হইবে কি প্রকারে? আজ ভারতের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বর্ণহিন্দু ও অস্পৃশ্য জাতিগণকে লইয়া একটা বৃহৎ জাতি নির্ম্মিত না হইলে, আমরা জগতে জাতিসমূহের নিকট দাঁড়াইতে পারিব না। কিন্তু কথাটা ভুল ও ম্লেচ্ছবুদ্ধিমূলক। ম্লেচ্ছগণ জীবনকে সংগ্রাম মনে করিয়া সাম্যবাদমূলে জাতিনির্ম্মাণ করেন এবং তাহাতে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-বিচার থাকে না। কিন্তু আমাদের জাতি এইভাবে নির্ম্মিত হয় নাই। আমাদের সংগঠন ছিল জ্ঞানীর সংগঠন। অজ্ঞানকে অস্পৃশ্য না রাখিলে, জ্ঞানীর সংগঠন হয় না। হইতে পারে ইহাতে অল্প কতিপয় লোক লইয়া সংগঠন হইবে, কিন্তু এই সংগঠনের যে চরিত্র থাকিবে, তাহা দেখিয়া জগৎকে চমৎকৃত হইতে হইবে। জ্ঞানি-সংগঠনের মূল লঘুগুরু-জ্ঞান। এই জ্ঞানে সাম্যবাদ নাই। গুরু যখন তাঁহার চরিত্র ও মনুষ্যত্ব লইয়া দণ্ডায়মান হন, তখন সদিচ্ছাসম্পন্ন বহু শিষ্য তাঁহার চতুর্দ্দিকে

সমবেত হয়। ইহাতেই লঘুগুরুজ্ঞানমুলে একটি সংগঠন হয়। অজ্ঞানীর সাম্যবাদমূলক সমস্বার্থঘটিত সংগঠন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হয় পক্ষান্তরে, জ্ঞানীর লঘুগুরুজ্ঞানমূলক নিঃস্বার্থ সংগঠন জগতের কল্যাণ-কামনায় অল্পলোক লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে এই জগতে বর্ণাশ্রমীর সংখ্যা অল্প এবং বিবিধ ম্লেচ্ছজাতির সংখ্যা বহু। কিন্তু ইহাতেও বর্ণাশ্রমীর বলক্ষয় হয় না; কেন না, তাঁহারা জগতের গুরুরূপে মান্য থাকেন। এই গুরুগণের কথাই এই গ্রন্থে কীর্ত্তন করিব।

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্ম্মাধর্ম্ম

তথাপি কালমাহাত্ম্যে আজ প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে যে, ম্লেচ্ছজগৎ যখন বহুকথা লইয়া আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছেন, তখন আমাদের এক-কথার মূল্য কোথায়? বস্তুতঃ, এই প্রশ্ন-ব্যপদেশেই আজকাল দেশে জাতীয় উন্নতির নানা উপায় কল্পিত হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে, এই সকল উপায়ের মধ্যে কোনও উপায়ের দ্বারাই দেশের অবস্থার কোনও ইতর-বিশেষ হইতেছে না। পরন্তু দেশ অধোগতির দিকে চলিয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে পুনরায় চিন্তা করিতে হইবে যে, প্রাচীন পথই আমাদের পথ কি না? গত কালের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রমাণিত হয় যে, এই দেশের বৈষয়িক উন্নতিও কোন দেশ অপেক্ষা কম হয় নাই। ম্লেচ্ছের বহুকথার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া এই সকল বহুকথাকে মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া এই দেশ যে চিরকাল বিদ্যমান আছে, তাহার প্রমাণ করার জন্য আমাদিগকে ইতিহাসও তালাস করিতে হইবে না। আমাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, চালচলন, এমন কি, আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত প্রমাণ করিয়া দেয় যে, আমাদের এককথামূলক জীবনযাত্রার একটা জাগতিক মূল্য আছে। প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, আমাদের জাতিভেদ ও আচার-ব্যবস্থার একটা সামাজিক উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্যমূলে আমাদের পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজ সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্বের উপর দাঁড়াইয়া সগৌরবে ইহার মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে পুরাণে, ইতিহাসে, কাব্যে, ব্যাকরণে এমন

কি ভারতের নদী-পর্ব্বতেও ইহার চিহ্ন রহিয়াছে। এই দেশের বিচিত্র ভূমিভাগের প্রতি অংশে, প্রত্যেক নদীতে, প্রতি পর্ব্বতকন্দরে, চৈত্য-বৃক্ষে অথবা পর্ব্বতশৃঙ্গে এক-ভাবে না এক-ভাবে এই এককথার মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইতেছে। এই অবস্থায় আজ যদি আমরা ইহা পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে দেশের প্রকৃতির সহিত আমাদের বিচ্ছেদ হইয়া যাইবে। প্রকৃতিই আমাদের বহুকথার অনুকূলা নহেন। তিনি যদি বহুকথার অনুকূলা হইতেন, তাহা হইলে বহুকথার মাহাত্ম্য এই দেশে পূর্ব্বেই কীর্ত্তিত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়াই ইহা এক-কথার দেশ। বহুকথা ইহার মাটীতে গজায় না। সুতরাং বহুকথার দিকে চলিয়া আমাদের লাভ নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এককথা কাহাকে বলে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এককথা বলিতে ব্রহ্মতত্ত্বকে বুঝায়, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব লইয়া আমরা কি করিব? আজ এই দেশে অন্নাভাবে যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহাতে এইখানে ব্রহ্মতত্ত্বের স্থান কোথায়? বস্তুতঃ, ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত আমাদের জীবনযাত্রার সম্বন্ধ কি, এই প্রশ্নই আমাদের আজকালকার মুখ্য প্রশ্ন। সুতরাং শাস্ত্রকার এই প্রশ্নের কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাই আমাদের উপস্থিত চিন্তার বিষয়। মনুসংহিতা-পাঠে দেখা যায় যে, ঋষিগণ যখন মনুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রভু, ব্রাহ্মণাদিজাতির ধর্ম্ম কি এবং সঙ্করজাতিরই বা ধর্ম্ম কি? তখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব আরম্ভ করিলেন এবং সমগ্র প্রথম অধ্যায়ে তিনি এই তত্ত্বই ব্যাখ্যা করিলেন। তারপর দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি ধর্ম্মকথন আরম্ভ করিলেন। এই দুইটী অধ্যায় যাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক গুরুসন্নিধানে পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে, মানবের জীবনযাত্রার সহিত ধর্ম্মের একটী সম্বন্ধ আছে। বস্তুতঃ, এই সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই আজ

আমরা অধঃপতিত হইয়াছি এবং অনন্ত পিপাসা লইয়া কার্য্যাকার্য্য-বিবেকশূন্য হইয়াছি। এই পিপাসার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, অন্নসমস্যাই ইহার কারণ।

সকলেই জানেন যে, সমাজতন্ত্রবাদ আজকাল মনুষ্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি লুপ্ত করিয়া, রাষ্ট্রকে মনুষ্যের অন্নদাতা সাব্যস্ত করিয়াছেন; কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, পাশ্চাত্য দেশে চিরকালই রাষ্ট্র মনুষ্যের অন্নদাতা। যে দেশে সমাজতন্ত্রবাদ নাই, সেই দেশে যে আইন-নিয়ম আছে, তাহাতে কতকগুলি মনুষ্যের অন্নব্যবস্থা হয় মাত্র। ধনের কেন্দ্রীকরণ ইহার কারণ। পরস্বহরণে দক্ষ ও লোভী মনুষ্য-সমুদয় বাহুবলের আশ্রয়ে থাকিয়া, দেশের ধন কেন্দ্রীকৃত করিয়া অবশিষ্ট লোককে দরিদ্র ও উপবাসী রাখিতেছে। ইহারাই আবার আইনকর্ত্তা। ইহাদের আইন যত জন লোকের অন্ন-সংস্থান করিতে পারে, তত জন লোকই অন্ন পায় এবং অবশিষ্ট লোক বেকার থাকে। ইহার অর্থ এই যে, অন্নপ্রাপ্তি-বিষয়ে ব্যক্তির কোনও নিশ্চিন্ত অবস্থা নাই। যে ব্যক্তি অন্নপ্রাপ্ত হয়, সে যেমন চিন্তিত, যে ব্যক্তি অন্নপ্রাপ্ত হয় না, সে তেমন দ্বিগুণ চিন্তিত। আইন-নিয়মই একজনকে অধিক অন্ন দেয় এবং আর একজনকে অল্প অন্ন দেয়। তারপর এইরূপ তারতম্য হইয়া দেখা যায় যে, কতকগুলি লোক অন্ন পায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ যে, রাজমন্ত্রী ১০,০০০৲ হাজার টাকা বেতন পাইবেন, ইহা রাষ্ট্রের ব্যবস্থা। আবার পেয়াদা ৫৲ টাকা বেতন পাইবে, ইহাও রাষ্ট্রের ব্যবস্থা। এদিকে বাণিজ্য-ব্যবসা সম্বন্ধীয় আইন-নিয়ম ও প্রথা যে ব্যবস্থা করিয়াছে, তদনুসারে ব্যবসা চলিয়া কতকগুলি লোক অধিক পায় এবং কতকগুলি লোক কম পায়। প্রথা ও ব্যবস্থা-গুলিই মানুষকে এমন একটা স্রোতে ফেলিয়া দেয়, যাহাতে কাহারও উপার্জ্জন বেশী হয় এবং কাহারও উপার্জ্জন কম হয়। ভূম্যধিকার-

সম্বন্ধীয় আইন-নিয়মেরও এইরূপ একটা স্রোতঃ আছে। এই স্রোতে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া মানুষ চলে এবং তাহাতেই তাহার অন্নের কম-বেশী হইয়া থাকে। আর যাহারা এই স্রোতে পড়ে না, তাহারা বেকার থাকে। এইরূপে দেখা যায় যে, কতকগুলি দলবদ্ধ ও পশুবলশালী মনুষ্যের অন্যায় ব্যবস্থায় জগৎ আজ দুঃখকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহাই মানববুদ্ধি-সম্ভূত নীতি এবং ইহাই মানবের বুদ্ধিভ্রম-জনিত দাসত্ব।

এইরূপে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মনুষ্যই একটা দলবদ্ধ পশুবলশালী মনুষ্যসমষ্টির অন্নদাস। সমাজতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা প্রত্যক্ষ-ভাবে এই দাসত্বকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিণত করিয়াছে। পক্ষান্তরে, পরোক্ষ-ভাবে সমাজের এই দাসত্ব চিরকালই পাশ্চাত্য-দেশে বিদ্যমান আছে। এইজন্য বেকার-সমস্যা চিরকালই ম্লেচ্ছদেশকে ব্যতিব্যস্ত রাখিয়াছে। পূর্ব্বে এই বেকার-সমস্যা-নিবারণের জন্য ম্লেচ্ছদেশের রাজগণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন এবং বেকার মনুষ্যগণ সৈন্যশ্রেণীতে নিযুক্ত হইয়া পররাষ্ট্র-লুণ্ঠনক্রমে অন্ন পাইত।

আজও ইহাদের উপনিবেশস্থাপনের প্রথা ও পররাষ্ট্র-জয় ইহার প্রমাণ। এই প্রথানুসারে দক্ষিণ-আফ্রিকা ও আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে এবং জাপান কর্ত্তৃক সেই দিন মাঞ্চুরিয়া দখল হইয়াছে।

আজকাল আমরা যে ধর্ম্মাধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করি না এবং নীতিকে মানববুদ্ধি-প্রসূত একটা বন্দোবস্ত (Convention) বলিয়া মনে করি, তাহা এই দাসবুদ্ধি-প্রসূত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ফল।

এখন প্রশ্ন এই যে, অন্নের উৎপাদন ও বণ্টন মানুষের হাতে কি না; যদি এই দুইটী কাজ মানুষের হাতে থাকে, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম মানবীয় বন্দোবস্ত মাত্র। আর যদি ইহা

মানুষের হাতে না থাকে, তাহা হইলে ইহা অবধারিত সত্য যে, জগতে ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে। এই অবস্থায় এই প্রশ্নের মীমাংসার উপরেই ধর্ম্মাধর্ম্মের অস্তিত্ব নির্ভর করে। প্রথমতঃ, ধনের উৎপাদন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য অর্থনীতিশাস্ত্র বলেন যে, ভূমি, শ্রম ও মূলধন দ্বারা অন্নের উৎপাদন হয়। কিন্তু ইহাতে একটা মৌলিক ভ্রান্তি আছে। ভূমি হইতে যদিও ধনের উৎপাদন হয়, তথাপি বৃষ্টিদ্বারা মাটী না ভিজিলে ধনের উৎপাদন হয় না। যে দেশে ইন্দারা হইতে জল উঠাইয়া ধনের উৎপাদন হয়, তাহাকে কূপমাতৃক দেশ বলে এবং যে দেশে নদীর জল-দ্বারা ধনের উৎপাদন হয়, তাহাকে নদীমাতৃক দেশ বলে। একটি অনাবৃষ্টি হইলে কূপ-নদী সমস্ত শুকাইয়া যায় এবং অতিবৃষ্টি হইলে উৎপন্ন শস্য ভাসিয়া যায়। তারপর মূষিক, শলভ ও শুক প্রভৃতি দ্বারা ফসল নষ্ট হয়। এই অবস্থায় ধনের উৎপাদন মনুষ্যের হস্তে আছে, এই কথাতে একটা মৌলিক ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই জগৎ একটি বিরাট্ অন্নভাণ্ডার। শাক-শস্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবজন্তু, কীট সমস্তই অন্ন। জঙ্গম জীবসমূহের পক্ষে শাকশস্যাদি স্থাবর পদার্থ অন্ন।

ব্যাঘ্রাদির জন্য হরিণাদি অন্ন। এইরূপ ক্ষুদ্র মৎস্যগুলিও বৃহৎ মৎস্যের অন্ন। এই সকলের উৎপত্তি যেমন ভগবদিচ্ছায় হয়, ইহাদের বণ্টনও তেমন ভগবদিচ্ছায় হয়। মানুষ তাহার হিসাব রাখিতে পারে না। একটী ক্ষুদ্র কৃমিকীট কি পরিমাণ আহার করে, তাহার হিসাব মানুষ জানে না। এই অবস্থায় তাহার হিসাবে ভুল হইয়া যদি একটী কৃমি-কীটও উপবাসী থাকে, তাহা হইলে জগৎপাতার নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। সুতরাং উদিত হইতেছে যে, এই বিষয়ে জগৎপাতারই একটা

নিয়ম আছে। ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে পাপ হয়। এই কারণে উপস্থিত বিষয়ে মহাভারত বলিতেছেন ঃ—

"ধনাৎ স্রবতি ধর্ম্মো হি ধারণাদ্বেতি নিশ্চয়ঃ।
অকার্য্যাণাং মনুষ্যেন্দ্র স সীমান্তকরঃ স্মৃতঃ॥"

মহাভারতং শান্তিপর্ব্ব, ৯০ অধ্যায়।

অনুবাদ ঃ—হে মনুজেন্দ্র! যিনি প্রাণিগণকে ধনাদি প্রাপ্ত করাইবার জন্য কৃপান্বিত হন অথবা ধারণ করিয়া স্বয়ংও ধৃত হন, তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। তিনি অকার্য্য সকলের সীমান্তকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

এই অনুবাদ অপেক্ষা মহামতি নীলকণ্ঠের টীকা অনেক পরিষ্কার যথা ঃ—ধর্ম্মপদস্য দ্বেধা ব্যুৎপত্তিমাহ—ধনাদিতি। ধনবাচী নান্তো ধনশব্দঃ অর্ত্তের্গত্যর্থান্মক্ প্রত্যয়ে ততো নলোপগুণৌ ধনাদি স্রবতীতি ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। ধনাদিতি পঞ্চমী তু ধনং প্রাপয়িতুং স্রবতি দ্রবতি কৃপায়ত ইতি ল্যব্লোপে জ্ঞেয়া। ধারণাদ্বা ধর্ম্মঃ, ধৃঞো মন্ প্রত্যয়ঃ।"

নীলকণ্ঠীয় টীকার অনুবাদ ঃ—এইখানে ধর্ম্মপদের দুই প্রকার ব্যুৎপত্তি বলা হইয়াছে, (১) ধনবাচী নান্ত ধনশব্দ গত্যর্থ ধৃ ধাতু মক্ প্রত্যয়-যোগে ন্ লোপ গুণ হইয়া ধনাদি যিনি স্রাব করেন, তিনিই ধর্ম্ম, এই প্রকার অর্থ হইয়াছে। ধনাৎ কথাটা পঞ্চমী। এই পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ এই যে, সকলকে ধন পাওয়াইবার জন্য যাহার স্রাব হয় অর্থাৎ কৃপাদ্বারা যিনি দ্রবীভূত হন, তিনিই ধর্ম্ম। সুতরাং ইহা ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী বলিয়া বুঝিতে হইবে, অথবা ধৃ ধাতু মক্ প্রত্যয় করিয়া যিনি ধারণ করেন, তিনিই ধর্ম্ম, এইরূপ অর্থও হইতে পারে।

ধর্ম্ম শব্দের এই ব্যাখ্যা দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমগ্র বিশ্বে যে বিরাট্ অন্নভাণ্ডার আছে, তাহা হইতে যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার

প্রয়োজন-মত অন্ন পাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত যিনি করেন, তিনিই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম কর্ম্মমূলক। কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, এই বিশ্বের ধনরাশির উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় মানুষের বুদ্ধিমূলে হইয়া থাকে। এমন কি, মানুষের কর্ম্ম-মূলে পশুপক্ষীও আহার পায়। আবার অনেক সময়ে জঙ্গল আবাদ করিয়া মানুষ বন্য-পশুর বংশ-ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং পক্ষীগুলিও আহার পায় না। গৃহপালিত পশু-পক্ষীর আহারও এইরূপ মানবের কর্ম্মমূলে বণ্টিত হয়। ইহাতে যদিও মনে হয় যে, সমস্তই মানব-বুদ্ধিমূলে হইতেছে, তথাপি প্রকৃতি এই বুদ্ধিকে ধর্ম্মবুদ্ধি ও অধর্ম্মবুদ্ধি নামক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মানব-বুদ্ধির এই বিভাগ বাসনামূলক। যখন যে বাসনা প্রবল হয়, তখনই সেই বাসনা-মূলে কার্য্য হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। মানবের ইহাতে কোনও স্বাধীনতা নাই। তাহার বুদ্ধি ভগবদিচ্ছা-মূলে শুভাশুভ দুই বাসনার অধীন। শুভ-বাসনা ধর্ম্ম এবং অশুভ-বাসনা অধর্ম্ম। এই সকল বাসনার দুইটি স্রোতঃ আছে। এক স্রোতঃ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে উপবাসী রাখিয়া কেবল কতকগুলি মানুষের সুখ-সম্পদ্ বিধান করে এবং অপর স্রোতঃ সমগ্র বিশ্বে অন্ন বিলাইয়া দিতে চায়। এই জন্য ভগবান মনু বলিতেছেন ঃ—

> "কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবেচয়ৎ।
> দ্বন্দ্বৈরযোজয়চ্চেমাঃ সুখদুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ ॥"
>
> মনু—১ম অধ্যায় ; ২৬ শ্লোক।

অনুবাদ ঃ—প্রজাপতি কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মের বিভাগ নিমিত্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুইটি কর্ম্মকে পৃথক্ করিয়া সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম্মের ফল সুখাদি ও অধর্ম্মের ফল দুঃখাদি।

এই শ্লোকের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কর্ম্মের বিভাগের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু ফলের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই ফলটা বিভক্ত হইয়া যায়।

এই শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিতেছেন :—"কঃ পুনঃ কর্ম্মণাং ফলবিভাগোঽত উক্তং দ্বন্দ্বৈরযোজয়ং সুখদুঃখাদিভিঃ। ধর্ম্মস্য ফলং সুখধর্ম্মস্য দুঃখম্। অত উভয়কারিণোদ্বন্দ্বৈর্য্যোজ্যন্তে ধর্ম্মকারিত্বাৎ সুখেনাধর্ম্মকারিত্বাৎ দুঃখেন। দ্বন্দ্বশব্দোঽয়ং রূঢ়্যা পরস্পরবিরুদ্ধেষু পীড়াকরেষু বর্ত্ততে শীতোষ্ণবৃষ্ট্যাতপক্ষুৎসৌহিত্যাদিষু। অনাদিগ্রহণং সামান্যবিশেষভাবেন জ্ঞেয়ম্। কেবলৌ সুখদুঃখশব্দৌ স্বর্গনরকয়োর্ব্বাচকৌ নিরতিশয়ানন্দপরিতাপবচনৌ বা। বিশেষস্বর্গগ্রামপুত্রপশ্বাদিলাভস্ত-দপহারশ্চাদিশব্দস্য বিষয়ঃ। কর্ম্মণাং পূর্ব্বমুৎপত্তিরুক্তাঽনেন তেষামেব প্রয়োগবিভাগঃ ফলবিভাগশ্চ প্রজাপতিনা কৃত ইতি প্রতিপাদ্যবিবেকঃ॥"

মেধাতিথিকৃত ভাষ্যের অনুবাদ :—কর্ম্মের আবার ফলবিভাগ কি? ইহাই এইখানে বলা হইয়াছে যে, সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বকে কর্ম্মের সহিত যুক্ত করিয়া ভগবান কর্ম্মের ফলবিভাগ করিয়াছেন। যথা :—ধর্ম্মের ফল সুখ ও অধর্ম্মের ফল দুঃখ। যাহারা ধর্ম্মও করে, অধর্ম্মও করে, তাহারা সুখ-দুঃখ উভয়ই পায়। এইখানে দ্বন্দ্ব-শব্দ রূঢ়-অর্থে পরস্পর-বিরুদ্ধ ও পীড়াকর বস্তুতে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা :—শীত-উষ্ণ; রৌদ্র-বৃষ্টি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও তাহার নিবৃত্তি ইত্যাদি। আদিশব্দ দ্বারা সুখ-দুঃখ শব্দ সামান্য ও বিশেষ এতদুভয় অর্থেই বুঝিতে হইবে। কেবল সুখদুঃখ শব্দ প্রযুক্ত হইলে, তদ্দ্বারা স্বর্গের সুখ এবং নরকের দুঃখকে বুঝায়, অর্থাৎ—ইহাদ্বারা নিরতিশয় আনন্দ ও পরিতাপকে বুঝায়। কিন্তু এইখানে আদি শব্দ থাকায়, সুখদুঃখ এই দুইটী কথা বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া স্বর্গ-গ্রাম, পুত্র-পশু ইত্যাদি লাভ এবং তাহার অলাভজনিত দুঃখকে বুঝাইতেছে।

এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মেধাতিথি এইখানে বলিতেছেন যে, কর্ম্মের পূর্ব্বোৎপত্তি কথার দ্বারা তাহার প্রয়োগ-বিভাগ ও ফলবিভাগ সমস্তই প্রজাপতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভাষ্যকার এইখানে বুঝাইয়াছেন যে, মনু আদি শব্দ দ্বারা কর্ম্মের ফলকে ঐহিক ও পারত্রিক হিসাবে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা :—

(১) ঐহিক ফল পুত্র-পশ্বাদি ও গ্রামাদিলাভ।

(২) পারত্রিক ফল স্বর্গ ও মোক্ষলাভ।

এই দুইটী ফল যেখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইখানে সুখ এবং যেখানে তাহা না পাওয়া যায়, সেইখানে দুঃখ হয়। এই কারণেই কর্ম্মকে শুভাশুভ দুই প্রকার বাসনা-স্রোতের অধীন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জীবোৎপত্তির পূর্ব্বেই কর্ম্মোৎপত্তি দ্বারা বিধাতা এই নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণে জীব এই নিয়মের অধীন। ইহার নাম কর্ম্মের ফলবিভাগ। কিন্তু মেধাতিথি এইখানে আর একটী কথা বলিয়াছেন, যাহা আজ কাল আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন যে, কর্ম্মের ফল-বিভাগ যেমন প্রজাপতি-কৃত, ইহার প্রয়োগ-বিভাগও তেমন প্রজাপতিকৃত। কথার অর্থ এই যে, কর্ম্মের ফল যেখানে সুখদুঃখরূপে দুই ভাগে বিভক্ত, সেইখানে কর্ম্মের প্রয়োগবিধিও দুই প্রকার হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কথাটা বুঝিতে হইলে, একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। মনে কর, একটী বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। স্বভাবতঃই এই অগ্নি-নির্ব্বাণ করা তোমার কর্ম্ম। তুমি যদি দমকল লইয়া এই অগ্নি-নির্ব্বাণ করিতে যাও, তাহা হইলে এই কার্য্য তোমার পক্ষে সহজ হইবে এবং যদি তাহা না লেও, তাহা হইলে কার্য্যটী দুঃসাধ্য হইবে। অথবা

দমকল না থাকিলেও, নিকটে জল থাকিলে এই কার্য্য যেমন সহজ হইবে, তাহা না থাকিলে তেমন সহজ হইবে না। কর্ম্মপ্রয়োগে এইরূপ তারতম্য হইতে বুঝিতে পারিবে যে, জগতের প্রত্যেক কর্ম্মই দুঃসাধ্য ও সহজসাধ্য রূপে দুই ভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগ লইয়া কর্ম্মের প্রয়োগ দুই প্রকার। একটী শুভ প্রয়োগ এবং অপরটী অশুভ প্রয়োগ। এই কারণে সমাজ-ব্যবস্থাও জগতে দুই ভাগে বিভক্ত। মানুষ যেখানে পরস্পর পরস্পরের সহায় হয়, সেইখানে ধনলাভও সহজ হয় এবং মানুষ যেখানে পরস্পরের শত্রু হয়, সেইখানে ধনলাভও কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং মেধাতিথি-বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, প্রজাপতি জগতের কর্ম্ম-প্রয়োগবিষয়েও একটী নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন। নিয়মটী এই যে, সমাজে যেখানে মানুষ মানুষের সহায় না হইয়া পরস্পর জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়, সেইখানে মানুষ দুঃখ পায় এবং যেখানে ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহায় হয়, সেইখানে ইহারা সুখ পায়। প্রত্যেক কর্ম্মের ফল ইহার প্রয়োগের উপর নির্ভর করে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, যদি তাহাই হয়, তবে মানব-প্রকৃতিতে জীবন-সংগ্রাম-বুদ্ধি দেখি কেন? উত্তর হইবে যে, তাহা না হইলে এই জগতে সুখ-দুঃখ দুই বস্তু থাকে না। অন্ধকার না থাকিলে যেমন আলোকের মূল্য থাকে না, তদ্রূপ জীবন-সংগ্রাম না থাকিলে সত্যাদি ধর্ম্মের মূল্য থাকে না। জীবন-সংগ্রাম ও সত্যাদি ধর্ম্ম পরস্পরবিরোধী বলিয়া বর্ত্তমান সমাজে সত্যাদি ধর্ম্ম নাই। জীবন-সংগ্রাম অধর্ম্ম এবং সত্যাদি ধর্ম্ম। সত্য যেমন মানুষের মধ্যে পরস্পর সহায়তার ভাব উদ্দীপন করে; মিথ্যা তেমন তাহাদের মধ্যে জীবনসংগ্রামের উৎপত্তি করে। এইরূপে এই জগতে মানব-প্রকৃতির মধ্যে শান্তি ও সংগ্রাম; এই দুইটী ভাবের পরস্পর-বিরোধী ক্রিয়া থাকায়, কর্ম্মের

প্রয়োগটা শান্তি ও অশান্তি উভয়মূলক। মানবচরিত্রে শান্তির ভাব ও সাংগ্রামিক ভাব উভয়ই আছে। এই প্রকৃতিতে যখন শান্তির ভাব প্রবল হয়, তখন প্রত্যেকে পরস্পরের সহায়ভাবে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের প্রয়োজন বোধ করে। এই সময়ে, এই প্রকৃতিতে সাংগ্রামিক ভাবটার নিগ্রহ হওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই নিগ্রহ একের চেষ্টাতে অসম্ভব হয়। আমার ভিতরে যদি শান্তির ভাব প্রবল থাকে, তাহা হইলে আমি আমার অন্তরস্থ সাংগ্রামিক ভাবকে নির্য্যাতন করিয়া রাখিতে পারি। কিন্তু যাহার ভিতরে সাংগ্রামিক ভাব স্বভাবতঃ প্রবল এবং যে ব্যক্তি লোভবশতঃ পরস্বাপহরণ না করিয়া পারে না, সেই ব্যক্তি একটু সুযোগ পাইলেই আমার সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক আমার শান্তির ভাব নষ্ট করিয়া দিবে। তখনই আবার দুষ্কার্য্য-গোপনের জন্য মিথ্যার প্রয়োজন হইবে। জীবনসংগ্রাম এই মিথ্যার খেলা। সুতরাং সমাধান হইতেছে যে, এই জগতে মানুষ যখন একক নহে, তখন সমাজ যদি লোভী ও অশান্তিপ্রিয় সাংগ্রামিক প্রকৃতিকে দমন না রাখে, তাহা হইলে শান্তিপ্রিয় মনুষ্যও সাংগ্রামিক প্রকৃতি লাভ করিয়া সমাজের শান্তি-ভঙ্গ করিতে বাধ্য হয়।

এইরূপে মানব-কর্ম্মের সামাজিক প্রয়োগ দুই প্রকার। (১) যেখানে লোভী ও অশান্তিপ্রিয় প্রকৃতির প্রশ্রয় হয়, সেইখানে জীবনসংগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানবের মধ্যে দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার উৎপত্তি হয়। (২) আর যেখানে সমগ্র সমাজ সাংগ্রামিক প্রকৃতিকে দমন রাখার চেষ্টা করে, সেইখানে এই প্রকৃতির মনুষ্যগণের সামাজিক স্থান নিম্নস্তরে পড়িয়া যায়। সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, যাহাদের বিষয়তৃষ্ণা অত্যধিক এবং তজ্জন্য লোভও অধিক, তাহারা অপরকে পরাজিত করিয়া বড় হওয়ার চেষ্টা করে। এইরূপ প্রকৃতির নাম সাংগ্রামিক প্রকৃতি। আবার

ইহাও দেখা যায় যে, যদিও মানুষের মধ্যে প্রত্যেকেরই বিষয়তৃষ্ণা আছে, তথাপি কেহ কেহ অঋণী-অপ্রবাসী ভাবে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট। এইরূপ প্রকৃতির নাম শান্তিপ্রিয় প্রকৃতি। সমগ্র সমাজে যেখানে শান্তিপ্রিয়তার প্রাবল্য থাকে, সেইখানে সকলের চেষ্টায় সাংগ্রামিক প্রকৃতির মনুষ্য নিম্নস্তরে যাইয়া শান্তিপ্রিয় মনুষ্যগণের আদেশ-উপদেশের অধীন থাকে। এইরূপে শান্তিপ্রিয় সমাজে গুণানুসারে মানুষের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আবার শান্তিপ্রিয় মনুষ্যগণও সকলে এক শ্রেণী নহে। দেখ, তুমি আমি উভয়ই শান্তিপ্রিয়। কিন্তু আমি ঈশ্বর-চিন্তায় দিন অতিবাহিত করি; কিন্তু তুমি তাহা পার না। আমি সামান্য আয়ে সামান্য আহার করিয়া থাকিতে পারি; তুমি দধি, দুগ্ধ, মৎস্য, মাংস ও ঘৃতাদি না খাইয়া পার না। হয়ত তাহাতেও তোমার শরীরই পোষণ পায় না। আবার তোমাদের মধ্যেও সকলে সকল কার্য্যে রুচি-বিশিষ্ট নহে। শ্যাম কৃষি-বাণিজ্যপ্রিয়; কিন্তু তুমি বলশালী ও ন্যায়-পরায়ণ বলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষুদ্রতাকে তেমন ভালবাস না। পরন্তু লোভী দুষ্টকে দমন করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিয়া সমাজের শান্তিরক্ষার জন্য যত্নপরায়ণ থাক। এই অবস্থায় তুমি আমি উভয়ে শান্তিপ্রিয় হইলেও, আমাদের কাহার স্থান কোনখানে হইবে, ইহা একটী জটিল সমস্যা। আমাদের শাস্ত্রকার এই সমস্যার সমাধান করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ শান্তিপ্রিয় ঈশ্বরনিষ্ঠ মনুষ্যই সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরে থাকিয়া বলশালী ও ন্যায়পরায়ণ শান্তিরক্ষকের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতা রক্ষা করিবেন। ঈশ্বরনিষ্ঠা একদিকে যেমন শান্তিপ্রিয়তার মূল, অপরদিকে ইহা তেমন ন্যায়পরতারও মূল। তুমি ভোগী ও অল্প আয়ে চলিতে অক্ষম বলিয়া তোমার ভোগপ্রিয়তা তোমাকে জীবনসংগ্রামের দিকে আকর্ষণ করে। এই কারণে যে ব্যক্তি কষ্টসহিষ্ণু ও অল্পে সন্তুষ্ট, তাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা, শান্তি-

প্রিয়তা ও ন্যায়পরতা স্থায়ী হয়। আবার এই গুণগুলির স্থায়িত্বের দরুণ সে সমাজের শীর্ষস্থানে বসিবার যোগ্য। কিন্তু তাঁহার পরই তোমার স্থান। কারণ, তুমি না থাকিলে সংগ্রামপ্রিয় লোভী ব্যক্তি তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। এইরূপে গুণানুসারে প্রত্যেকের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় এবং তৎপর জীবনসংগ্রামবাদীকে সকলের আদেশ উপদেশের (Control) অধীন রাখিয়া সমাজ চলে।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সমাজ একটি যন্ত্রের ন্যায়। মানুষগুলি পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছে, অথচ ইহাদের মধ্যে সংযোগ হইয়া সমাজ নির্ম্মিত হয়। ইহার অংশগুলি প্রকৃতি-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই অংশগুলির নাম ব্যষ্টি বা ব্যক্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিই মনুষ্য-সংজ্ঞাবিশিষ্ট এবং একটী মনুষ্যকেও কেহ প্রস্তুত করিতে পারে না। বন্দুকের অংশগুলি যেমন নির্ম্মিত থাকে এবং পরে তাহা লাগাইয়া লইলে বন্দুকটী খাড়া হইয়া যায়, সমাজও তদ্রূপ। প্রত্যেক মনুষ্য ইহার অংশ এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট। বন্দুকের অংশগুলি যেমন ঠিক ঘরে না বসিলে, বন্দুকটি ব্যবহারের যোগ্য হয় না, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধও তদ্রূপ। ইহাদের সংযোগ প্রকৃতিকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। এই নির্দ্দিষ্ট সংযোগানুসারে যদি সমাজ নির্ম্মিত না হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি ক্রুদ্ধা হইয়া সমাজে বিপ্লব উপস্থিত করেন। এই সংযোগের জন্য প্রত্যেক মনুষ্যের এক একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। যেখানে মানুষটি নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়া না বসে, সেইখানেই কুকর্ম্ম সাধিত হইয়া দুঃখ হয় এবং যেখানে মানুষ নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়া বসে, সেইখানেই সৎকর্ম্ম সাধিত হইয়া সুখ হয়। এই সুখ-দুঃখই যথাক্রমে অন্নলাভ ও অন্নহীনতাজনিত হাহাকার-রূপে প্রকটিত হয়। ইহার নাম কর্ম্মের প্রয়োগ-বিভাগ। এই প্রয়োগ-বিভাগানুসারে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এক প্রয়োগানুসারে সমাজে জাতিভেদ

থাকে এবং ইহাতে দুষ্ট-দমন সহজ হয়। পক্ষান্তরে, যেখানে জাতিভেদ থাকে না, সেইখানে দুষ্টের প্রভাবে সমাজ এমন ব্যতিব্যস্ত থাকে যে, শিষ্ট আর মাথা তুলিতে পারে না। তখন মনে হয় যে, জগতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, পরন্তু যাহা আছে তাহা (Convention) মাত্র। অতএব অপরকে ভয় দেখাইয়া, যাহার যতটুকু আধিপত্য করা সম্ভব, তাহা করিয়া লও। এক কথায় বলিতে গেলে, জাতিভেদহীন সমাজ এই জগদ্ব্যবস্থাকে এই দৃষ্টিতে দেখিয়া ইহাকে বিপ্লবের দিকে লেয়। যথা :—

"এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥"

(গীতা, ১৬ অধ্যায় ; ৯ শ্লোক)

অনুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া নষ্টাত্মা, অল্পবুদ্ধি, উগ্র-কর্ম্মা ব্যক্তিগণ প্রাণিপণের বিনাশার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রথম অধ্যায়ে আজিকালিকার জগতের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মের অভাববোধমূলক একটা ভ্রান্ত দৃষ্টির ফল। এই ভ্রান্ত দৃষ্টিই সর্ব্বপ্রকার উগ্র-কর্ম্মের (Violence) কারণ। আজ Darwin পড়িয়া আমরা মনে করি যে, প্রত্যেককে জীবনসংগ্রামের সুযোগ দেওয়াই সমাজের কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা বুঝি না যে, সমাজ-যন্ত্র-নির্ম্মাণের জন্য বিধাতা প্রত্যেক মনুষ্যের নিমিত্ত এক একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। এই স্থান নির্দ্দেশ যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের সমাজ সর্ব্বপ্রকার সাময়িক ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর টিকিয়া থাকিতে পারিত না।

যাহা হউক, এইরূপে কর্ম্মের প্রয়োগানুসারে সমাজ যথাক্রমে সত্য ও অসত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতে ধর্ম্মাধর্ম্ম-ব্যবস্থার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এই কারণে কর্ম্মের প্রয়োগের উপর ধর্ম্মের ব্যবস্থা নির্ভর করে। আমরা জাত

যাওয়াকে ভয়ের চক্ষে দেখিবার কারণ এই যে, জাতি গেলেই মানুষ লোভের বশে উগ্রকর্ম্মা হইয়া পড়ে। সমগ্র সমাজকে পুলিসে পরিণত করিলেও, এই উগ্রকর্ম্ম নিবারিত হয় না। সুতরাং বুঝিয়া লও যে, জাতিভেদ সর্ব্ব-ধর্ম্মের ভিত্তি। পাশ্চাত্য-শিক্ষা এই দেশে জাতিভেদ-নাশের প্রশ্রয় দিয়া উগ্রকর্ম্মেরই সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা নষ্ট হইলে, ধন কেন্দ্রীভূত হইয়া সমাজে হাহাকার উঠে এবং তৎপরে উগ্রকর্ম্ম আরব্ধ হয়। বর্ত্তমানে ইহার কেবল আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। যেদিন পাশ্চাত্য ইতিহাস একটা মিথ্যা কথার সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছে যে, ব্রাহ্মণাদি জাতি এক সময়ে অন্য দেশ হইতে আসিয়া এই দেশ জয়পূর্ব্বক প্রাচীন অধিবাসিগণকে দাস করিয়াছে এবং তাহাদিগকে শূদ্রনামে অভিহিত করিয়াছে, সেই দিনই জাতিভেদে ঘুণ ধরিয়া উগ্রকর্ম্মের বীজ রোপিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, জাতিভেদ জীবন-সংগ্রাম-নীতিতে হয় নাই। ইহা যে নীতিতে হইয়াছে, তাহার আভাষ পূর্ব্বে দিয়াছি।

চতুর্থ অধ্যায়

ঘোর আত্মবিস্মৃতি ও জাতীয় অধঃপতন। আমাদের ধারকরা স্বদেশপ্রেম।

ধর্ম্মের এই ব্যাখ্যা ভুলিয়া যাওয়ায় আমাদের এমন এক আত্মবিস্মৃতি আসিয়াছে যে, আমরা আজ বহু-কথার হিড়িকে পড়িয়া এই এক-কথাকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিতেছি। প্রথমতঃ, মুসলমান-রাজত্বে এই আত্ম-বিস্মৃতিমূলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সাব্যস্ত করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্ম আমাদের জীবনব্যাপী বস্তু নহে। ইহাকে সমাজে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার কোনও প্রয়োজন নাই। বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে সময়ে সময়ে অন্যায়ার্জ্জিত বিত্তে স্বজনের ভরণপোষণ ব্যতীত যখন বর্ত্তমানে আমাদের গত্যন্তর নাই, তখন অবস্থানুসারে সত্যমিথ্যা উভয়ের আচরণদ্বারাই আমাদিগকে জীবনধারণ করিতে হইবে। অতএব সংসারকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও। ধর্ম্ম থাকিবে যাগযজ্ঞে, জাতিভেদে ও সম্ভবমত আচার-পালনে এবং সংসার চলিবে রাজার ব্যবস্থায়। এইরূপে আচারগুলি এই সুবিধাবাদ-নীতির উচ্ছৃঙ্খল স্রোতে পড়িয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল এবং জীবনযাত্রায় স্বধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়া পরধর্ম্ম-গ্রহণমূলে জীবন-সংগ্রাম আসিয়া পড়িল। তারপর এই জীবন-সংগ্রাম হিন্দুচরিত্রের ন্যায়-নিষ্ঠা ও সত্যনিষ্ঠা দুর্ব্বল করিয়া ইহাকে রাজপ্রতিষ্ঠিত কালেরই যোগ্য করিল। এই সময়ে আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষ যদি বুঝিতেন যে, ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কেবল পারত্রিক নহে, ইহার ঐহিক উদ্দেশ্য সমাজে সত্যাদি-প্রতিষ্ঠামূলে সংসারকে সুখের সংসারে পরিণত করা, তাহা হইলে তাঁহারা প্রাণপণে

স্বধর্ম্মরক্ষা করিয়া সমগ্র হিন্দু-জাতিকে স্বাধীনতালাভের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইল না। দিন দিন এই জাতি যোগ্যতা হারাইতে লাগিল। তারপর বর্ত্তমান অবস্থায় পড়িয়া এই জাতি এই যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া এখন বহু-কথার দিকে চলিয়াছে। আত্মবিস্মৃতি ইহার মূল।

যোগ্যতা দুই প্রকার:—চরিত্রমূলক যোগ্যতা ও বাহুবলজনিত যোগ্যতা। বাহুবলমূলক যোগ্যতা বহু-কথার ফল এবং চরিত্রমূলক যোগ্যতা এক-কথার ফল। ইহাদের উভয়ের স্বরূপ-প্রদর্শনক্রমে আমাদের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের নিমিত্তই আজ এই গ্রন্থের অবতারণা হইয়াছে। গ্রন্থের উদ্দেশ্য আমাদের পূর্ব্বস্মৃতির জাগরণ। এই বাত-ব্যাধিগ্রস্ত সমাজদেহে পূর্ব্বস্মৃতি না আসিলে, ইহার মৃত্যু অনিবার্য্য। কথাটা এখন বিস্তারিতভাবে বলা যাউক। সকলেই অবগত আছেন যে, আজকাল দেশে যেমন অশান্তি, বিদেশেও তেমন অশান্তি। এই অশান্তি-নিরাকরণের জন্য বিদেশে Communism, Fascism প্রভৃতি নানা মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই সকল মতবাদ এই দেশের লোক গ্রহণ করায় দেশে নানারূপ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। ফলে, বিদেশীয় মতবাদই এই দেশের অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তারপর রাজশক্তি যে ভাবে এই দেশকে চালাইতেছেন, তাহাতে দেশে অলক্ষিতে ধন কেন্দ্রীভূত হইয়া বেকার-সমস্যার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার ফলেই আবার দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় Communism প্রভৃতি বিদেশীয় মতবাদ এই দেশে প্রচলিত করার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে একদিকে যেমন Government-এর সহিত ইহাদের সংঘর্ষণ হইতেছে, অপরদিকে তেমন এই সকল বিদেশীয় মতবাদের ফলেই ইঁহারা এতদ্দেশের সমাজ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ইঁহাদেরই চেষ্টার ফলে এই দেশে বিবাহের বয়স-নির্দ্ধারক আইন (Sarda Act) হইয়াছে। তাহার পর, ইঁহারা ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া অসবর্ণ-বিবাহ প্রভৃতি নানাবিষয়ক আইনের প্রস্তাব তুলিতেছেন। প্রত্যেকেই বলেন যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু উদ্দেশ্যের কোনও ফল হয় না। কর্ম্মেরই ফল হয়। এই কারণে সমাজ-সংস্কারকগণের প্রতি কর্ম্মে সমাজের প্রাচীন গঠন ভাঙ্গিয়া ইহার চরিত্র নষ্ট হইতেছে এবং তাহার ফলে দেশে অশান্তির বৃদ্ধি হইতেছে। সর্ব্বোপরি, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন বিষয়ক একটা আন্দোলন এই দেশে উঠিয়া সমাজের ভিতরে একটা বিরোধের বীজ-বপন করিয়া দিয়াছে। আজ যদি কোনও কারণে ইংরাজ Government এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে যে আমাদের কি উপায় হইবে, তাহা বুঝা যায় না। আমাদের এমন শক্তি নাই যে, বিদেশীয় আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করি। আজ দুই শত বৎসর যাবৎ আমরা ইংরাজ-রাজত্বের সহিত পরিচিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা তাঁহাদের স্বভাব জানি এবং তাঁহারাও আমাদের স্বভাব জানেন। এই অবস্থায় যদি তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া এই দেশ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে এই দেশে বর্ত্তমানে যে বিরোধের বীজ রোপিত হইয়াছে, তাহা গুরুতর রক্তারক্তিতে পরিণত হইবে এবং পুনরায় একটা বিদেশীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কারণ হইবে।

আবার যদি ঈশ্বরেচ্ছায় ইংরাজ থাকিয়া যান, তাহা হইলেও যে বিরোধের বীজ রোপিত হইয়াছে, তাহার ফল যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তা করা যায় না। সমাজের যে সংঘটন পূর্ব্বাপর ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া যাইতেছে। অথচ কংগ্রেসের ও সমাজসংস্কারক-গণের চেষ্টার ফলে সমাজ যে আকৃতি ধারণ করিতেছে—তাহাতে কাহারও কোনরূপ আশ্বাস পাওয়ার উপায় নাই। প্রথম অধ্যায়েই

বলিয়াছি যে, আজকাল চরিত্রের উপর কাহারও শ্রদ্ধা নাই এবং চরিত্রের নিত্যতা শিক্ষিত সমাজ স্বীকার করেন না। বলা বাহুল্য যে, ইহার ফলে দেশে কোনও চরিত্র নাই। ভাল হউক, মন্দ হউক, ইংরাজ প্রভৃতি প্রত্যেক জাতির এক একটা নির্দ্দিষ্ট চরিত্র আছে। তাঁহাদের স্বদেশ-প্রেম এই চরিত্রের ভিত্তি। এই স্বদেশপ্রেম আবার আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতির ঐক্যতা দ্বারা পুষ্ট। যদিও এই সকল আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি এক এক সময়ে এক এক রূপ ধারণ করে, তথাপি এই পরিবর্ত্তনটা সকলের ভিতরেই যুগপৎ একভাবে আসে। এইরূপে ইহাদের স্বদেশপ্রেমমূলে যে চরিত্র গঠিত হয়, তাহা পরিবর্ত্তনশীল হইলেও, গতিশীল (Marching) সৈন্যশ্রেণীর পোষাক-পরিচ্ছদ ও পদক্ষেপের ন্যায় একই রূপ দেখায়। এই কারণে ইহাদের প্রত্যেক জাতির এক একটী নির্দ্দিষ্ট পরিচয় আছে। কিন্তু আমাদের দেশে নানা প্রকার ধর্ম্মবৈচিত্র্য, রীতিবৈচিত্র্য, নীতিবৈচিত্র্য, আচারবৈচিত্র্য ও ব্যবহারবৈচিত্র্য থাকায়, ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিসমূহের ন্যায় আমাদের দেশে কোনও প্রকার জাতীয় চরিত্র নাই। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে এই দেশে হিন্দুর এমন এক সার্ব্বভৌম চরিত্র কিছুকাল পূর্ব্বেও দুই চারি জনের মধ্যে দেখা যাইত যে, তাহা দেখিয়া প্রত্যেকে মনে করিত যে, ইহারা বাহুবলে বলবান্ না হইলেও নরদেবতা। ইহারা জাতিনির্ব্বিশেষে অন্নদান করে এবং প্রতিক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করে। কংগ্রেস ও ইংরাজী-শিক্ষা এই চরিত্র নষ্ট করিয়া দিয়াছে, অথচ সংস্কারকগণ যাহাকে জাতি (Nation) নামে অভিহিত করেন, তাহাও এই দেশে গঠিত হইতেছে না। মুসলমান মুসলমানের ভাবে, বর্ণহিন্দু বর্ণহিন্দুর ভাবে, অস্পৃশ্যজাতি অস্পৃশ্যজাতির ভাবে, এবং শিখ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় তাহাদের সাম্প্রদায়িক ভাবে চলিতেছে। এই সাম্প্রদায়িকতা আবার দুই

প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতির দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার এক রূপ দৃষ্ট হয় এবং প্রাদেশিকভাবে এই সাম্প্রদায়িকতার আর এক রূপ দৃষ্ট হয়। বাঙালী বেহারে চাকুরী পায় না, বেহারী আসামে চাকুরী পায় না এবং আসামবাসী যোগ্য হইলেও, পাঞ্জাবে চাকুরী পায় না। তারপর এই সাম্প্রদায়িকতা কেবল প্রদেশে আবদ্ধ নহে। জেলায় জেলায়, থানায় থানায় এবং গ্রামে গ্রামে এই সাম্প্রদায়িকতা ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে। সুতরাং এই দেশে জাতি-নির্ম্মাণের আশা কোথায়? সংস্কারকগণ বলেন যে, আমাদের প্রাচীন সংস্কারগুলি এই দেশে জাতিনির্ম্মাণ হইতে দিতেছে না। কিন্তু ইহাই যদি সত্য হয়, তবে কি বুঝা যায় না যে, এই দেশের প্রকৃতিই জাতি-নির্ম্মাণের বিরোধী? যাহা কখনও এই দেশে হয় নাই, তাহাই দেশের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। শত চেষ্টা করিলেও, এই দেশে তাহা হইবে না। জাতি-নিম্মাণ এই দেশে অসম্ভব বুঝিয়াও যে শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিষয়ে পুনঃপুনঃ পণ্ডশ্রম করিয়া এই দেশের প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়াছেন, তাহার একমাত্র কারণ লোভ। একদিকে লোভ বলিতেছে যে, প্রাচীন সমাজ ভগ্ন করিয়া নূতন সমাজ গঠন পূর্ব্বক বড় হও। আবার অপর দিকে দেশের প্রকৃতি বলিতেছে যে, তাহা হইবে না। ঐ দেখ, আমি তোমাদের জাতি-নির্ম্মাণের বিরুদ্ধে। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, হিন্দু-সমাজের প্রাচীন সংস্কার নষ্ট করার চেষ্টা করিয়াও হিন্দুমুসলমানের মিলন হয় না। এমন কি, বর্ণহিন্দুর সহিত অস্পৃশ্য জাতিগুলি পর্য্যন্ত মিলিতে পারিতেছে না। সংস্কার নষ্ট করার যতই চেষ্টা হইতেছে, ততই দেশে বিরোধাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে কি বুঝা যায় না যে, সংস্কারকগণ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন? বর্ণহিন্দুর সংস্কার সার্ব্বভৌম ও সমদৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়া সে সহনশীল ও শান্তিপরায়ণ এবং

অপরাপরের সংস্কার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ বলিয়া ইহারা অসহিষ্ণু ও উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন। এই তফাৎটুকু উপেক্ষার বস্তু নহে। তফাৎটা এককথা-ও-বহুকথাজনিত। যাহারা একমুখে বহুকথা বলে, তাহারা স্বার্থবুদ্ধিমূলে উগ্রপ্রকৃতির হয় এবং বিশ্বাসের অযোগ্য হইয়া বিরোধ সঞ্চার করে। পক্ষান্তরে, যাহারা এককথা বলে, তাহারা শান্ত প্রকৃতির হইয়া সর্ব্বদা বিশ্বাসের পাত্র হইয়া থাকে। বহুকথা অবিশ্বাসের মূল এবং এককথা বিশ্বস্ততার মূল। এইরূপে হিন্দু যে মুহূর্ত্তে এক কথা ছাড়িয়া বহুকথা আরম্ভ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে মুসলমান তাহাকে অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার সকল সম্প্রদায়ই তাহাকে অবিশ্বাস করিতেছে। ফলে দেশে যে একটা ভাবকেন্দ্র ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা বহুকথার দেশ নহে, এককথার দেশ। এককথা দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য চরিত্রের উৎপত্তি হইয়া দেশের ভারকেন্দ্র রক্ষিত হয়। চরিত্রের ভাবকেন্দ্র স্থায়ী এবং বাহুবলের ভারকেন্দ্র অস্থায়ী। একটু দুর্ব্বলতা আসিলেই এই ভারকেন্দ্র নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য বলিতেছিলাম যে, এই দেশের প্রকৃতি-মূলে এবং স্বধর্ম্ম-পালনের প্রভাবে হিন্দু-চরিত্র অপরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া মাতৃবৎ স্নেহাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেই খাইয়া বাঁচুক, ইহা ছিল তাহার আন্তরিক ভাব। এই ভাবমূলে আর্য্য-স্বভাবের উৎপত্তি হইয়া এই স্বভাবই দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাবকেন্দ্র রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং স্নেহাত্মক প্রকৃতি-মূলক শান্তিই এই দেশের শান্তি এবং এই প্রকৃতিমূলক একতাই দেশের একতা। সর্ব্বশেষে, এই প্রকৃতিমূলক শক্তিই এই দেশের শক্তি। ইহাতে জাতীয় শক্তি নামক কোনও শক্তির উৎপত্তি আকাশ-কুসুম মাত্র। ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দু স্নেহাত্মক প্রকৃতি লইয়া জীবন-যাপন করিত বলিয়া তখন দেশে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ হয় নাই। বর্ণহিন্দুর সহিত অস্পৃশ্য-

জাতির বিরোধ হয় নাই। এখন বহুকথা শিখিয়া হিন্দু বলিতেছে যে, মুসলমান সব খাইয়া ফেলিল এবং মুসলমান বলিতেছে যে, হিন্দু সব খাইয়া ফেলিল। সর্ব্বোপরি, ইংরাজ সব খাইয়া ফেলিল বলিয়া হিন্দু-মুসলমান উভয়েই দুঃখিত। সুতরাং স্নেহের পরিবর্ত্তে হিংসার ভিত্তিতে আজ জাতিনির্ম্মাণের চেষ্টা চলিতেছে। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই শোকে অধীর। বলা বাহুল্য যে, এই শোকই বর্ত্তমানে আমাদের ধর্ম্মজীবন নষ্ট করিয়া ইহাকে একটী রাষ্ট্রীয় জীবনের পথে পরিচালিত করিতেছে। প্রজার পক্ষে রাষ্ট্রীয়-জীবনের অর্থ ভিক্ষুকের জীবন। এই জীবনের অর্থ এই যে, ইহাতে সমগ্র দেশের সমাজ একত্র মিলিত হইয়া রাজশক্তিকে পাচকবৃত্তিতে নিযুক্ত করে। তারপর প্রত্যেকে ইহার নিকট হইতে রুটী ভিক্ষা করিয়া লয়। ফরাসীজাতি একদিন এই কারণে মেরী এণ্টয়নেটকে রুটীওয়ালার পত্নী বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট রুটী ভিক্ষা করিয়াছিল। এই ভিক্ষা-বৃত্তিতে কাহারও মনুষ্যত্ব থাকে না। অন্তরের সমস্ত সদ্বৃত্তি লুপ্ত হইয়া কেবল উদরের দিকে ধাবিত হয়। এইজন্য ইহা উদরের নীতি। এই নীতিতে মানুষ জন্তুভাবের উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। অথচ এই জীবনকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যেই ইহাকে স্বদেশপ্রেম নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা স্বদেশপ্রেম নহে, উদর-প্রেম। এই প্রেমের বশেই ইটালী আজ আবিসিনিয়া গ্রাস করিয়াছে এবং এই প্রেমের বশেই জগৎ আজ রণ-সজ্জায় সজ্জিত। রাষ্ট্রকে রন্ধনশালায় পরিণত করিয়া রাজলক্ষ্মীকে পাচিকাপদে নিযুক্ত করার ইহাই একমাত্র পরিণাম। এই দেশের রাষ্ট্র কখনও রন্ধনশালা ছিল না। রাজলক্ষ্মীও কখনও পাচিকা ছিলেন না পরিবার আমাদের রন্ধনশালা এবং মাতা আমাদের পাচিকা। পারিবারিক রন্ধনশালা একটি স্নেহধারা রক্ষা করিত বলিয়া এই

স্নেহধারা রাজলক্ষ্মীতে সঞ্চিত হইয়া তাহাতে ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যনিষ্ঠার উৎপত্তি করিত এবং এই স্নেহের উৎস রক্ষা করিত। সত্যাদি ধর্ম্ম ব্যতীত স্নেহের উৎপত্তি হয় না। এই কারণে ধর্ম্ম আমাদের অন্নকর্ত্তা, অন্নরক্ষক ও অন্নদাতা ছিলেন। এই কর্ত্তৃত্বে, রক্ষকতায় ও দাতৃত্বে প্রেম আছে, প্রীতি আছে এবং বুক চিরিয়া খাওয়াইবার আকাঙ্ক্ষা আছে। এই আকাঙ্ক্ষারাশির নিকট দাঁড়াইলে কল্পবৃক্ষের ফলের ন্যায় চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্যপেয় সমস্ত বস্তু অযাচিতভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে, মমতা-হীন রাষ্ট্রের নিকট আধপেটা একমুষ্টি ভাত ও অর্দ্ধচন্দ্র পুরস্কার। অতএব আমাদের নিকট প্রশ্ন এই যে, রাষ্ট্রের নিকট অন্ন-ভিক্ষা করিব, কি পরিবার ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া মাতার নিকট সোহাগের অন্ন আদায় করিব? স্বদেশপ্রেম রাজশক্তির নিকট অন্নভিক্ষা-প্রণালী শিক্ষা দিয়া মানুষকে উদ্ধত ভিক্ষুকে পরিণত করে এবং ধর্ম্মজীবন মায়ের নিকট সোহাগের কান্না কাঁদিয়া প্রীতির অন্ন ভক্ষণ করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সত্যই লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশে স্বদেশপ্রেম নাই। কারণ, আমরা রাজাকে পাচকে পরিণত করিয়া রাষ্ট্রকে এক বিরাট্ রন্ধনশালায় পরিণত করার প্রণালী জানিতাম না। আমাদের প্রণালীতে রাষ্ট্র আমাদের চরিত্র ও মনুষ্যত্বের রক্ষক। এই চরিত্র শাস্ত্রীয় চরিত্র। ইহাতে স্বেচ্ছাচার ও বহুকথার প্রশ্রয় ছিল না বলিয়া রাজগণ আমাদের বিশ্বাসের পাত্র ও এককথার কথক ছিলেন। এই কথকতা পরিবারে মাতৃস্নেহের ভিত্তিতে আরম্ভ হইয়া রাষ্ট্র কর্ত্তৃক সমাজে রক্ষিত হইত। কিন্তু বীজ ছিল ইহার ব্রহ্মতেজের সৌরকিরণরাশির মধ্যে। অপক্ষপাতী ও হিংসাদ্বেষশূন্য চরিত্রের দৃষ্টান্তে সার্ব্বজনীনভাবে এই কথকতা লোকে শিখিত। উদ্ধত ভিক্ষাবৃত্তিমূলে মানুষ অপ্রিয় রাজশক্তির পরিবর্ত্তনা-কাঙ্ক্ষায় বহুকথা বলে এবং মাতৃস্নেহের পক্ষপুটে আচ্ছাদিত থাকিলে,

এককথামূলে চরিত্রবান্ হয়। এই চরিত্রই আমাদের এককথার উদ্দেশ্য।

রাজনীতির এই কথাটী বুঝি না বলিয়াই আজ আমরা জাতিভেদ ও আচারের উদ্দেশ্য বুঝি না। মনে করি যে, আচার ও জাতিভেদ বুঝি কেবলই বৈরাগ্যাত্মক। বস্তুতঃ, ইহা রাজা-প্রজা উভয়কে মাতৃবৎ স্নেহপরায়ণ করে। এই স্নেহপরায়ণতার অভাবমূলে আমরা আজ স্বার্থের দাসত্বের পথে চলিয়াছি। উদ্ধত ভিক্ষুকের ন্যায় আজ আমরা বলিতেছি যে, হে রাজন্! তুমি যদি আমাদের ভাত রাঁধিয়া দিতে না পার, তবে সরিয়া দাঁড়াও। আমরা অন্য পাচক নিযুক্ত করিব। এই ঔদ্ধত্যই বিরোধ-সঞ্চার করে এবং বিরোধ দাসত্বের শৃঙ্খলকে দ্বিগুণভাবে কষিয়া দেয়। কংগ্রেসের এত আন্দোলনের পরও, আজ আমরা যেন অবশভাবে রাজশক্তির মুষ্টির ভিতরে চলিয়া যাইতেছি। আমাদের চরিত্রদোষ ইহার কারণ। উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিই সহজে কারাগারে যায়। এই কারণে আমরা আমাদের ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতার দরুণ এমন এক সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরে অবশভাবে চলিয়াছি যে, এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ, কর্ম্মের প্রয়োগ বিষয়ে দুইটী পথ আছে। একটী দাসত্বের পথ এবং অপরটি স্বাধীনতার পথ। রাষ্ট্রকে রন্ধনশালায় পরিণত করিলে মানবের চিরদাসত্বের পথ হয় এবং ইহাকে মাতৃবৎ স্নেহাত্মকভাবে পারিবারিক স্নেহধারার রক্ষকে পরিণত করিলে মানুষ স্বাধীন হয়। কথাটা না বুঝিয়া আমরা স্বাধীনতা, ভ্রমে চিরদাসত্বের পথে চলিয়াছি। বস্তুতঃ, অধর্ম্মের পথই দাসত্বের পথ। এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি অধর্ম্মের পথই দাসত্বের পথ হয়, তবে যাঁহারা আজ জগতের প্রভু, তাঁহাদের পথকেই ধর্ম্মের পথ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, এখন আমরা তাঁহাদের দাস এবং তাঁহারা

জগতের প্রভু। কিন্তু ইহা ভুল। অধর্ম্মেরও একটা প্রভুত্ব আছে। এই প্রভুত্ব দ্বারা সামাজিক হিসাবে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের ভেদ হয়। ধর্ম্মের প্রভুত্ব চিরকাল থাকিলে, এই ভেদটা লোকে বুঝিতে পারে না। অধর্ম্মের প্রভুত্বকালে সার্ব্বজনীন দুঃখ দ্বারা এই ভেদটা অনুভূত হয়। ইহাতে প্রভু যেমন দুঃখ পায়, দাসও তেমন দুঃখ পায়। তারপর দুঃখের বাজারে কেনাবেচা করিয়া প্রভু ও দাস উভয়েই ধর্ম্মশিক্ষা করে। কথাটা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পরিষ্কার হইবে। এই অধ্যায়ে কেবল আমাদের ধার-করা স্বদেশপ্রেম-জনিত বিচ্ছেদাগ্নির স্বরূপ প্রদর্শিত হইল। ইংরাজী শিক্ষা করিয়া রাজার চাকুরীতে দুধ-ভাত খাইব, এই লোভে আমরা শিষ্য-যজমান ছাড়িয়াছি, ক্ষেত-খামার ছাড়িয়াছি, নাপিতের বৃত্তি, কর্ম্মকার-কুম্ভকারের বৃত্তি ও তাঁতীর বৃত্তি নষ্ট করিয়াছি। এখন চাকুরী-ক্ষেত্র হইতে বঞ্চিত হইয়া উদ্ধত ভিক্ষুকে পরিণত হইতেছি। ধর্ম্মহীনতা ইহার কারণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

কেন এই দেশে ধর্ম্ম নাই ?

বর্ত্তমানে এই দেশে ধর্ম্ম নাই দেখিয়া প্রত্যেকেই বলেন যে, ধর্ম্ম যখন কালপ্রভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তখন ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা এই দেশে অসম্ভব। কিন্তু কথাটা ভুল। ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক দুইটি পদার্থের অস্তিত্ব যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সমাজ-ব্যবস্থার উপর এই দুইটী পদার্থের অস্তিত্ব ও বিলোপসাধন নির্ভর করে। বিপ্লববাদিগণ বলেন যে, বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় একটা দোষ আছে বলিয়াই আজকাল জগতে এত দুঃখ। অতএব সমাজকে পুনঃ পুনঃ ভগ্ন করিয়া ইহার দুঃখ দূর করার চেষ্টা কর, তাহা হইলে একদিন না একদিন সুখের নাগাল পাইবে। তাঁহাদের কথা মিথ্যা হইলেও, এই কথার ভিতর একটী সত্য এই রহিয়াছে যে, সুখ-দুঃখ অনেকটা সমাজ-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কদাচিৎ উল্লঙ্ঘন করিয়া সুখী হইতে পারে। এইভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে উলঙ্ঘনক্রমে সুখী হওয়ার দৃষ্টান্ত একমাত্র আমাদের সাধু-মহাত্মাগণের মধ্যে দেখা যায়। ইঁহারা ব্যতীত আর সকলেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন। এমন কি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিকূল হইলে সমাজে সাধুও জন্মে না। সুতরাং সুখের সংসার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, কোন্ সমাজ ধর্ম্মের অনুকূলে এবং কোন্ সমাজ ইহার প্রতিকূলে, তাহা দেখা আবশ্যক। এই বিচার করিয়াই আমাদের ঋষিগণ জাতিভেদ করিয়া প্রত্যেক জাতির স্বধর্ম্ম-নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। এই জাতিভেদও

স্বধর্ম্মের উদ্দেশ্য সমাজের জীবনসংগ্রাম-নিবারণ। তুমি বলিবে যে, ইহার জন্য আবার জাতিভেদ ও স্বধর্ম্মনির্ণয় করিতে হইবে কেন? সমাজ-তন্ত্রবাদ দ্বারাই ত ইহা নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু ইহা ভুল। সমাজ-তন্ত্রবাদ বেকার-সমস্যা নিবারণ করে বটে; কিন্তু জীবনসংগ্রাম-জনিত দুঃখনিবারণ করিতে পারে না। যাঁহারা মনে করেন যে, সকলের মনোনীত ১০ জন প্রতিনিধিই সুবিচার করিয়া মানুষকে তাহার ন্যায্য অন্ন, পানীয় ও ভোজ্য-বস্তু দিতে পারেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। কোন্ গুণে কে কত পাইতে পারে, তাহার বিচার মানুষের হাতে নাই। ইহাতে কৃত্রিম উপায়ে একটা কৃত্রিম শান্তি সমাজে রক্ষিত হয় বটে; কিন্তু এই শান্তি এমন ক্ষোভের উৎপত্তি করে যে, সহসাই একটী প্রতিদ্বন্দ্বী মত-বাদের উৎপত্তি হইয়া এই শান্তি-ভঙ্গ হয়। দশ জন মিলিয়া একজনকে চাপিয়া রাখিতে পারে বটে; কিন্তু কাহার ভাগ্য কাহাকে কোন্ দিকে চালাইতে চাহে এবং কাহার অন্তরস্থ গুণাবলী কাহার ভবিষ্যৎ কোথায় লইয়া যাইবে, তাহার বিচার মানুষ করিতে পারে না। এইজন্য এই কৃত্রিম শান্তি পৌনঃপুনিক অশান্তি ও বিপ্লব-চেষ্টা দ্বারা চূর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং সমাজ-তন্ত্রবাদে জীবনসংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাজনিত দুঃখ অনিবার্য্য। বরং ইহাতে ধূর্ত্ত চাটুকারের প্রাধান্য হয়। গুণবানের প্রাধান্য হয় না।

পক্ষান্তরে, জাতিভেদমূলক স্বধর্ম্ম এই দুঃখ নিবারণ করে। ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। তাই বলিতেছিলাম যে, স্বধর্ম্ম প্রতিপালিত হইলে মানব-মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বুদ্ধি আসিতে পারে না। ফলে, প্রত্যেকের অন্তর-বাহির এক হইয়া শঠতা, বঞ্চনা প্রভৃতি দুর্গুণগুলি দূর হইয়া যায় এবং তাহাতে "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচ্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ" ইত্যাদি ধর্ম্ম চরিত্রের ভূষণ হয়। ধর্ম্ম আছে বলিয়াই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে একতার নিমিত্ত

স্বদেশ-প্রেমরূপী প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বুদ্ধি অনাবশ্যক। পক্ষান্তরে, ধর্ম্ম নাই বলিয়াই ম্লেচ্ছ সমাজের একতার জন্য ইহা অত্যাবশ্যক। অনেকে দুঃখ করেন যে, আজকাল এই দেশে চরিত্র নাই। ইহার একমাত্র কারণ, ধর্ম্মত্যাগ ও স্বদেশপ্রেম-গ্রহণ। স্বদেশপ্রেম চরিত্রনাশক। ইহা মায়া-মমতা নষ্ট করিয়া মানবের দৃষ্টিকে বৈষয়িক উন্নতির দিকে লইয়া যায়। এই কারণে ইহা জগৎকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টিতে দেখাইয়া দেয়। প্রেমের দৃষ্টি ইহাতে নাই। ফলে, পরোপকারের পরিবর্ত্তে পরপীড়া ইহার মূলমন্ত্র। ইহাতে পিতাপুত্রে, মাতায়-কন্যায়, পতি-পত্নীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মে। এই জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটী পরপীড়ামূলক ভাব। ইহাতে জগতে কোনও নীতি থাকে না। যীশু তাঁহার দশটী আদেশে জগতে যে সকল নীতি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সমাজে এযাবৎ টিকিয়া উঠিতে পারে নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, মনে মনে যদি তুমি কোনও পরস্ত্রীর সহিত সহবাস-কামনা কর, তাহা হইলেও তোমার পরস্ত্রী-গমন হইয়া গেল। কিন্তু লোভ-মূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে সমাজের ভিত্তি, তাহাতে এইরূপ নীতির স্থান হয় না। প্রত্যেকে মনে করে যে, ভালবাসার বস্তুকে ভালবাসিয়া যদি প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজয়পূর্ব্বক নিজস্ব করিতে পারি, তাহা হইলে দোষের বিষয় কি আছে? এইরূপ মনোবৃত্তি-মূলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক সমাজের মনুষ্যগণ এই সকল আদেশকে পণ্ড করিয়া দেয়। বস্তুতঃ, এইরূপ নীতি কেবল ঈশ্বর-নিষ্ঠা ও জাতিভেদ-মূলেই সাধনাদ্বারা মানবচরিত্রে ফুটিয়া উঠে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক সমাজে ফুটে না। সমাজের এই অবস্থা দেখিয়াই সম্ভবতঃ যীশু বলিয়াছিলেন যে, জগতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত একদিন হইবে বটে; কিন্তু আজ নহে। ইহার অর্থ এই যে, ইহা অনন্ত কাল পরে একদিন হইবে। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, কর্ম্মের দুইটী প্রয়োগ-বিভাগ আছে। একটী

জীবনসংগ্রাম-মূলক প্রয়োগ এবং অপরটী জীবনযজ্ঞ-মূলক প্রয়োগ। সমাজকে জীবনসংগ্রামের ভিত্তিতে গঠিত করিয়া কর্ম্মের যে প্রয়োগ হয়, তাহাতে মানুষের সমস্বার্থমূলক একটা একতা জন্মিয়া যে শক্তি জন্মে, তাহার ফলে আপাতমধুর একটা উন্নতি হয়। এই শক্তিই মানুষকে আবার সদসদ্বিবেক-শূন্য করিয়া সমাজে বিরোধ-সঞ্চার করে। এই বিরোধ সমস্ত উন্নতি নষ্ট করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে, ইহাকে জীবনযজ্ঞের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কর্ম্মের প্রয়োগ করিলে, ইহাতে নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভূতলে স্বর্গরাজ্য অথবা আদর্শের যদি কোনও অস্তিত্ব থাকে, তবে জীবনযজ্ঞ-মূলক কর্ম্ম-প্রয়োগই ভূতলে স্বর্গরাজ্য-স্থাপন করে। অতএব বুঝিয়া লও যে, আমাদের এক-কথার উদ্দেশ্য সত্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠাদ্বারা আমরা সমাজে একতা ও শক্তি আনয়ন করি এবং তন্মূলে আমাদের সুখ-শান্তি-মূলক উন্নতি হয়। পক্ষান্তরে, ম্লেচ্ছের বহু-কথা-মূলক একতাদ্বারা যে শক্তি-সঞ্চার হয়, তন্মূলে সমাজের পীড়া হইয়া বিরোধের সঞ্চার হয়। সদসদ্বিবেকশূন্যতা এই বিরোধের মূল। ম্লেচ্ছদেশে অনেক আচার্য্য জন্মিয়াছেন। ইষা, মুষা প্রভৃতি সকলেই নিজে মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু ইঁহারা বহুচেষ্টা করিয়াও ম্লেচ্ছসমাজে এক-কথা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল বহু-কথার দেশে এক-কথা বিকায় না। আজকাল তথায় কোথাও Fascism, কোথাও Communism এবং কোথাও বা অন্য প্রকার শান্তিসুখের কল্পনা চলিতেছে। কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত কোথাও শান্তি-সুখ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ম্লেচ্ছ সহযোগিতা জানে না, কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাই জানে। তাহার সহযোগিতাও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবে দুষ্ট। এইজন্য তাহার নিকট যীশু, মহম্মদের বাক্যও বিকায় না। ইঁহারা নীতিকথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ম্লেচ্ছজাতি নীতি মানে না। এই কারণে ম্লেচ্ছ-জগতে এযাবৎ

নীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ফলে, তথায় স্বাধীনতা বা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

বস্তুতঃ, জীবনকে যদি যজ্ঞভাবে না দেখা যায়, তাহা হইলে ইহাতে নীতি থাকিতে পারে না এবং স্বার্থের বশে দুর্নীতিই সুনীতি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমাদের শাস্ত্রে জীবন একটী যজ্ঞ। যম ও নিয়ম নামক দুইটী বস্তুর সাধনা এই যজ্ঞের ভিত্তি। এই যম-নিয়মসাধনাই আচারের লক্ষ্য। যম সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন ঃ—

ব্রহ্মচর্য্যং দয়াক্ষান্তি ধ্যানং সত্যমকল্কতা।
অহিংসাঽস্তেয়-মাধুর্য্যে দমশ্চেতি যমাঃ স্মৃতাঃ॥

অনুবাদ ঃ—ব্রহ্মচর্য্য, দয়া ক্ষান্তি, ধ্যান সত্য, সরলতা, অহিংসা অচৌর্য্য ও মাধুর্য্য এই কয়টী যম নামে পরিচিত।

এক্ষণে এই যম-সাধনা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সমাজে কি রূপ ধারণ করে, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ।

(১) ব্রহ্মচর্য্য ঃ—উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, যমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের স্থানই সর্ব্বাগ্রে দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সমাজে স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সম্বন্ধও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। ব্রহ্মচর্য্য আবার স্ত্রী-পুরুষের যৌনসম্বন্ধমূলক। এই সম্বন্ধের মধ্যে সংযম দ্বারা বীর্য্যরক্ষার নাম ব্রহ্মচর্য্য। ইহা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সম্পর্কেই প্রযুজ্য। প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক সমাজ মনে করে যে, যত দিন স্ত্রী-পুরুষের এই সম্বন্ধ-জ্ঞান না হয়, তত দিন বিবাহ হওয়া অনুচিত। কথার অর্থ এই যে, যত দিন নরনারী স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া যোগ্য পতি বা যোগ্যা পত্নী বাছিয়া লইতে সক্ষম না হয়, তত দিন তাহাদের বিবাহ হওয়া সঙ্গত নহে। এই বাছনি কার্য্যের জন্য স্ত্রী-

পুরুষের অবাধ-সম্মিলন আবশ্যক। অন্যথা পছন্দ-কার্য্য সুন্দররূপ হয় না। ইহাতে প্রথমেই মানসিক ব্রহ্মচর্য্যের স্খলন হয় এবং তাহার পর বাচিকভাবে ইহার স্খলন হইয়া, সর্ব্বশেষে কায়িক ব্রহ্মচর্য্যের স্খলন হয়। অনেকে মনে করেন যে, আমাদের সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মাখামাখির প্রথা নাই বলিয়া আমরা ইহা মনে করি; কিন্তু এই প্রথা হইয়া গেলে অভ্যাসবশতঃ এই অবাধ-সম্মিলনের ভিতরেও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহা ভ্রম। স্বামী-স্ত্রীতে যতটা অবাধ-সম্মিলনের অভ্যাস হয়, ততটা অবাধ-সম্মিলন অন্য স্ত্রী-পুরুষে হয় না। মনে কর একটী দম্পতী এইরূপ মনে করিল যে, আমাদের আর সন্তান হওয়া সঙ্গত নহে। এইজন্য যাহাতে আর সন্তান না হয়, তজ্জন্য উভয়ে বদ্ধপরিকর হইল। কিন্তু তাহাতেও দেখা যায় যে, এই দম্পতীর সন্তান হইয়া পড়ে। ইহা এই দেশে যেমন সত্য, সকল দেশেই তেমন সত্য। তাই বলিতেছিলাম যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সমাজে ব্রহ্মচর্য্য থাকে না। লাভের মধ্যে ইহাতে প্রেমহীনতা ও কাম-প্রাবল্য জন্মিয়া সমাজ স্ত্রী-পুরুষের কামজনিত শত্রুতার লীলাভূমি হইয়া উঠে।

(২) দয়া :—প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সমাজে দয়া-নামক পদার্থ অতি বিরল। স্বার্থ দয়াকে কাছে আসিতে দেয় না। এইজন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা দয়ার বিরোধী।

(৩) ক্ষান্তি :—ক্ষমাগুণও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সমাজে অতি বিরল এবং যেখানে স্বার্থ থাকে, সেইখানে দয়া ও ক্ষমা আদৌ থাকিতে পারে না।

(৪) ধ্যান :—প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানুষকে অনবরত এমন চলনশীল করে যে, তাহার চিন্তা করার কোনও অবসর থাকে না, কাজেই সে প্রকৃত কর্ত্তব্য স্থির না করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বরের ধ্যান সে অনাবশ্যক মনে করে।

(৫) সত্য ঃ—এইরূপ সমাজে সত্য টিকে না। ন্যায়বিরোধী স্বার্থই প্রতিযোগিতা জন্মায় এবং এই স্বার্থই সত্য নষ্ট করে। আজিকালিকার আদালতে যাঁহারা মোকদ্দমা করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি প্রকারে সত্য নষ্ট করে। পক্ষান্তরে, যেখানে পরপীড়াতে অপ্রবৃত্তিমূলক অদ্রোহ থাকে, সেইখানে সত্য-কথন স্বভাব-সিদ্ধ হয়।

(৬) অকল্কতা ঃ—প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সমাজে কখনও সরল ও নিষ্পাপ অন্তঃকরণ হয় না।

(৭) অহিংসা ঃ—বলা বাহুল্য যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সমাজ কায়িক, বাচিক, মানসিক, এই তিন প্রকার হিংসাতেই পূর্ণ থাকে এবং ইহাতে বাচিক-হিংসা আত্মপ্রশংসা (Propaganda) ও পরনিন্দা সর্ব্বদা প্রবল থাকে। পক্ষান্তরে, বর্ণাশ্রমসম্মত সমাজে পরস্পর হিংসাবুদ্ধির জন্য সামাজিক কোনও প্ররোচনা থাকা দূরের কথা, সমাজ নারীকে নারীধর্ম্ম, শূদ্রকে শূদ্রধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়কে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যকে স্ব স্ব জাত্যুচিত ধর্ম্মে উৎসাহিত করিয়া অপরের প্রতিহিংসার বীজ নষ্ট করিয়া দেয়। প্রতিযোগিতামূলক সমাজে অহিংসানামক পদার্থের অস্তিত্বই থাকে না। পক্ষান্তরে, বর্ণাশ্রম-সম্মত সমাজে পরধর্ম্মকে ভয়াবহ জানিয়াই মানুষ পরকে হিংসা করিতে বিরত থাকে। বর্ণাশ্রমের বিলোপ-সাধন হেতু আজ আমাদের সমাজ হিংসা-বিষে জর্জ্জরিত। হিংসার ন্যায় •একতানাশক ও সমাজের বল-হ্রাসকারী পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। অথচ এই হিংসাকেই এখন জাতীয় উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ ধরিয়া তাহার Propaganda চলিতেছে। বর্ত্তমান সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বুদ্ধি ইহার কারণ। এই বুদ্ধি যখন জাতি-নির্ম্মাণ-কার্য্যে অগ্রসর হয়, তখন হিংসাকেই জাতীয়-বন্ধনসূত্র বলিয়া কল্পনা করিয়া

লয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইউরোপীয় জাতিসমূহকে দেখ। ইংরাজ-ফরাসীর হিংসায় এক সময় জাতিনির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং আজ জার্ম্মাণী প্রভৃতি অপরাপর জাতির প্রতি হিংসাবশে বল-সঞ্চয় করার চেষ্টা করিতেছে। আবার আমরাও ইংরাজের প্রতি হিংসাবশে এই দেশে জাতি-নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছি। ইহাতে একটা জাতীয় একতা জন্মিয়া আভ্যন্তরীণ হিংসার বিষক্রিয়া কথঞ্চিৎ রুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু বাহিরে যখন শান্তি থাকে, তখন আভ্যন্তরীণ সাম্প্রদায়িক হিংসা জাগ্রত হইয়া জাতীয়জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেয়। এইরূপে হিংসাবিষ শেষে যাইয়া আত্ম-কলহে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বশেষ, হিংসামূলক জাতীয় একতা পরাজয়ের ক্ষেত্রে বিষময় ফল ফলায়। গত জার্ম্মাণ-যুদ্ধের পর জার্ম্মাণী ও রুশিয়ার অন্তর্ব্বিপ্লব ইহার দৃষ্টান্ত। এই সময়ে শত্রুপক্ষও দুর্ব্বল থাকায় ইহাদের কথঞ্চিৎ রক্ষা হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি নূতন পথ ও নূতন প্রণালীতে মাথা তুলিতে ইহাদের বহু সময় লাগিয়াছে। হিংসাজনিত একতা পরাজিত অবস্থায় বহুকথার দিকে যায় ও আত্মকলহপরায়ণ হয়। এই ভারতবর্ষের ন্যায় বহু সম্প্রদায়পূর্ণ দেশে এই আত্মকলহ বহুকালের জন্য জাতীয় জীবনকে দুর্ব্বল করিয়া রাখার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, এই দেশে যে হিংসামূলক জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, তাহা অধ্যায়ান্তরে প্রদর্শিত হইবে।

অস্তেয় :—প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানব-সমাজের ধন-বণ্টনকার্য্য এমন অসমান ও অনুপাতবিহীনভাবে করিয়া দেয় ও প্রত্যেকের মনে এমন দুরাশা জাগ্রত করে যে, প্রত্যেকেই রাজা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে এবং সমাজ চোর-দস্যুতে পূর্ণ হইয়া যায়।

মাধুর্য্য :—প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সমাজে স্ত্রী-পুরুষ কাহারও চরিত্রে মাধুর্য্য থাকে না অতি সুন্দরী নারী ও সুদর্শন পুরুষ পর্য্যন্ত অন্তরের

দ্বেষ-মাৎসর্য্যাদি দ্বারা অনবরত এমন উত্যক্ত থাকে যে, নিকটে গেলে একটা সর্প-নিঃশ্বাসের জ্বালা নির্গত হইয়া সমীপাগত মনুষ্যকে দূরে সরাইয়া দেয়। সর্ব্বোপরি, ধনের অহঙ্কার এত বৃদ্ধি পায় যে, মানুষ ধনীর নিকট আদৌ অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র বলেন যে, গ্রহগণ শত্রুগৃহে দুর্ব্বল হইয়া পড়েন এবং স্বগৃহে ও মিত্র-গৃহে বলবান্ হন। এইরূপে যমরূপী ধর্ম্মও প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক সমাজে নির্য্যাতনে থাকেন এবং বর্ণাশ্রম-সম্মত সমাজে বলবান্ হন। তারপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক সমাজে নিয়ম হাস্যাস্পদ ও পরিবর্ত্তনশীল হয় এবং বর্ণাশ্রম-সম্মত সমাজে নিয়ম স্থিতিশীল হয়। বলা বাহুল্য যে, নিয়ম ব্যতীত যম থাকিতে পারেন না, কারণ নিয়ম ভৌতিক পদার্থ বা বিষয়ের অবলম্বনে স্থাপিত হয়; পক্ষান্তরে, যম নিয়মাবলম্বনের সাহায্যে আচরিত হয়। সুতরাং যম-নিয়মরূপী দুই প্রকার ধর্ম্মের জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সমাজ শত্রুগৃহ এবং বর্ণাশ্রমসম্মত সমাজ মিত্রগৃহ। আজ যে জগতের লোক ধর্ম্মকে Convention বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে, ইহার কারণ এই যে, জগৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিপূর্ণ! সুতরাং আজ কাল প্রত্যেক সমাজই ধর্ম্মের পক্ষে শত্রুগৃহ।

চরিত্রে যতটুকু যশ থাকিলে জীবনসংগ্রামে দাঁড়ান যায়, ততটুকু যশই জীবনসংগ্রামবাদিগণ রক্ষা করার চেষ্টা করেন। এইজন্য তাঁহারা ব্যভিচারকে পাপ মনে করেন না। তাঁহাদের পাপ হয় ব্যভিচারের প্রকাশে। কোনও দুষ্কার্য্যই তাঁহাদের নিকট দোষের হয় না, যদি তাহা গোপন থাকে। মন ও বাক্যের দ্বারা ব্যভিচার, ইহাতে দোষের হয় না এবং যীশুর নির্দ্দেশ ইহাতে কার্য্যকরী হয় না।

এইরূপে দয়া, ক্ষান্তি, ধ্যান, সত্য ও সরলতা সমস্তই লোক দেখাইবার নমিত্ত, কিছুরই নিত্যতা বোধ নাই। লোকে যদি সত্য কথা ভালবাসে,

তবে জীবনসংগ্রামবাদী সত্যবাদী হয়, অন্যথা হয় না। এইরূপ সমাজের কেহই সত্যের পৃষ্ঠরক্ষক নহে। সকলেই স্বার্থের পৃষ্ঠরক্ষক। স্বার্থ যদি সত্যরক্ষা করিতে বলে, তবে সত্য রক্ষিত হয়, অন্যথা তাহা পরিত্যক্ত হয়। অহিংসাও ইহাতে স্বার্থের অনুগামী। এই জন্য এই সমাজে বিদেশীকে অন্নাভাবে মারিলে কোনও দোষ নাই। কেন না, ইহাতে দেশের লোকের নিকট প্রশংসা পাওয়া যায়।

এইরূপে দেখা যাইবে যে, জীবনসংগ্রামমূলক সমাজ নীতির পক্ষে শত্রুগৃহ। গ্রহগুলি শত্রুগৃহে যেমন দুর্ব্বল থাকে, নীতিগুলিও জীবন-সংগ্রামমূলক সমাজে তেমন দুর্ব্বল থাকে। নীতিহীনতার দৃষ্টান্তের জন্য জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সভ্যদেশ আমেরিকার চিত্রের দিকে একটু চাহিয়া দেখ।

আমেরিকার খুনের প্রকার কিরূপ, তাহার একটী বিবরণ গত ১৯২৯ ইংরাজীর ১২ই এপ্রিল তারিখের "Englishman" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করা গেল :—

" Pretty bobbed-haired Francis Kirkwood of Long Island, when asked a few days ago why she had slain her young husband, Dr. Glen Kirkwood, confessed to the police that she had done so, solely because, on her return from her holiday, she could not listen to the gossip and meet the pitying smiles of her neighbours over the alleged philanderings of her husband during her absence."

অনুবাদ :—(Long Island) লঙ্গ-দ্বীপনিবাসিনী বাবড়ী-কেশ-ধারিণী সুন্দরী ফ্রান্সেস কার্কউড্‌কে যখন কতিপয় দিবস পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা

করা হইল যে, সে কেন তাহার স্বামী কার্কউড্‌কে খুন করিল; তদুত্তরে সে পুলিসের নিকট স্বীকার করিয়াছে যে, সে প্রমোদ-ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া শুনিল যে, তাহার স্বামী তাহার অনুপস্থিতি-কালে অপর স্ত্রীলোকের প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তন্মূলে তাহার প্রতি সকলে যে কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা তাহার অসহ্য হইয়াছে।

ইহা সামাজিক ভয়ের রাজত্ব। (Social reign of terror) ইহা রাজনৈতিক ভয়ের রাজত্ব অপেক্ষা অধিকতর ভীষণ। ইহাতে মানবের দৈনন্দিন শান্তি নষ্ট হইয়া, পরিবার ও সমাজ-বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য যে, কোনও সমাজই কখনও এইরূপ দুষ্কার্য্যের প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু সমাজের প্রত্যেক মনুষ্য যখন ভাল খাইব, ভাল থাকিব, এই সঙ্কল্প-মূলে কর্ম্ম করিতে থাকে, তখন এইরূপ সঙ্কল্পের কোন্ অংশ দোষের এবং কোন্ অংশ গুণের, তাহা বিচার করা অসম্ভব হয়। এই সকল কারণে এইরূপ সমাজে আইন-নিয়মের কোনও যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি থাকে না। বস্তুতঃ, ভোগ যখন জীবনের লক্ষ্য হয়, তখন ইন্দ্রিয়সংযমের কোনও প্রয়োজন কেহ উপলব্ধি করে না। এক মাত্র জনমতের প্রয়োজনে সংযম করার আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। কিন্তু এই প্রয়োজন একটা কন্‌ভেনসন্ মাত্র। ইহাকে কোনও প্রকারে এড়াইতে পারিলেই আর শঙ্কার কোনও কারণ থাকে না। তুমি যদি তোমার সুখ-সুবিধার জন্য এইটুকু করিতে পার, তবে আমি আমার সুখ-সুবিধার জন্য আর একটু অধিক অগ্রসর হইলে দোষ কি, এই চিন্তা তখন মানবের কর্ম্ম-রাশির গতিনির্ণয় করিয়া দেয়। এক কথায় বলিতে গেলে Convention যে মনোরাজ্য সৃষ্টি করে, তাহাই তস্করতার মূল। এই মনোরাজ্য

ভোগ-সাধন বিষয়ে একটা মৃদু সঙ্কল্প লইয়া মানুষকে কর্ম্ম করায় এবং এই মৃদু সঙ্কল্পই যখন তৃষ্ণাবশতঃ তীব্র হইয়া উঠে, তখন এই তীব্র সঙ্কল্প অসংযত কর্ম্ম করাইয়া মানুষকে তস্কর (Criminal)-রূপে পরিণত করে। ইহাতে যদি জনমত কাহাকেও সংযম করিতে বলে, তাহা হইলে সে একমাত্র প্রয়োজনের যুক্তি দেখাইয়া জনমতকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। Francis Kirkwood-এর যুক্তিও এই প্রয়োজন-বুদ্ধিমূলক। এই যুক্তির উদ্দেশ্য এই যে, যাহার ভোগ-সাধন বিষয়ে মৃদু সঙ্কল্প দ্বারা কার্য্য-সিদ্ধি হয়, তাহার পথের সহিত আমার পথের সামঞ্জস্য নাই। ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা তাহার কাজ চলে; কিন্তু আমার তাহা চলে না। ঠিক এইরূপ যুক্তি-মূলেই আমেরিকায় যে আর একটী খুন হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"This killing has now been followed by a even more sensational murder in the town of Harrison New York State of Erumina Chuircci in the presence of her married daughter Rose by Mrs. Mary Casadii, The confessed murderess explained her crime by stating simply that it was due to the slain mother's circulation of degrading stories about her."

এই খুনের পর নিউইয়র্ক ষ্টেটে হেরিসন্ নামক সহরে মিসেস্ এরুমিনা চুরিকৃচিকে তাহার বিবাহিতা কন্যা রোজের সমক্ষে মিসেস্ মেরী কেছাডি নাম্নী অপর এক স্ত্রীলোক খুন করিয়াছে। খুনকারিণী স্বীকার উক্তি দ্বারা প্রকাশ করিয়াছে যে, রোজের মাতা তাহার বিরুদ্ধে কলঙ্ক-রটনার দরুণ সে এই কার্য্য করিয়াছে।

মানুষের চরিত্রে একটা দোষ আছে, তাহার নাম নৃশংসতা। কাম

এই দোষের উৎপাদক। কেবল যে নরহত্যাদি ক্রুর কর্ম্ম করিলেই এই নৃশংসতা হয়, তাহা নহে। আমার ঘরে যথেষ্ট অন্ন আছে, অথচ চক্ষের উপরে মানুষ অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, এই দৃশ্য দেখিয়াও যদি আমি তাহার প্রতিকার করার জন্য যত্নবান্ না হই, তাহা হইলেও আমি নৃশংস। কাম প্রথমতঃ জীবনকে সংগ্রামে পরিণত করিয়া এই নৃশংসতার উৎপাদন করে। দেশে যথেষ্ট কাজ আছে, এই ব্যক্তি কাজ করিয়া খায় না কেন, আমার দরজায় আসে কেন—এইরূপ যুক্তি অন্তরে আসিয়া, এই নৃশংসতার উৎপত্তি করে। অথচ এই যুক্তি যাঁহারা উপস্থিত করেন, তাঁহারা বুঝেন না যে, এই ব্যক্তির হয়ত এমন অবস্থা হইতে পারে, যাহাতে কাজ করার চেষ্টা করিয়াও সে কাজ পায় নাই; হয়ত রোগাদি নানাহেতু তাহার কাজের অন্তরায় ঘটিয়াছিল। মানুষ যখন এই সকল কথা চিন্তার ভিতরে আনে না এবং স্বার্থের বশে মনকে দৃঢ় করিয়া লয়, তখনই তাহার মন একটা নৃশংসতায় অভ্যস্ত হইয়া যায়। এই অভ্যাসের দোষ সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না; কিন্তু একটা সমাজ যখন সমগ্রভাবে এই অভ্যাস-দোষে দুষ্ট হয়, তখন ইহার অধিকাংশ লোকের ভিতরই এই নৃশংসতার মাত্রাটা অসম্ভব রূপে বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে লোলুপ-দৃষ্টি-সম্পন্ন করে। তার পর এই লোভ যখন প্রতিহত হয়, তখন ক্রোধ আসিয়া লোভের স্থান অধিকার করে এবং সমাজগতভাবে তাহার অন্তরে যে নৃশংসতার প্রবাহ বহিতে থাকে, তাহা ব্যক্তিগতভাবে গুরুতর প্রাবল্য লাভ করিয়া তাহাকে নরহত্যাদি কুকর্ম্ম করায়। সমাজের বিবেক অবশ্য তখন এই সকল কুকর্ম্ম দেখিয়া আহত হয়; কিন্তু কেহই বুঝে না যে, সমগ্র সমাজে যে নৃশংসতার প্রবাহ এযাবৎ মৃদু মৃদু ভাবে বহিতেছিল, তাহার পরিণাম-বশতঃই এই নরহত্যাদি নৃশংস কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে। এই কারণে ম্লেচ্ছ দেশও

বুঝিতে পারে না যে, আমেরিকাতে অথবা অপরাপর দেশে যে সকল নরহত্যা হইতেছে, তাহা তাহাদের সমাজগত একটা মৃদু নৃশংসতার প্রবাহের পরিণাম। ম্লেচ্ছদেশের তস্করতার (Criminality) বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে কেন হইতেছে, তাহার ব্যাখ্যা আজ কাল কোন পণ্ডিতই করিতে পরিতেছেন না। কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বেই আমাদের ঋষিগণ এই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, মানব-সমাজ মায়ামমতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। জীবনসংগ্রামের ভিত্তির উপর নহে। আজকাল আমরা যে সমাজে বাস করিতেছি, সেই সমাজ জীবনসংগ্রামের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে মায়া-মমতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে সমাজ কি আকার ধারণ করে, তাহা আমরা বুঝি না। দেখ প্রতি বৎসরই শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতু পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে। আমরা শীতকালে গ্রীষ্মকালের অবস্থাটা চিন্তার ভিতরে আনিতে পারি বটে; কিন্তু শীতের প্রভাবপ্রযুক্ত গ্রীষ্মকালের অবস্থা অনুভব করিতে পারি না। তদ্রূপ গ্রীষ্মকালেও শীতের অবস্থা অনুভূত হয় না। সমাজের অবস্থাও এইরূপ। সমাজ যখন জীবনসংগ্রামকে ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন মায়ামমতার ভিত্তিতে ইহা নির্ম্মিত হইলে ইহা কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহা ইহার মনুষ্যগণ বুঝিতে পারে না। একটা নৃশংসতার আব্‌হাওয়া ইহার কারণ। এই আব্‌হাওয়ার ভিতরে থাকিয়া সাধারণতঃ আমরা উপায়হীন দরিদ্র দেখিলেই চটিয়া যাই এবং তাহাকে ভিক্ষাদানে কুণ্ঠিত হই। কিন্তু ইহার ফলে যে আমাদের অন্তর ক্রমে কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া একটা গুরুতর নৃশংসতার কার্য্য করার জন্যও প্রস্তুত হয়; তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভিক্ষুকের প্রসঙ্গ একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। জীবন-সংগ্রামমূলক সমাজে প্রতি কর্ম্মে মানুষের হৃদয় নৃশংস হইয়া উঠে।

ভাই ভাইকে জিজ্ঞাসা করে না, এমন কি পুত্রও জরাজীর্ণ পিতাকে জিজ্ঞাসা করে না। অর্থ-লোভ ইহার মূল। যে ক্ষেত্রে লোভ মানুষের মনকে প্রতি কর্ম্মে কঠোর হইতে কঠোরতর করে, সেই ক্ষেত্রে মানুষ যখন প্রতিহত কামের ফলে নরহত্যাদি করে, তখন তাহাকে দোষ দিবে কেন ?

অবশ্য আজকাল আমাদের দেশে ভিক্ষা সহজলভ্য বলিয়া সক্ষম-ব্যক্তিও ভিক্ষা করে এবং সহজলভ্য ভিক্ষা মানুষের নিষ্কর্ম্মা জীবনের প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু ইহা কি ভিক্ষা-দাতার পরদুঃখকাতর হৃদয়ের দোষ ? কখনই নহে। দেবতার বৃষ্টি কণ্টক-বৃক্ষের উপরও পতিত হয় এবং পুষ্প-বৃক্ষেও পতিত হয়। যে ব্যক্তি মালী হয়, সেই ব্যক্তি কণ্টক বাছিয়া যাহাতে পুষ্পবৃক্ষ বাড়িতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টিত থাকে। আজি-কালিকার সমাজরূপী উদ্যানে উপযুক্ত মালী নাই। এইজন্য সে কণ্টক-বৃক্ষ বাছিয়া ফেলিয়া মানবের পরদুঃখকাতর হৃদয় যাহাতে অবাধে তাহার অন্তরস্থ সদ্‌গুণরাশির কর্ষণ করিতে পারে, তাহার সুযোগ প্রদান করে না। পরন্তু অপাত্রে দান হওয়ার পথ উন্মুক্ত রাখিয়া এই পুণ্যবান্ অন্তঃকরণকেও কঠোর হইবার কারণ জন্মাইয়া দেয়। বস্তুতঃ, যেখানে প্রত্যেক দাতাকে পাত্রাপাত্র বিচার করিতে গেলে অনেক সময়ে দানের যোগ্যপাত্রও দান হইতে বঞ্চিত হয়, সেইখানে দাতার পাত্রাপাত্র বিচার করা অনুচিত। এই বিচার দ্বারা দাতার অন্তরে এমন একটা নৃশংসতা জন্মে যে, অচিরাৎ তিনি দান করার অযোগ্য হইয়া পড়েন। প্রীতির দানই প্রকৃত দান। সন্দিগ্ধ চিত্ত ও কড়া-ক্রান্তি হিসাবপরায়ণ দাতার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিলে গ্রহীতার যে আত্মাবমাননা জন্মে, তাহাই দানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেয়। এই সন্দিগ্ধ চিত্তা ও হিসাবপরায়ণতাই নৃশংসতার মূল। অন্তরে যখন

মন্দ মন্দ ভাবে ভোগ-সঙ্কল্পের স্রোতঃ প্রবাহিত হয়, তখনই সেই অন্তর নৃশংস হইয়া উঠে। এই কারণে সমাজ যখন মন্দ-ভোগ-সঙ্কল্পকে মানব-জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে, তখন তীব্রভোগ-সঙ্কল্পশীল মনুষ্যের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়া সমাজে তস্করের (Criminal) বৃদ্ধি হয়। যাঁহারা সমাজের শান্তিরক্ষাকার্য্যে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এক-বাক্যে সকলেই বলিয়া থাকেন যে, সভ্যতার সহিত তস্করতার বৃদ্ধি অনিবার্য্য। বস্তুতঃ, ম্লেচ্ছজাতি যাহাকে সভ্যতা বলেন, তাহার সম্বন্ধে এই কথাটা অতিশয় সত্য। এই সভ্যতা মন্দ-ভোগ-সঙ্কল্পকে জীবনের লক্ষ্য-স্বরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক তীব্রভোগ-সঙ্কল্পশীল তস্কর প্রস্তুত করে। ভোগ দোষের নহে, ভোগের সঙ্কল্প দোষের। যাঁহারা আমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে বৈরাগ্যাত্মক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ভ্রান্তি এই যে, আমাদের শাস্ত্রকার ভোগকে দোষের মনে করেন বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস, কিন্তু তাহা নহে। ভোগ আমাকে করিতেই হইবে, এই সঙ্কল্প লইয়া যে ব্যক্তি সর্ব্ব-কর্ম্ম করে, তাহার ভোগ হউক আর না হউক, তাহার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। মৃদু ভোগ-সঙ্কল্পই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া তস্করোচিত ভোগ-সঙ্কল্পে পরিণত হয় এবং সমাজকে অশান্তিতে পূর্ণ করে। এই জন্য এই সঙ্কল্প নিষিদ্ধ। শাস্ত্রীয় ত্যাগ-সঙ্কল্প ভোগ নিষেধ করে না। ইহার মৌলিক তত্ত্ব এই যে, ত্যাগ-সঙ্কল্পের ফলেই ভোগ হয়। পাঁচ ভাই পাণ্ডব পরস্পরের জন্য পরস্পর ত্যাগ স্বীকার করিতেন। এই ত্যাগের ফলে একে অন্যের ভোগ-রক্ষা-ব্যপদেশে কুরুক্ষেত্রে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে পঞ্চ ভ্রাতারই ভোগ রক্ষিত হইয়াছিল। এইরূপে স্বামী স্ত্রীর ভোগের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিবেন। পরস্পরের ত্যাগ দ্বারা পরস্পরের ভোগ নিষ্কণ্টক হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের অর্চ্চনা এই ত্যাগ-সঙ্কল্পের মূল।

অতএব ঈশ্বরের অর্চ্চনা দ্বারা প্রথমতঃ অহঙ্কারকে দূর করিতে হইবে। তখন যদি তুমি সংসারের দিকে চাও, তাহা হইলে দেখিবে যে, এই সংসার কেবল তোমার জন্য নহে। বিধাতা ইহাকে সর্ব্বজীবের আবাসভূমি করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্য ইহা তোমার একচেটিয়া নহে এবং জীবনসংগ্রামও তোমার কর্ত্তব্য নহে। উহা জগতের প্রতি অজ্ঞান-দৃষ্টির ফল। এই অবস্থায় ঈশ্বরের অর্চ্চনা ব্যতীত যখন সংসারের প্রতি মানুষের জ্ঞান-দৃষ্টি হয় না, তখন তাঁহার অর্চ্চনা ব্যতীত মানুষের আর কোনও কর্ম্ম নাই। তুমি বলিতে পার যে, যদি তাহাই হয়, তবে পরমপিতা আমাদের ভিতরে কাম দিয়াছেন কেন? তদুত্তরে শাস্ত্রকার বলেন যে, তোমাকে বন্ধনদশায় ফেলিয়া দুঃখ দেওয়ার জন্য। ইহার প্রভাবেই জগতে জীববৈচিত্র্য হইয়া জগদ্বৈচিত্র্য নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে জীব অধোগামী হয়। পক্ষান্তরে, ঈশ্বরারাধনাত্মক কর্ম্ম করিয়া জগতের প্রতি জ্ঞানদৃষ্টি স্থাপিত হইলে, জীব ইহলোকে সুখী হয় এবং পরলোকে উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। এই ঈশ্বরারাধনাত্মক কর্ম্ম সঙ্কল্পমূলক।

জীবনসংগ্রামেরও একটা সঙ্কল্প আছে। কিন্তু ইহা লোভমূলক বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। জীবনসংগ্রামমূলক সমাজের জননী যখন পুত্রকে সভ্যতা-বিস্তার করার জন্য বিদেশে প্রেরণ করিয়া লোভ হেতু মাতৃস্নেহ ভুলিয়া যান, তখন মা তাহা বুঝেন না। তিনি মনে করেন যে, পুত্রের উন্নতির জন্য তিনি যে সাধু সঙ্কল্প করিয়াছেন, তন্মূলেই তিনি পুত্রকে বিদেশে প্রেরণ করিতেছেন। কিন্তু লোভই যে এইখানে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট সাধু সঙ্কল্পে পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহার মমতাকে দুর্ব্বলতা বলিয়া প্রতীয়মান করাইতেছে, তাহা তিনি বুঝেন না।

এদিকে জীবন-যজ্ঞের গতি স্বতন্ত্র। ইহা মমতার অগ্নিতে লোভরূপী আত্মাকে আহুতি দিয়া প্রকৃত আত্মাকে সংসারের ঊর্দ্ধে উঠাইয়া দেয়। এই জন্য শ্রীভগবান বলিতেছেন,—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।" আত্মার এই উদ্ধার-বিষয়ক প্রণালী বলিতে যাইয়া বৈষ্ণব-চূড়ামণি কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন,—

"আত্মেন্দ্রিয়ে প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়ে প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম-নাম॥"

এই কৃষ্ণেন্দ্রিয়ে প্রীতিদানের সঙ্কল্পই বর্ণাশ্রমীর সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প-মূলে জীবন তাঁহার নিকট যজ্ঞ। জীবনসংগ্রামমূলক সমাজ আত্মেন্দ্রিয়ে প্রীতি-ইচ্ছা-মূলে গঠিত এবং আমাদের সমাজ কৃষ্ণেন্দ্রিয়ে প্রীতি-ইচ্ছার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য এই সমাজের মানুষ প্রথমতঃ পুত্রাদির স্নেহে নিজকে ডুবাইয়া আত্মার অবসাদ নিবারণ করে। অবসাদ-নিবারণের অর্থ স্বার্থবুদ্ধির প্রশমন। স্বার্থবুদ্ধিতে মানুষের যে দাসত্ব জন্মে, তাহা মমত্ব-বুদ্ধি-মূলে নিবারিত হয় এবং তাহার ফলে মানুষের ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যনিষ্ঠা জন্মে। এই সত্যনিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্য্যই আত্মার অবসাদ-নিবারণ পূর্ব্বক মানবের ভিতরে প্রকৃত মনুষ্যত্ব জাগ্রত করে।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, আজকাল যাঁহারা কালের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের মত যদিও বর্ত্তমান জগতে প্রবল হইয়া ইহাকে নীতিধর্ম্মহীন করিয়া স্বেচ্ছাচারী করিয়া উঠাইয়াছে, তথাপি এই স্বেচ্ছাচারের বিরোধী একটী মতবাদ আমাদের শাস্ত্রে প্রচারিত হইয়া জগৎকে শান্তির আশ্বাসে আশ্বস্ত করিতেছে। এই আশ্বাসের মূল জাগতিক কর্ম্মে পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ববোধ। বিপ্লববাদ যেখানে সুখের আশায় মানবীয় চেষ্টা দ্বারা সমাজকে কেবল অশান্তির দিকে লইয়া যায়, শাস্ত্রীয় শান্তিবাদ সেইখানে ঐশ্বরীয় নিয়ম-পালন দ্বারা প্রকৃত শান্তি-

সুখের প্রতিষ্ঠা করে। অবশ্য ইউরোপেও এক সময়ে জাগতিক ব্যাপারে ঐশ্বরীয় নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইত। কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তি যেমন চাউলের গুঁড়ী জলে গলাইয়া তাহা পান করিয়া দুগ্ধের স্বাদ মিটাইতে চায়, ম্লেচ্ছদেশেও এক সময়ে তদ্রূপ কর্ম্মের প্রয়োগ-বিভাগ না জানিয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্মজ্ঞানে তাহা আচরণ পূর্ব্বক ব্যর্থমনোরথ হইয়াছে। ফলে, আজ তথায় ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইতেছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় শান্তিবাদরূপী ধর্ম্ম তাহা নহে। এই কারণে এই দেশের ধর্ম্ম যেমন পাশ্চাত্য ধর্ম্মের ন্যায় Religion নহে, তেমন এই দেশের ইতিহাসও ম্লেচ্ছদেশের ইতিহাসের ন্যায় জীবনসংগ্রামের ইতিহাস নহে। ইহা ধর্ম্মাধর্ম্মের আবর্ত্তনের ইতিহাস। এই ইতিহাসটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই বুঝিতে পারিব যে, আজ জাগতিক রাজশক্তিসমূহের প্রভাবে সত্যাদি ধর্ম্ম শত্রুগৃহে পতিত হওয়া প্রযুক্তই আমরা ধর্ম্মাধর্ম্মকে মানব-বুদ্ধিপ্রসূত (convention) লোকাচার মনে করি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমাদের ভিন্ন পথ নাই

এইখানে প্রতিপক্ষের আপত্তি হইতে পারে যে, গ্রন্থকার কেবল প্রাচীন গ্রন্থাদিতে একটী নৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্রের বর্ণনা পাঠ করিয়া একটা অলীক সামাজিক সুখের কল্পনা করিতেছেন। কিন্তু এইরূপ রাষ্ট্র কোথাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। ইহা একটী কল্পনার রাজ্য মাত্র। প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, বর্ণাশ্রম এখন তথাকথিত অধর্ম্মের নিকট পরাজিত। এই অবস্থায় বর্ণাশ্রম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলে আমাদিগকে পুনরায় অন্ধকারে ডুবিতে হইবে। আজ পাশ্চাত্য আলোকে আলোকিত না হইলে, আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের স্পন্দন পর্য্যন্ত হইত না। যে সমাজব্যবস্থা অপরাপর সমাজব্যবস্থার নিকট জীবনসংগ্রামে পরাজিত হয়, তাহাই দুর্ব্বল ও পরিত্যাজ্য। এই কারণে বর্ণাশ্রমের দুর্ব্বল সমাজব্যবস্থাও পরিত্যাজ্য। কিন্তু যদিও শিক্ষিত সমাজ এই সকল আপত্তি করিতেছেন, তথাপি আজ চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রকৃতিই আমাদের জাতীয় জীবনের বিরোধী। বর্ণাশ্রম এই দেশের চিররক্ষক। এই রক্ষাবিধির বিরুদ্ধে অন্যরক্ষাবিধি এই দেশকে রক্ষা না করিয়া ইহাকে ভক্ষণ করে। স্বীকার করি, বর্ণাশ্রম এখন ম্লেচ্ছের নিকট পরাজিত। স্বীকার করি, আমরা আজ ম্লেচ্ছজাতির দাস। কিন্তু এই দাসত্বটা কি স্থায়ী? ইংরেজ কখনও বলেন না যে, তাঁহারা চিরকাল এই দেশে রাজত্ব করিবেন। তাঁহারা স্বভাবতঃই মনে করেন যে, শিক্ষাদ্বারা আমাদের চরিত্রে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করা

তাঁহাদের কর্ত্তব্য এবং এই কর্ত্তব্যতা যখন শেষ হইবে, তখন আমাদের যোগ্য দেখিয়া তাঁহারা স্বদেশে চলিয়া যাইবেন। বস্তুতঃ, জাতীয়তা যদি এই দেশের উপযোগী হয়, তাহা হইলে এইরূপ ইচ্ছার ন্যায় সদিচ্ছা আর কখনও কল্পনা করা যাইতে পারে না। আবার এইরূপ ইচ্ছা যেখানে থাকে, সেইখানে আমাদের দাসত্ব স্থায়ী হইবে, এইরূপ কল্পনাও করা যাইতে পারে না। যত দূর বুঝা যায়, তাহাতে তাঁহারা আমাদের যোগ্যতর দেখিতে চাহেন। যোগ্যতা হইলে যে তাঁহারা চলিয়া যাইবেন, ইহা বিশ্বাস করার সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, তখন তাঁহারা এই দেশে রাজত্ব করার যুক্তিসিদ্ধ কারণ পাইবেন না। সুতরাং ইহা অবধারিত যে, আমাদের এই দাসত্ব স্থায়ী নহে। যোগ্য হইলেই আমরা স্বাধীনতা পাইব। এক্ষণে ইংরাজ ও নব্যতন্ত্রী মনে করেন যে, জাতীয়তাকে গ্রহণ করিলে আমরা স্বাধীনতা-লাভের যোগ্য হইব। এইজন্য ইংরাজ আমাদিগকে ইংরাজী-শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু এইখানেই প্রশ্নটী গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। কেন না, অনুসন্ধানে যদি ইহা দাঁড়াইয়া যায় যে, এই জাতীয়তা আদৌ দেশের উপযোগী নহে, পরন্তু ইহা দ্বারা দেশে যতটুক মনুষ্যত্ব আছে, তাহাও লুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইংরাজ অমৃতভ্রমে আমাদিগকে বিষ গলাধঃকরণ করাইতেছেন এবং আমরাও তাহা অমৃতভ্রমেই গলাধঃকরণ করিতেছি। শাস্ত্রবাক্য সত্য হইলে, বুঝিতে হইবে যে, আমাদের যোগ্যতার একটা স্বতন্ত্র পথ আছে। ইংরাজজাতির প্রদর্শিত পথ আমাদের পথ নহে। তবে এই জাতির আশ্বাসবাণী দ্বারা আমরা এই আশা করিতে পারি যে, যোগ্যতর হইলে আমরা এক সময়ে স্বাধীনতালাভ করিতে পারিব। এই অবস্থায় আমাদের যোগ্যতার স্বতন্ত্র পথ থাকিলে, কেন আমরা সেই পথে অগ্রসর হইব না?

এ যাবৎ আমরা পাশ্চাত্য স্বাধীনতার পথে যতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে বুঝা যায় যে, যদি আমরা এই পথেই যাই, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীন পথ আমরা ভুলিয়া যাইব। শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা নহে। দেশের ইতিহাস ও প্রাকৃতিক অবস্থাই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, ধর্ম্মের পথেও একটা যোগ্যতা রহিয়াছে। এই অবস্থায় কোন্ শ্রেণীর যোগ্যতা-লাভের পথ আমাদের অবলম্বনীয়, তাহা আমাদের বিবেচ্য। এক কথায় বলিতে গেলে উভয় যোগ্যতার তারতম্য কি, তাহাই এই স্থলে আমাদের বিচার্য্য। কিন্তু এইখানে আপত্তি হইতে পারে যে, এই বিচারে কোনই লাভ নাই। ইহা একটা Academical বিচার মাত্র। কারণ ইংরাজ যে পথে আমাদিগকে যাইতে বাধ্য করিতেছেন, সেই পথেই আমাদিগকে যাইতে হইবে। বস্তুতঃ ইহাও আমরা স্বীকার করি না। আমাদের রাজজাতির উদারতা আমাদিগকে বাধ্যবাধকতার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে। ১৮৫৮ ইং সনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই দেশে যে ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এবং গভর্ণমেণ্টের পরবর্ত্তী আচরণই ইহার প্রমাণ।

ঐতিহাসিক পণ্ডিত Meadows Taylor বলিতেছেন :—

"On Nov. 1. a year after the rule of the company had fallen into abeyance, the gracious proclamation of Queen Victoria was issued by the Governor-General at Allahabad, translated into all the vernacular languages of India, read at every native Court and freely circulated into all classes of people. It was admirably worded and fell like oil upon troubled waters. By it all existing dignities, rights, usages and treaties

were confirmed. All grounds of suspicion of tampering with caste and religious faith were removed, and from the highest to the lowest ranks of Society, a reliant spirit of calm assurance and acquiescence in its simple provisons was at once effected."

অনুবাদ:—১৮৫৮ ইংরাজীর ১লা নভেম্বর তারিখে অর্থাৎ কোম্পানীর রাজত্ব-পরিত্যাগের এক বৎসর পর, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অনুগ্রহজাত ঘোষণাপত্র গভর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক এলাহাবাদে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা ভারতের সর্ব্বভাষায় অনূদিত হইয়া প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যে পঠিত হইয়াছিল এবং বিনামূল্যে সর্ব্বশ্রেণীর প্রজাগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। ইহা অতি প্রশংসাজনক শব্দবিন্যাসে বিন্যস্ত হইয়াছিল এবং উচ্ছ্বসিত ও ফেনায়িত জলপূর্ণ কটাহে তৈলের ন্যায় পতিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা দেশের প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত উচ্চপদবী, অধিকার, প্রচলিত প্রথা ও সন্ধিসর্ত্তসমূহ পুনরায় জাগ্রত ও রক্ষিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা হিন্দুর জাতিনাশ বা হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মনাশ-বিষয়ক সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছিল এবং সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তর হইতে সর্ব্বনিম্ন স্তর পর্য্যন্ত প্রত্যেকের মধ্যে এই প্রতিশ্রুতিমূলে একটা নির্ভরতার ভাব জাগ্রত হইয়া ইহার সরল উদার সর্ত্তগুলি সম্বন্ধে এক শান্ত ও নীরব সম্মতি আনীত হইয়াছিল।

এই ঘোষণাপত্র দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যদিও ইংরাজ এই দেশে জাতীয়তাবাদ আনয়ন করিতেছেন, তথাপি আমাদের যোগ্যতাকে কোন্ পথে ধাবিত করিতে হইবে, তৎ-সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কোনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নাই। এক কথায় বলিতে গেলে, গভর্ণমেণ্ট যে পাশ্চাত্য জাতীয়তা-বাদের মন্ত্রে আমাদিগকে বলপূর্ব্বক দীক্ষিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এমন

কথা এই ঘোষণাপত্র দ্বারা বুঝা যায় না। আমরা ইংরাজীশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া পাশ্চাত্য স্বদেশপ্রেমের সহিত আমাদের ধর্ম্মের তারতম্য পরীক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত হইয়াছি মাত্র। এই অবস্থায় আমরাই যদি এই শিক্ষার প্রভাবে ধর্ম্মত্যাগ করি ও জাতীয়তাকে গ্রহণ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট স্পষ্ট বুঝিবেন যে, আমরা পাশ্চাত্য জগতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং এই প্রণালীতে যদি গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে শোধন করিতে পারেন, তাহা হইলে দোষের বিষয় কিছুই নাই। কেবল প্রশ্ন থাকে যে, আমাদের ইহাতে দায়িত্ব আছে কি না? বস্তুতঃ, দায়িত্ব গুরুতর। এই দায়িত্বভার-সম্পাদনের জন্য দেশে কোনও চেষ্টা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। সকলেই মনে করিতেছেন যে, আমরা নিতান্তপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশ যেমন যোগ্য হইয়াছে, তেমন যোগ্যই হইব অথবা ততোধিক যোগ্য হইলে ফ্রান্স, জার্ম্মানি, প্রভৃতি দেশের ন্যায় পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিব। বর্ত্তমানে এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সহিত কংগ্রেস একমত। তবে যে মতভেদ হইতেছে, তাহার কারণ এই যে, কংগ্রেস বলেন যে, আমরা যোগ্য হইয়াছি। তোমরা এই দেশের আধিপত্য আমাদিগকে অর্পণ কর এবং ইংরাজ বলেন যে, তাহা ভুল। এখন পর্য্যন্ত তোমরা একটা জাতিতে পরিণত হইতে পার নাই। তোমার দেশে এতগুলি সম্প্রদায় আছে যে, প্রত্যেকের স্বার্থ প্রত্যেকের বিরোধী। এই অবস্থায় আমরা তোমাদের উপর ভার দিয়া গেলে তোমরা কাটাকাটি করিয়া মরিয়া যাইবে।

এইরূপে উভয় পক্ষের মতভেদ চলিতেছে বটে; কিন্তু জাতীয়তা সম্বন্ধে কোনও মতভেদ দৃষ্ট হয় না। মতভেদ কেবল যোগ্যতাবিষয়ক। কংগ্রেস বলেন, আমরা যোগ্য হইয়াছি; ইংরাজ বলেন, হও নাই। কিন্তু কংগ্রেসের কথা কি সত্য? কখনও নহে। পরন্তু ইংরাজের কথাই

স্বতঃসিদ্ধ। একটী কথা এই দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রত্যেকে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই জাতীয়তার জাগরণের পূর্ব্বে এই দেশে হিন্দুর মধ্যে পরস্পর সাম্প্রদায়িক বিরোধ থাকা দূরে থাকুক, হিন্দু-মুসলমানেও সাম্প্রদায়িক বিরোধ হইত না। পাণিপথের শেষ যুদ্ধের পর এই দেশে হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ লুপ্ত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর দেশে ইংরাজ-রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৫ আইন (Police Act) পাস হওয়া পর্য্যন্ত ১০০ এক শত বৎসর কাল এই দেশ এক প্রকার অরাজক ছিল। এই অরাজকতার সময়েও হিন্দুমুসলমানের মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক বিরোধ হয় নাই। এই অবস্থায় আজ যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ হইতেছে, তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, জাতীয়তা অতি অযোগ্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে উন্নতশির করিয়া দেয় এবং অহঙ্কার বিষয়তৃষ্ণাবশতঃ বিরোধের কারণ ঘটায়। রুষিয়াকে বাদ দিলে ইউরোপ এই ভারতবর্ষের সমান। কিন্তু এই স্থানটীর মধ্যে জাতীয়তাবুদ্ধি অনেকগুলি জাতির উৎপত্তি করিয়াছে। এই সকল জাতি আহারে, বিহারে, এমন কি যৌন-সম্বন্ধের কুটুম্বিতার বন্ধনে ও রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ফরাসী, জার্ম্মাণী প্রভৃতি বিভিন্ন স্বার্থবিশিষ্ট বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়তার অহঙ্কার। এই অহঙ্কার যদি স্ফুরিত না হইত, তাহা হইলে এই সকল জাতি এক হইয়া একটী ইউরোপীয় জাতিতে পরিণত হইত। কিন্তু অহঙ্কার তাহা হইতে দেয় নাই। এই অহঙ্কারই আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা সংক্রামিত হইয়া দেশে অনন্ত ভেদের সঞ্চার করিয়াছে। এইজন্যই ইংরাজ বলিতেছেন যে, আমরা এখনও যোগ্য হই নাই। বস্তুতঃই, এখন ইংরাজ চলিয়া গেলে আমাদের মরিতে হইবে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিলে, বুঝা যায় যে, কোনও কালেই এই ভারতবর্ষ একমতাবলম্বী মনুষ্যগণ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই বলেন যে, এই দেশ আর্য্যগণ দ্বারা বিজিত হওয়ার পর দেশটা আর্য্য ও অনার্য্য দুই শ্রেণীর মনুষ্যগণ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। অনার্য্যগণই আবার বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এই কথা যদিও গ্রন্থকার অস্বীকার করেন, তথাপি এই কথা-দ্বারা ইহা স্বীকৃত হয় যে, এই দেশের বর্ণাশ্রমিগণ বিভিন্ন মতাবলম্বী মনুষ্যগণ লইয়া সর্ব্বদা চলিতে অভ্যস্ত ছিলেন। অথচ ইউরোপের ন্যায় এদেশের মনুষ্যগণ বিভিন্ন নেশনে পরিণত হইয়া পরস্পর পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদ করে নাই। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইয়াছে সত্য; কিন্তু বাঙ্গালীর সহিত বেহারীর কোনও যুদ্ধ হয় নাই। এইরূপে কাশীরাজ্যবাসীর সহিত কান্যকুব্জবাসীর কোনও যুদ্ধ হয় নাই। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র দেশেরই ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণ অকুতোভয়ে দেশে বাস করিত।

এই অভয়প্রদান ব্যাপারে আর্য্য ও ম্লেচ্ছের মধ্যে কোনও তারতম্য ছিল না। রাজগণ অপত্যনির্ব্বিশেষে সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বমতাবলম্বী মনুষ্যগণকে প্রতিপালন করিতেন। তারপর ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াত নিরাপদ্ ছিল।

"Chandra Gupta consolidated the whole of the Northern and much of the Eastern portion of India into one monarchy and during his reign, great progress was made in traffic, not only with Western Nations by land, but by sea with those of the East. Hindus founded colonies in Java and Siam, and introduced their religion into those countries. In India, roads were

marked out for travellers, resting places or inns were established, and the police is mentioned by Megasthenes in high terms of praise."

Meadow Taylor's History of India.

অনুবাদ :—চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র উত্তরভারত এবং পূর্ব্বভারতের অধিকাংশ স্থল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময়ে পান্থব্যাপারের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। যাতায়াতের পথ যে কেবল স্থলপথে পাশ্চাত্য-জাতিসমূহের সহিত সুগম হইয়াছিল, এমন নহে, নৌপথে পূর্ব্বদেশীয়গণের সহিতও যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। হিন্দুগণ যব ও শ্যামদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল দেশে তাঁহাদের ধর্ম্মস্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ভিতরে পান্থগণের জন্য রাস্তা নির্ম্মিত ও পান্থনিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস এই দেশের পুলিসের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখ, ইহার কারণ কি? কি কারণে একা চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার জীবিতকালে সমগ্র উত্তরভারত ও পূর্ব্বভারতের অধিকাংশ স্থল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে 'পারিয়াছিলেন? চন্দ্রগুপ্তের, এমন কি নন্দবংশের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে উত্তর ও পূর্ব্বভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অথচ চন্দ্রগুপ্ত এক জীবনে এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে তাঁহার অধীনে আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইউরোপে এক জীবনে দূরে থাকুক, অদ্য পর্য্যন্ত স্পেন ও পর্টুগাল এক রাজ্যে পরিণত হয় নাই। ইহার কারণ, ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়তা। এই ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়তা এক একটী ক্ষুদ্র দেশকে সমস্বার্থে একত্র করিয়া ক্ষমতাশালী রাজ্যে পরিণত করে বটে, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ দেশে এই জাতীয়তার শক্তি প্রতিহত হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখ,

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্টুগাল, হল্যাণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি প্রত্যেক দেশেরই শক্তি এক এক সময়ে প্রবল হইয়াছে, কিন্তু রুষিয়ার শক্তি জাতীয়তামূলে কখনও প্রবল হয় নাই। আজও একটা বড় যুদ্ধ না হইলে, কমিউনিষ্ট রুষিয়ার শক্তি বুঝা যাইবে না। জাপান জাতীয়তাকে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রবল হইয়াছে, কিন্তু চীন এখনও তাহা পারে নাই। পারিবে বলিয়া ভরসাও নাই। ইহার কারণ এই যে, জাতীয়তার শক্তি একটা অহঙ্কারের শক্তি। অহঙ্কার দেহেতে আত্মবোধ করিয়া দেহের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তুতে আত্মবোধ করে এবং অপর সকলকে ভোগের সাধক মনে করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের মানুষগুলি পরস্পর পুরুষানুক্রমিকরূপে এমনভাবে যৌন সম্বন্ধ ও আদান-প্রদান-মূলে মায়া-মমতায় আবদ্ধ হয়, যে এই গণ্ডীর ভিতরে মেথরের অহঙ্কার পর্য্যন্ত একজন ডিউকের উন্নতিতে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। জাতীয়তার আসর আমাদের যাত্রাগানের আসরের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র দেশেই জমাট বাঁধে। যৌনসম্বন্ধ ও আদান-প্রদান দূর-দূরান্তরে খুব অল্পই সম্ভব হয়, এবং তজ্জন্য বৃহৎ বৃহৎ দেশে জাতীয়তার আসর জমাট বাঁধে না। দেহের সঙ্গীত যত দূর শুনা যায়, ততদূরই এই আসরের লোক ভাবাবিষ্ট হয়, দূরে কেবল কোলাহল হয়। এই কোলাহলের কারণ মায়া মমতার অভাবজনিত দাম্ভিক প্রভুত্ব ও দাসত্বের অনুভূতি। স্পেন যদি পর্টুগালকে একরাজ্যভুক্ত করে, তবে পর্টুগালের লোক দাসত্ব অনুভব করিবে। দাম্ভিকতাজনিত পক্ষপাত ইহার কারণ। নিজের গণ্ডীর বাহিরে অতি অল্প লোকই ন্যায়পরায়ণ হয় এবং ন্যায়পরতার অভাব দাসত্বানুভূতির হেতু হয়। অহঙ্কার সর্ব্বদাই নিজেকে বড় রাখিতে চায় এবং দেহের সঙ্গীতের আসরের বাহিরে এই আত্মবোধ খর্ব্ব হইয়া তথায় প্রয়োজনমতে পীড়া-প্রদানে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়।

এই পীড়ানুভূতিই বৃহৎ বৃহৎ দেশে জাতীয়তার সঙ্গীত নষ্ট করিয়া দেয়। ভারতের ব্রাহ্মণগণ এই কথা বুঝিয়াছিলেন এবং অনুভব করিয়াছিলেন যে, জাতীয়তা এই দেশে কখনই আসর জমাইতে পারিবে না। দেহের সঙ্গীত ভারতের সঙ্গীত নহে। ভারতের সঙ্গীত প্রাণের সঙ্গীত। এই সঙ্গীত দয়া, মায়া, কোমলতা, সহানুভূতি ও ন্যায়পরতার তন্ত্রীতে ধ্বনিত হইয়া জগৎকে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হয়। ইহা বক্তৃতায় ফুটে না—ভাষায় প্রকাশ পায় না—কেবল চরিত্রের নীরব ভাষায় ধ্বনিত হয়। প্রাচীন ঋষিগণ এই ভাষা জানিতেন এবং তাহাতেই তাঁহারা হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এবং কাবুল হইতে আসাম পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেশেই এই ভাষা ফুটাইয়া জ্ঞানী-অজ্ঞান সর্ব্ববিধ মনুষ্যের মধ্যে একটা ঐকতান বাদন রক্ষা করিয়াছিলেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রত্যেক মন্ত্র হইতে এই সঙ্গীত উত্থিত হইত এবং চতুর্ব্বর্ণ ইহার পালা গাইত। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত এই দেশে এই গানের গায়ক ও বাদক উভয়ই কিছু কিছু ছিল। এই জন্য এলেকজেণ্ডারের বিজয়বাহিনীর জাতীয় শক্তি এই ঐকতান বাদন নষ্ট করিতে পারে নাই এবং চন্দ্রগুপ্তও পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ও উত্তরভারতকে একজীবনে এক-রাজ্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত নহে। জাতীয় সঙ্গীত একটা নির্দ্দিষ্ট চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন মনুষ্য-সমষ্টির দম্ভ ও অহঙ্কার সগৌরবে ঘোষণা করে; পক্ষান্তরে, এই সঙ্গীত প্রতিক্ষেত্রে পরপীড়া-প্রবৃত্তির পরিহার শিক্ষা দিয়া ম্লেচ্ছকে পর্য্যন্ত সেবা করার প্রবৃত্তি দেয়।

হিন্দুর এই জীবসেবাব্রত ব্রাহ্মণে এক প্রকার, ক্ষত্রিয়ে এক প্রকার, বৈশ্যে এক প্রকার এবং শূদ্রে আর এক প্রকার। এই চতুরঙ্গ সেবা-ব্রতের সঙ্গীত ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের গায়কগণ

বেদমন্ত্রে নারায়ণসেবা ও জীবসেবা একত্র করিতেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পর বৌদ্ধ-বিপ্লবে বৈদিক মন্ত্রধ্বনি যখন লুপ্ত হইল, তখন দেশে আর এই সঙ্গীত রহিল না। তারপর শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে যখন ছিন্নতার বীণায় তন্ত্রী-সংযোগ হইয়া তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন এই সঙ্গীতের আসর বজায় রহিল বটে, কিন্তু গান আর তেমন জমিল না। তথাপি এই সঙ্গীতের গায়কগণ মুসলমানের ব্যক্তিত্বের পদাঘাত সহিয়া যতটুকু মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, ততটুকু মনুষ্যত্বই আকবর প্রভৃতি সম্রাটের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছিল এবং ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১০০ বৎসর কাল বেসুরা বেতালা সঙ্গীত গাহিয়া অরাজকতার ভিতরেও শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই মনুষ্যত্বের বলেই হিন্দু আমাদের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টেরও শ্রদ্ধাকর্ষণ পূর্ব্বক প্রথম হইতেই ভারতের সম্পূর্ণ রাজকার্য্য একা পরিচালন করিয়াছিল। ভারতের Penal Code, Criminal Procedure Code হইতে আরম্ভ করিয়া Stamp Act, Arms Act পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী আইনে হিন্দুর হস্তচিহ্ন ও মানসিক শক্তির চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক রেগুলেশনে হিন্দুর রাজকার্য্যে অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও উৎসাহে মিশ্রিত প্রভুপরায়ণতার চিহ্ন দেদীপ্যমান। রাজা টোডরমল্ল ও মহারাজ মানসিংহ সহ অসংখ্য হিন্দু-রাজকর্ম্মচারী ও হিন্দু-সহায় না থাকিলে যেমন আকবরের civil administration অসম্ভব হইত, মুন্সী নবকৃষ্ণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ, রাজা রামমোহন প্রভৃতি না থাকিলে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের civil administrationও সেইরূপ এই দেশে দাঁড়াইতে পারিত না। ৺চন্দ্রনাথ বসু, ৺দীনবন্ধু মিত্র, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺বঙ্কিমচন্দ্র, ৺হেমচন্দ্র, ৺নবীনচন্দ্র প্রভৃতি প্রত্যেকে প্রতিভার জ্বলন্ত মূর্ত্তি ছিলেন।

তারপর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফ সম্প্রদায় সহ লাটদপ্তরের কেরাণীবর্গ ও জজ-কলেক্টারের সেরেস্তাদারগণ এবং প্রতিভাশালী পুলিস অফিসারগণই ভারতবর্ষব্যাপী মহারণ্যে ইংরাজ-অফিসারগণের পথপ্রদর্শক থাকিয়া আজও এই গভর্ণমেণ্টকে সতেজে রাজকার্য্য পরিচালন করার সুযোগ দিতেছেন। ইহার ভিতর অনুসন্ধান করিলে, তুমি কি দেখিতে পাও? দেখিতে পাও যে, এক অসাধারণ শান্তিপ্রিয় জাতি ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়তার কোনও প্রশ্ন না করিয়া একটী বিদেশীয় শক্তিকে ভারতে স্থায়ী করার চেষ্টা করিতেছে। জাতীয়তার দৃষ্টিতে তুমি ইহাকে "গোলামখানা" বলিতে পার, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি মনুষ্যত্বের দৃষ্টিতে দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে যে, এই গভর্ণমেণ্ট-অফিসারগণ নিতান্ত হেয় মনুষ্য নহেন। প্রথমতঃ ইঁহাদের বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখ, জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে কোথাও তুমি এইরূপ বিশ্বাসী কর্ম্মচারি সম্প্রদায় পাইবে না। বিশেষতঃ, ইঁহারা প্রত্যেকে জানেন যে, এক বিদেশীয়, বিজাতীয় ও ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী গভর্ণমেণ্টের নিকট ইঁহারা বিশ্বাসরক্ষা করিতেছেন। আজ অবশ্য তুমি বলিতে পার যে, গভর্ণমেণ্টের মেশিনে পড়িলে সকলকেই এইরূপ বিশ্বাসী হইতে হয়। কেন না, চাকুরী ছাড়িলে মানুষ যাইবে কোথায়? কিন্তু তাহা নহে। প্রথম যখন মুন্সী নবকৃষ্ণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতি পুরুষগণ বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে গভর্ণমেণ্টের অনেক অনিষ্ট করিতে পারিতেন। ইহার পরও সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে তাঁহারা নানা বিভাগে উচ্চপদে কার্য্য করিয়াছেন; তাঁহাদের এমন সুযোগ গিয়াছে যে, তাঁহারা গোপনে সিপাহীদিগের সহিত যুক্ত থাকিলে হয়ত ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য আজ আদৌ থাকিত না। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া

বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়াছিলেন। কেন তাঁহারা এইরূপ করিলেন, তাহার কারণ ক্রমে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইলে বুঝিবে। তবে মোটামুটী ইহা জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইঁহাদের মায়ামমতাপূর্ণ চরিত্র ইহার মূল। গভর্ণমেণ্ট আমাদের অন্ন দিতেছেন, আমাদের পরিবার এই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতেছে, এই অবস্থায় অন্যে যাহা করে করুক না কেন, আমি ইহার বিরুদ্ধে গেলে আমার পরকাল যাইবে, এইরূপ একটা বিবেকজনিত বুদ্ধি হইতে এই সকল রাজকর্ম্মচারী সিপাহী-যুদ্ধের সময়েও গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসী ছিলেন। এই সুযোগ যদি আজ হইত, তাহা হইলে কয় জন রাজকর্ম্মচারী বিশ্বাসী থাকিতেন, তাহা বলা যায় না। ইঁহারা দেশের কথা ভাবেন নাই, ধর্ম্মের কথা ভাবেন নাই, কেবলমাত্র প্রভুধর্ম্মমূলে অপর সকল ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তুমি ইঁহাদের গোলাম বল আর যাহাই বল না কেন, বিশ্বস্ততা হিসাবে তোমার চেয়ে ইঁহারা অনেক শ্রেষ্ঠ। তুমি দেশ চাও, কিন্তু দেশে দলাদলি লাগাইয়া একের মঙ্গল ও অপরের অমঙ্গল সাধন করিয়া থাক। তুমি দেশের কাজ চাও, কিন্তু সহসা স্বার্থের জন্য দেশেরই বিরুদ্ধে যাও। কিন্তু কোনও স্বার্থই ইহাদের টলাইতে পারে নাই। এক কথায় বলিতে গেলে তোমার নীতি নাই, ইহাদের নীতি আছে। ইহারা কৃতজ্ঞ, তুমি অকৃতজ্ঞ; ইহারা বিশ্বাসী, তুমি অবিশ্বাসী। আজ এক বিদেশীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশ্বাস রক্ষা করায় তুমি ইঁহা-দিগকে নিন্দা করিতেছে, কিন্তু কাল যদি জাতীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট ইঁহারা বিশ্বাস রক্ষা করেন, তাহা হইলে তুমিই ইঁহাদের প্রশংসা করিবে।

এই প্রভু ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত ও কৃতজ্ঞ চরিত্রই খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সর্ব্বজাতির সহিত মৈত্রী-রক্ষা পূর্ব্বক অরাজকতার সময়েও এই দেশে

শান্তিরক্ষা করিয়াছিল। তবে এই চরিত্রে দোষ এই যে, ইহা প্রতিক্ষেত্রেই নিজের অন্ননাশের ভয়ে ভীত। পরিজনবর্গের অন্ন নষ্ট হওয়ার ভয়ে এবং প্রাণের ভয়ে ইঁহারা সর্ব্বদাই কাতর। এই কাতরতাবশতঃ ইঁহারা বলবানের আশ্রয়প্রার্থী। এই আশ্রয়ের প্রলোভনে ইঁহারা সর্ব্বদাই আশ্রয়দাতার ইচ্ছার অনুগামী থাকেন। এই সময়ে তাঁহাদের বিবেক থাকে না। যে বিবেক ইঁহাদের শত প্রলোভন উপেক্ষা করিয়াও প্রভুপক্ষে রাখিয়া দেয়, সেই বিবেকই অন্নের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সহসা এমন স্থিতিস্থাপক হইয়া উঠে, যে ইহা অপরাপর ধর্ম্মের হিসাব রাখিতে চাহে না। এইরূপে বিসর্গের যেমন আশ্রয়-স্থানভাগী উচ্চারণ, ইঁহাদেরও তেমনি উচ্চারণ। কিন্তু তাহা হইলেও, ইহাতে কৃতজ্ঞতা ও প্রভু-পরায়ণতা মনুষ্যত্বের সূচনা করে। এ যাবৎ যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দুইটী কথা প্রমাণিত হইয়াছে ঃ—

(১) আমাদের চরিত্রে এমন এক শ্রেণীর মনুষ্যত্ব আছে, যাহা জগতের অন্য কোনও জাতির নাই। আমরা কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসী। এই শ্রেণীর কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা অন্য জাতির নাই।

(২) এই দেশ এত বিশাল এবং ইহাতে এতগুলি বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় আছে যে, ইহাতে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। ইহা পরীক্ষিত সত্য যে, মনুষ্যত্বই সর্ব্বদা এই দেশের শান্তিরক্ষা করিয়াছে এবং আজও করিতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথ-যুদ্ধের পর হইতে ১৮৬১ পর্য্যন্ত এই দেশে পুলিস-আইনানুযায়ী কোনও শান্তিরক্ষী দল ছিল না। এই অবস্থায় যে হিন্দুগণ তাহাদের জাতিকুল ও মান লইয়া রহিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, হিন্দু সর্ব্বদাই তাহার মনুষ্যত্ব-দ্বারা অপরাপর জাতিকে মোহিত করিয়া রাখার শক্তি ধারণ করে। এই

শক্তি পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির নাই। এইজন্য হিন্দুর মনুষ্যত্বের শক্তিই এই সময়ে ভারতের শান্তিরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে। হিন্দুর এই চরিত্র ও ইতিহাসই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যে নৈতিক সমাজ-ব্যবস্থার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার একবর্ণও মিথ্যা নহে। ধর্ম্মই এই দেশের চিররক্ষক। ধর্ম্মমূলক চরিত্র জাতির শান্তিরক্ষা করে এবং স্বদেশ-প্রেমমূলক জাতীয়তা-বাদ ইহার শান্তিভঙ্গ করে। এই জাতীয়তাবাদই গত ইউরোপীয় মহাসমরের কারণ হইয়াছিল এবং এই জাতীয়তাবাদই অচিরাৎ জগদ্ব্যাপী আর এক মহাসমরের কারণ হইবে। ম্লেচ্ছদেশসমূহ চিরকালই জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমের দেশ। তথায় ধর্ম্ম নাই এবং আমাদের দেশে জাতীয়তা নাই। এই জাতীয়তার দরুণ তথায় এক জাতিকে ধ্বংস করিয়া আর এক জাতি তাহার স্থান অধিকার করিতেছে এবং এক সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়া আর এক সভ্যতার অভ্যুত্থান হইতেছে। আমরা এই জাতীয়তাকে গ্রহণ করিলে, এত কালের মধ্যে জগতের গাত্র হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতাম। কিন্তু এ যাবৎ তাহার কিছুই হয় নাই। ভারতের সভ্য অসভ্য প্রত্যেক জাতিরই পুরুষানু-ক্রমিক ধারা বিদ্যমান আছে। এই বিদ্যমানতাই প্রমাণ করিয়া দেয়, যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এই দেশে অমৃতের কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান স্বদেশপ্রেম হিন্দুজাতিকে ধ্বংস করার পথ পরিষ্কার করিতেছে। অনেকে দুঃখ করিয়া বলেন যে, জগতে বর্ণাশ্রমীর সংখ্যা অল্প। বস্তুতঃ ইহা সত্য। কিন্তু এই জগতে প্রকৃত স্বাধীনতা অল্প লোকেই লাভ করিতে পারে। আবার যাহারা ইহা লাভ করে, তাহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও, অপর সকলের উপর প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়। এই প্রভুত্বের মূল চরিত্র ও মনুষ্যত্ব। এই চরিত্র ও মনুষ্যত্ব সমাজে জাতিভেদের ফল।

ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি করিবেন যে, তাহা হইলে সমাজে জাতিভেদ থাকা সত্ত্বেও, এই দেশ পরাধীন হইল কেন? কিন্তু ইহার উত্তর কঠিন নহে। স্বাধীনতা লাভ করিতে যেমন চরিত্রের প্রয়োজন, তেমনই চরিত্রলাভ করার জন্য সাধনার প্রয়োজন। এই সাধনার নাম তপস্যা। চরিত্র লাভ করিতে মানবের এই তপস্যা আবশ্যক। ইহা লাভ করার জন্য যেমন তপস্যা আবশ্যক, ইহা রক্ষা করার জন্যও তেমন অপস্যা আবশ্যক।

আমরা সেই তপস্যা দ্বারা ইহা রক্ষা করিতে পারি নাই। কাজেই আমরা জাতিভেদ থাকা সত্ত্বেও, পরাধীন হইয়াছি। জাতিভেদ চরিত্র নির্ম্মাণ করে না। ইহা মানবকে চরিত্র-নির্ম্মাণের জন্য তপস্যা করার সুযোগ দেয়। যে সমাজে জাতিভেদ থাকে না, সেই সমাজে এই সুযোগও থাকে না। এইজন্য ইহা সর্ব্বথা রক্ষণীয়। জাতিভেদ আমাদিগকে চরিত্র-নির্ম্মাণের সুযোগ দেয় বলিয়া ইহা আমাদের ধর্ম্ম। কেন না, ইহা আমাদের চরিত্র-নির্ম্মাণের সুযোগ দিয়া মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতা-লাভের সুযোগ প্রদান করে।

এক্ষণে আমরা প্রতিপক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আপত্তির সম্মুখীন হইয়াছি। এই আপত্তি এই যে, যাহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, তাহাদের কি চরিত্র নাই? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, চরিত্র দুই প্রকার :—(১) যজ্ঞীয় চরিত্র (২) অযজ্ঞীয় সাংগ্রামিক চরিত্র। যজ্ঞীয় চরিত্র লাভ করিতে হইলে, মানুষ পরিবারের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া স্থির-চিত্তে সর্ব্বকর্ম্মে ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং সাংগ্রামিক চরিত্রে মানুষ পরিবারকে সংসাররূপী রণক্ষেত্রের উপযোগী একটা সেনানিবাসে পরিণত করিয়া, অনবরত তৃষিত ভাবে বিষয়ের অনুসন্ধান করে। এইরূপে দুইজনের দুই প্রকার চরিত্র গঠিত হইয়া, দুই প্রকার যোগ্যতা জন্মে :—

(১) সাংগ্রামিক যোগ্যতা।

(২) যজ্ঞার্থ-কর্ম্মমূলক যোগ্যতা।

সাংগ্রামিক যোগ্যতা কাহাকে বলে, তাহা জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত নিম্নলিখিতভাবে বলিয়াছেন :—

"Social evolution means the evolution of a strong social tissue, the best type is the type implied by the strongest tissue."

Leslie Stephen.

অনুবাদ :—সামাজিক ক্রমোন্নতির অর্থ সমাজের মাংসপেশীজনিত শক্তির ক্রমোন্নতি। এই সকল ক্রমোন্নতিবিশিষ্ট সমাজের শ্রেণীভেদ করিলে প্রতীতি জন্মিবে যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাংসপেশীজনিত শক্তি-বিশিষ্ট সমাজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর সমাজ।

মাংসপেশীর শক্তি সংগ্রামের উপর নির্ভর করে, এই জন্য এই সকল সমাজে স্বধর্ম্মের পরিবর্ত্তে জীবনসংগ্রামের ব্যবস্থা। কুস্তীওয়ালাগণ যেমন কুস্তী দ্বারা তাহাদের মাংসপেশীর শক্তি বৃদ্ধি করে, এই সকল সমাজও তেমন সংগ্রামরূপী কুস্তী দ্বারা তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এইখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তবে কি ইহাতে মানসিক শক্তির বৃদ্ধি হয় না? নিশ্চয়ই হয়। কুস্তীওয়ালারা কেবল মাংসপেশীর শক্তির উপর নির্ভর করে না, দাঁও পেঁচের উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে। এইরূপে এই সকল সমাজ জড়বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কি প্রণালীতে সমাজের মাংসপেশীজনিত শক্তিটা অপর সমাজের উপর প্রবলতরভাবে প্রযুক্ত হইবে, এই চিন্তা হইতেই এই সকল সমাজে জড়-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। লাঠীখেলা ও তলোওয়ার খেলার প্যাঁচ এবং কুস্তী খেলার প্যাঁচও এইরূপে প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয়োদ্দেশ্যে

উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাই সাংগ্রামিক যোগ্যতা বা শারীরিক ও মানসিক শক্তির ক্রমোন্নতি।

দ্বিতীয় যোগ্যতা স্বধর্ম্মপালনমূলক। স্বধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-কীর্ত্তনে বুঝাইব। স্বধর্ম্মমূলক যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্ব্ব কর্ম্মে বিষ্ণুপ্রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। শাস্ত্রকার বলেন যে, ইহাই প্রকৃতির নির্দ্দেশ। দেখ, আমাদের হস্তপদ মনের নির্দ্দেশে ক্রিয়া করে এবং মন প্রকৃতির নির্দ্দেশে ক্রিয়া করে। এই প্রকৃতি উৎকৃষ্টা ও নিকৃষ্টা হিসাবে দুই প্রকার। এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইবে যে, সর্ব্ব কর্ম্মে বিষ্ণুপ্রীতি-কামনামূলক যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম উৎকৃষ্টা প্রকৃতির ক্রিয়া এবং জীবনসংগ্রাম নিকৃষ্টা প্রকৃতির ক্রিয়া। এই অর্থে স্বধর্ম্মপালন শব্দ দ্বারা উৎকৃষ্টা প্রকৃতির নির্দ্দেশপ্রসূত সমাজের অঙ্গাঙ্গিক সম্বন্ধমূলক জীবনযাত্রাকে বুঝায়। এই বিশিষ্ট জীবনযাত্রা-দ্বারা প্রাচীন ভারত এই সমাজকে একটী জীবদেহে পরিণত করিয়াছিলেন। এই পরিণতি ঈশ্বরনিষ্ঠামূলে হইয়াছিল। ঈশ্বরনিষ্ঠা যজ্ঞার্থ-কর্ম্মমূলক এবং যজ্ঞ উৎকৃষ্টা প্রকৃতির জাগরণাত্মক। এইজন্য যজ্ঞের দ্বারা উৎকৃষ্টা প্রকৃতির জাগরণ হইত। এই প্রকৃতি হইতেই সত্যাদি ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া জাতিভেদ হইয়াছিল। তারপর এই সকল ধর্ম্মমূলে জাতিগুলি হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ক্রিয়া করিত এবং তাহাতেই মন ও মাংসপেশী উভয়েরই বলবৃদ্ধি হইত। তবে এই প্রণালীর মন ও মাংসপেক্ষীর বলের সহিত পাশ্চাত্য প্রণালীর মন ও মাংসপেশীর বলের তফাৎ এই যে, পাশ্চাত্য প্রণালীতে যে বল হয়, তাহাতে প্রত্যেকটী সমাজ অপর সমস্ত সমাজের সহিত শত্রুভাবাপন্ন হয়। পক্ষান্তরে, আমাদের প্রণালীতে সমাজের যে বল হয়, তাহাতে এই সমাজ পৃথিবীর সমস্ত সমাজের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হইয়া তাহাতে চরিত্র ও সততার

স্থাপন করে। এই মৈত্রীমূলক চরিত্রের বলেই ভারতবর্ষে চিরকাল অসংখ্য জাতির অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও, বর্ণাশ্রমী ইহাতে শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আবার এই মৈত্রীমূলক চরিত্রের বলেই প্রাচীন বর্ণাশ্রমী সমস্ত জগতের শ্রদ্ধাকর্ষণ পূর্ব্বক বাহুবলে পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জগতে শান্তিরক্ষার মূল চরিত্রের বল ও বাহুবলের সমন্বয়। চরিত্রবলে শত্রুরও শ্রদ্ধাকর্ষণ হয় এবং বাহুবলে স্বাভাবিক দুষ্টের নিগ্রহ হইয়া বিঘ্ন নিরাকৃত হয়। পক্ষান্তরে, চরিত্রবল না থাকিলে, কেবল মানসিক ও শারীরিক শক্তির প্রভাবে এই জগতে ভয়ের রাজ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জগতে শান্তিরক্ষার দুইটী উপায় আছে ঃ—

(১) প্রথমতঃ, ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা প্রতিবাদ স্তম্ভিত করিয়া শান্তিরক্ষা।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, চরিত্র ও বাহুবলের সমন্বয় দ্বারা সকলের শ্রদ্ধাকর্ষণ পূর্ব্বক শান্তিরক্ষা।

এই জগতে যাহারা সাংগ্রামিক যোগ্যতা লাভ করেন, তাঁহারা প্রথমোক্ত উপায়েই শান্তিরক্ষার চেষ্টা করেন। আবহমানকাল যাবৎ পাশ্চাত্য জগৎ এইরূপ যোগ্যতামূলক শান্তিরক্ষার পক্ষপাতী। আমাদের দেশেও বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর যোগ্যতার পক্ষপাত-মূলেই জাতীয়তা- (Nationhood) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। বস্তুতঃ, জাতীয়তা বলিতে মাংসপেশীর বলবর্দ্ধনকারক একতাকে বুঝায়। এই একতাতে বুদ্ধিবল ও বাহুবলের সমন্বয় হয়। কিন্তু চরিত্র ইহাতে অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে, চরিত্র দ্বারাও আর এক প্রকার একতা জন্মে, যাহা একে অন্যের সৎকর্ম্মের উৎসাহ দিয়া সমগ্র মানব জাতিকে সুখী করে। এই একতাই এই দেশে ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই ভারতবর্ষ

একটী মহাদেশ বলিয়া ইহার শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে ইহাতে জাতীয়তার পরিবর্ত্তে বর্ণাশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছিল। যদি এই দেশে বর্ণাশ্রম গড়িয়া না উঠিত, তাহা হইলে এই জগতে মানবজাতির পরস্পর শান্তিতে বাস করার কোনও পন্থাই আবিষ্কৃত হইত না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সমগ্র জগতের পরস্পর মৈত্রীর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল বলিয়াই হিন্দু আজও জগতে জীবিত রহিয়াছে। অন্যথা প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলনিয়া প্রভৃতি দেশের উন্নত জাতিগুলির ন্যায় সে জগতের গাত্র হইতে লুপ্ত হইত। আজ যে হিন্দু তাহার মুসলমান প্রতিবাসীর সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া জীবিত আছে, তাহা কোনও রাজশাসনের গুণে নহে—হিন্দুর চরিত্রের গুণে। এই চরিত্রে বাহুবল চরিত্রের রক্ষক হইলেও, বাহুবল-লাভই চরম উদ্দেশ্য নহে। পৃথিবীতে এমন মাংসপেশীর শক্তিবিশিষ্ট সমাজ দেখা যায় নাই, যাহা চিরকাল যুদ্ধ করিয়া জগতের গাত্রে রহিয়াছে। আমরা চিরকাল আমাদের চরিত্রবলে তিষ্ঠাইয়া রহিয়াছি। সে দিন হিন্দুর উপর মুসলমান যে ধাক্কা দিয়াছেন, তাহাই সহ্য করার শক্তি অপর কোন সমাজের হইত না। এই অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে, কেবল শারীরিক ও মানসিক শক্তির উপর একটা সমাজের স্থায়িত্ব নির্ভর করে না। ইহাকে জীবিত রাখিতে হইলে, ইহার চরিত্রবলও আবশ্যক। অন্যথা স্বাভাবিক শত্রু হইয়াও রাজপুত জাতি মুসলমানের এত বিশ্বাসের পাত্র হইতেন না; এবং আজও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার হিন্দু কর্ম্মচারিগণের উপর এত নির্ভর করিতেন না।

বস্তুতঃ, হিন্দুজাতির বিশ্বাসাকর্ষণশক্তি আজও হিন্দু-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। হিন্দুচরিত্র মাতৃস্তন্যের দুগ্ধের ন্যায় অপরকে পোষণ করে। এইজন্য মুসলমান ও ইংরাজ আমাদের বিরোধী হইয়াও আমাদিগকে বিশ্বাস করেন। এই চরিত্র ত্যাগ করিয়া যে মুহূর্ত্তে তুমি জাতীয়তার

মতলব আঁটিয়া মুসলমানের সহিত মিলিতে যাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার স্বাতন্ত্র্যের অভিমান জাগ্রত হইবে। বস্তুতঃ, ইহাই আজ হইয়াছে।

জীবনসংগ্রামের তত্ত্ব এই যে, ইহা সেই সমাজেরই মাংসপেশীর বলবৃদ্ধি করে, যে সমাজ একই আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং সর্ব্ব বিষয়ে একই ক্ষেত্রে মিলিত। কিন্তু ভারতের ন্যায় মহাদেশে এই জাতীয়তা-নির্ম্মাণ ও আকাশে অট্টালিকা-নির্ম্মাণ একই কথা। এই বিষয়ে তুমি যতই চেষ্টা করিবে, ততই এই দেশে বিচ্ছেদের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। মাংসপেশীর বলবৃদ্ধি করিতে হইলে, সমাজের সমগ্র জীবন এমন ভাবে এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া আবশ্যক যে, ইহার আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইলেও, যেন ইহার প্রত্যেক অঙ্গ একযোগে ঐ পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিতে পারে। পাশ্চাত্য সমাজগুলি একযোগেই পরিবর্ত্তিত আদর্শ গ্রহণ করে। কিন্তু এই দেশের এই অবস্থা নাই। সমগ্র দেশ একযোগে কখনও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই এবং বৌদ্ধবিপ্লবকালেও সমগ্র দেশ একযোগে বৌদ্ধ মত গ্রহণ করে নাই। তারপর, হিন্দু তাহার চরিত্র-বলেই বৌদ্ধমতকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। এমন কি, এই চরিত্র তাহার মাধুর্য্যবলে মুসলমানকে পর্য্যন্ত বাধ্য রাখিয়াছে। আবার সমগ্র জগৎ ভিন্ন পথে চলা সত্ত্বেও, বর্ণাশ্রমী তাহার জীবনযাত্রার বিশিষ্ট প্রণালী লইয়া জগতের ঐকতান বাদন রক্ষা করিয়াছে। বর্ণাশ্রমীর চরিত্র-মাধুর্য্য ও তাহার জীবনসমস্যার সমাধানপ্রণালীজনিত আচাররাশি ইহার মূল। এই আচারজনিত চরিত্রমাধুর্য্য দৃষ্টান্ত দ্বারা অপরের চণ্ডভাব প্রশমিত করে বলিয়া জগতের শান্তিরক্ষার নিমিত্ত ইহা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন-হেতু অসংখ্য চরিত্রবৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতে ও জগতে ইহা নিত্য বস্তু। এই চরিত্র নষ্ট হইলে ভারতের যেমন রক্ষা নাই, জগতেরও তেমন রক্ষা নাই। এইজন্য ভারতে ইহা

রক্ষা করার জন্য শ্রীভগবান ইহার অভিভাবক থাকিয়া পরিবর্ত্তিত কোনও আদর্শ এই দেশে টিকিতে দেন নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, তোমার জাতীয়তার আদর্শ এই দেশে টিকিবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, তুমি যখন জাতিনির্ম্মাণের জন্য মুসলমানকে নিমন্ত্রণ কর, তখন সে দোকানদারের নিকট স্বার্থের কেনাবেচার জন্য আসে। সে মূর্খ নহে, বেকুবও নহে। তোমার মনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বুদ্ধি সে বুঝিতে পারে। কাজেই রাজার মধ্যস্থতা তোমার ও তাহার মধ্যে শান্তিরক্ষা করে। ফলে, যেখানে তোমার ও তাহার মধ্যে মিত্রতা একটা প্রাকৃতিক মমত্ববুদ্ধির ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া স্বাধীন ও স্বেচ্ছামূলক ছিল, সেইখানে সেই মিত্রতা একটা রাজশক্তির মধ্যস্থতামূলক হইয়া উভয়ের দাসত্ব-শৃঙ্খল দৃঢ়ীকৃত করিতেছে।

অতএব জগতের অনন্ত মতভেদের ভিতরে যে চরিত্র প্রত্যক্ষভাবে শান্তিরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি এক সাংগ্রামিক চরিত্রকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক নিজের ও অপরের দাসত্বের মাত্রা-বৃদ্ধি করিতেছ। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, জগতের শান্তিরক্ষার জন্য বাহুবলের আবশ্যকতা উপেক্ষার বস্তু নহে। কিন্তু আমাদের চিন্তা করিতে হইবে যে, এই দেশে বাহুবল অগ্রে সঞ্চিত হইবে কি চরিত্রবল অগ্রে সঞ্চিত হইবে। জগতের যে সকল দেশে সাংগ্রামিক চরিত্রই চরিত্র, সেই সকল দেশে শান্তিরক্ষার জন্য বাহুবল ও চরিত্রবল এক বস্তু। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন আন্দোলন ও মন্দিরপ্রবেশ আন্দোলন গ্রহণ কর। এই সকল আন্দোলন যিনি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তিনি এই দেশের সাংগ্রামিক চরিত্রের মনুষ্যগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। আবার তিনিই দেশে অশান্তিও সৃষ্টি করিয়াছেন। কেন না, তিনি পরের শোধন-কার্য্যে ব্যস্ত। এই কার্য্যে ব্যস্ততাই সাংগ্রামিক চরিত্রের লক্ষণ।

ইহাতে লোভ দেখাইয়া মানুষ মানুষের গুরু হওয়ার চেষ্টা করে। তারপর বাধা পাইলে, যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে মনুষ্যরূপী পশুকে সর্ব্বদাই যূপকাষ্ঠে ফেলিয়া বলি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। সমাজের সাময়িক নেতা কর্ত্তৃক প্রেরিত নীতি এই পশুবলির মন্ত্র। এই বলি উপলক্ষে পাশ্চাত্য জগতে আমাদের দুর্গোৎসবের মহিষ-বলির একটা অভিনয় হইয়া এই পরশোধন-যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া থাকে। যদি এই দেশের রাজশক্তি দেশের নেতৃবৃন্দের হস্তে থাকিত, তাহা হইলে এই দেশেও এই আন্দোলন উপলক্ষে সনাতনী-রূপ পশুবলির চেষ্টা হইত। সৌভাগ্যক্রমে, তাহা হইতে পারে নাই। কারণ, রাজশক্তি অপরের হস্তে। এইজন্য আমাদের বাহুবল নিষ্প্রয়োজন। তারপর, যেখানে চরিত্রই শক্তি, সেইখানে বাহুবল চরিত্রের অনুবন্ধী।

ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, নিরবচ্ছিন্ন শারীরিক ও মানসিক বলের উপর নির্ভর করিয়া কোনও জাতিই অদ্য পর্য্যন্ত এই জগতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। প্রত্যেক পাশ্চাত্য জাতির মানসিক বল ও মাংসপেশীর বল আছে, কিন্তু নৈতিক বল নাই। প্রত্যেক জাতিই অপরের স্কন্ধে জোঁয়াল তুলিয়া দিতে চাহে। প্রত্যেকে অপরকে অধিকতর সভ্য করিয়া শোধন করিতে চাহে। ইহারই ফলে জাতিগুলি কিছুকাল ক্রমিক উন্নতি করিয়া অবশেষে জগতের গাত্র হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, হিন্দু তাহার নৈতিক বলের কারণেই অদ্য পর্য্যন্ত জগতের গাত্র হইতে লুপ্ত হয় নাই। যে ব্যক্তি মাংসপেশীর বলবৃদ্ধির জন্য অনবরত যুদ্ধ করিয়া বেড়ায়, সে সাময়িক বলে অপরের প্রতিবাদ স্তম্ভিত করিলেও, এই প্রতিবাদ-স্তম্ভন কার্য্য মানুষের বিবেকের যে জ্বালা উপস্থিত করে, তাহাই পরিণামে বিপ্লব উপস্থিত করে। এইজন্য চরিত্রই আমাদের অগ্রে প্রয়োজন। পাশ্চাত্য-জাতিগুলি এক একটা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ আছে। এই গণ্ডীর ভিতরে ইহারা একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একই লক্ষ্যে চলে। আবার আদর্শের পরিবর্ত্তন হইলে, সকলে একযোগে ঐ পরিবর্ত্তিত আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে। এই কারণে ইহারা অন্তর্ব্বিপ্লব সহ্য করিতে পারে। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের পরিণামে ধ্বংস হওয়ার কারণ লুপ্ত হয় না। এই কারণে কিছুকাল অন্তর্ব্বিপ্লব সহ্য করিয়াও, প্রাচীন গ্রীস ও রোম গিয়াছে। এক্ষণে বর্ত্তমান ইউরোপীয়-জাতিগুলি এই রূপেই যে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে, তাহাও একরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় আমরা যদি ইহাদের অনুকরণে চলি, তাহা হইলে আমাদের ধ্বংস হইতেও বিলম্ব হইবে না। কারণ, এই জাতীয়তা-নীতিতে দেশে জাতীয়তার স্বভাবজাত যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হইবে, তাহাই হিন্দু-জাতির ধ্বংস হওয়ার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে।

তাই বলিতেছিলাম।—হিন্দু! এই পাপপথে যাইও না। পিতৃ-পিতামহ-প্রদর্শিত নৈতিক শক্তির পথে যাও। পাপ-জাতীয়তা তোমার ভিতরে পরশোধনাত্মক বুদ্ধিমূলে সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি করিবে। যতই তুমি রাজশক্তিকে শোধন করিতে যাঁইয়া অকৃতকার্য্য হইবে, ততই তোমার একতাজনিত মাংসপেশীর শক্তি-বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা অনুভূত হইবে। ফলে, এক এক জন নেতা দাঁড়াইয়া আজ মুসলমানের শোধন, কাল হিন্দুর শোধন এবং পরশ্ব অস্পৃশ্যজাতির শোধন উপলক্ষে মানুষের যে জ্বালা উপস্থিত করিবে, তাহাতে সকলের মাংসপেশীর চাপে তোমার অস্তিত্ব থাকিবে না। পাশ্চাত্য-জগতে সাম্প্রদায়িক ভেদ-মূলে একের মাংসপেশীর চাপ অপরের উপর পতিত হইয়া বিপ্লব হয়। তারপর, পরিবর্ত্তিত আদর্শ সকলকে রক্ষা করে। কিন্তু তোমাকে রক্ষা করিবে কে? তোমার দেশের সকলে যদি একযোগে

জাতীয়তা গ্রহণ করিত, তাহা হইলে অনেক পূর্ব্বেই ইংরাজ তোমাকে অন্ততঃ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতেন।

অতএব যেখানে সমগ্র দেশের জীবনমরণ ও শান্তি একটা বস্তুর উপর নির্ভর করে, সেইখানে ঐ বস্তুটাই ঐ দেশের প্রয়োজন। এই অর্থে যে চরিত্র পরাধীন অবস্থায়ও দেশের শান্তিরক্ষা করিয়াছে, সেই চরিত্রই এই দেশের জন্য আবশ্যকীয়। এই আবশ্যকতা আবার প্রমাণ করিয়া দেয় যে, এই দেশের একটা বিশিষ্ট ইতিহাস আছে; সেই ঐতিহাসিক চরিত্রই দেশের শান্তিরক্ষা করিয়াছে, অন্য চরিত্র নহে। সকলেই জানেন যে, মুসলমান-রাজত্বে এই চরিত্র মৌলিক বর্ণাশ্রমী-চরিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে হীন হইয়া পড়িয়াছে। এই হীন চরিত্র লইয়া পরাধীনতার ভিতরেও যখন দেশের শান্তি আমাদেরই অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষ-দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে, তখন স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, এই চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ অবস্থা আসিলে দেশের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আসিবে। ইহারই নাম যোগ্যতা। গভর্ণমেণ্ট পুনঃপুনঃ আমাদিগকে যোগ্য হইতে বলিতেছেন এবং তন্মূলে আমরা কংগ্রেস-গঠন দ্বারা পাশ্চাত্য-জীবনসংগ্রামমূলক যোগ্যতার পথে চলিয়াছি। কিন্তু এই যোগ্যতা যে এই দেশের উপযোগী নহে, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। অতএব দেশের ইতিহাস যে যোগ্যতার পথ দেখায়, সেই যোগ্যতার পথে চলাই আমাদের কর্ত্তব্য। আজকাল একশ্রেণীর লোকের মত এই যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুকূলে যত যুক্তিই থাকুক না কেন, ইহা কালোপযোগী নহে; বিশেষতঃ, বর্ত্তমান সময়ে আচার-পালন অসম্ভব। লুপ্ত বস্তুর পুনরুদ্ধার চলে না। কিন্তু এই কথা ভুল। যদিও সহসা এই ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তথাপি ইহা নষ্ট হয় নাই। নষ্ট হইলে, গ্রন্থকারের এই ধর্ম্মের প্রতি আস্থা জন্মিয়া এই গ্রন্থ লিখিবার প্রবৃত্তি হইত না এবং দেশে পূজা-অর্চ্চনা,

যাগ-যজ্ঞ থাকিত না। দেশে গ্রন্থকারের ন্যায় আস্থাবান্ মনুষ্যও অনেক আছেন এবং তাঁহারা পূজা-অর্চ্চনাও করিতেছেন। কাজেই কঠিন অবস্থায় শয্যাগত রোগীর ন্যায় বর্ণাশ্রম এখনও জীবিত। ইহার পালন অসম্ভব নহে এবং ইহা নিষ্প্রয়োজনও নহে। বর্ণাশ্রম জাগ্রত করা স্থূলদৃষ্টিতে অসম্ভব হইলেও, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অসম্ভব নহে। আবার বর্ণাশ্রম জাগ্রত করিতে হইলে, ইহার আলোচনারও প্রয়োজন আছে। বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি একে অন্যের সভ্যতা হইতে উন্নতি-তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া বড় হয়। বর্ত্তমান কালেও জাপান এই পথে বড় হইয়াছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে এই পথ উন্মুক্ত নাই। প্রচুর রণসম্ভার সংগ্রহ ব্যতীত বহু কথার পথে বড় হওয়ার উপায় নাই। কিন্তু তাহা আমরা পারি কি? আবার জাপান যেমন পাশ্চাত্য আচার গ্রহণ করিয়াছে, বর্ণ-হিন্দু তাহা তেমন পারিতেছে না। তাহার মধ্যে একজনের রুচি-প্রবৃত্তি এই দিকে গেলে, অপর জনের রুচি-প্রবৃত্তি এই দিকে যায় না। আবার যাঁহার রুচি-প্রবৃত্তি এই দিকে যায়, তাঁহাকেও পুনরায় আচারের পথে ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। ইহার কি কোনও কারণ নাই? বস্তুতঃ, ইহার কারণ এই যে, বর্ণহিন্দুর শিরাধমনীতে যে রক্ত-প্রবাহ আছে, তাহার গতি বহুকথার দিকে নহে। এই জন্য বলপূর্ব্বক যিনি ইহার গতি ফিরাইতে চান, তিনিও হোঁচট খাইয়া পড়েন। হয়ত নিজের মনের গতি ফিরিয়া যায়, আর না হয় সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তিনি জীবন-পাত করেন। সর্ব্বোপরি, রাজশক্তির সহিত সংঘর্ষণ হইয়া বর্ত্তমানে আমাদের বহুকথা-মূলক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। কংগ্রেস এখন শ্রোতৃহীন আসরেই গান গাহিতেছে।

সুতরাং প্রাচীন পথই আমাদের পথ। এই পথে যে চরিত্রজনিত যোগ্যতা আছে, তাহা লাভ করিতে পারিলেই আমাদের স্বাধীনতা

আসিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার পথ হইবে। আমাদের পৃথক্ অস্তিত্ব ও বিশিষ্টচরিত্রই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গত ইতিহাস ও শাস্ত্রগ্রন্থ-গুলির সত্যতা প্রমাণ করিয়া দেয়। আমাদের যখন অন্য পথ নাই, তখন শাস্ত্রাবলম্বনেই আমাদের কার্য্য করিতে হইবে। ইহাতে রাজশক্তির সহিত অথবা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর সহিত আমাদের বিরোধের সম্ভাবনা নাই। চরিত্রঘটিত যোগ্যতা জীবনসংগ্রাম চাহে না। ইহা চাহে চিত্তশুদ্ধি। এই পথে আমাদিগকে চলিতে দিতে রাজশক্তির কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না।

সপ্তম অধ্যায়

লঘুগুরুজ্ঞান ও সাম্যবাদ

দাসমনোবৃত্তি স্বধর্ম্ম

এত কথার পরও নব্যতন্ত্রী আপত্তি করিবেন যে, হিন্দুর যে চরিত্রের গৌরব গ্রন্থকার করিতেছেন, তাহা দেশকে পরাধীনতার হাত হইতে রক্ষা করিল কৈ? তবে কি আমরা মুন্সী নবকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় চলিয়া চিরকাল দাস থাকিতে বাধ্য? স্বীকার করি হিন্দু তাহার চরিত্রের বলে দেশে শান্তিরক্ষা করিয়াছে, স্বীকার করি, এই চরিত্র সকলের শ্রদ্ধাকর্ষণ করে। কিন্তু ইহাতে তাহার কি লাভ হইল? বরং অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, বর্ত্তমান হিন্দুচরিত্রে যে দাসমনোবৃত্তি আছে, তাহাই দেশে শান্তিরক্ষা করিয়াছে। অথবা তাহার ধর্ম্ম যদি এই দেশের শান্তিরক্ষা করিত, তাহা হইলে এই ধর্ম্ম সকলের উপর আধিপত্য করিতে পারে না কেন? বরং ইহাতেই মনে হয় যে, হিন্দুর ধর্ম্মই তাহার পরাধীনতার কারণ। ইহা জাতিভেদ-মূলে ভেদের উৎপত্তি করিয়া একটা দাসমনোবৃত্তির সৃষ্টি করে এবং এই মনোবৃত্তির ফলে হিন্দু পরের অধীনতায় শান্তিতে বাস করিতে সক্ষম হয়। এই শান্তি আমরা চাই না, ইহাতে উন্নতি কোথায়? এই যুক্তিমূলেই আজকাল শাস্ত্রীয় আচার পরিত্যক্ত হইতেছে এবং এই যুক্তিমূলেই নব্যতন্ত্রী প্রাচীনতন্ত্রীকে নীরব করিয়া নিজের ইচ্ছানুরূপ সমাজকে পরিচালিত করিতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা সরকারী চাকুরী করিয়া সরকারের নিকট সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা কি স্বধর্ম্মপালন করিয়া গিয়াছেন? কখনই নহে।

হেষ্টিংস্ যখন চৈৎসিংহের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, তিনি যখন ন্যায়ান্যায়-বোধশূন্য হইয়া অযোধ্যার বেগমদিগের ধনাপহরণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সেবা করিয়া বাঙ্গালীর কোন্ ধর্ম্ম হইয়াছিল? তারপর রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া যখন রাজসেবা করিয়াছিলেন, তখন কি তাঁহার স্বধর্ম্মপালন হইয়াছিল? বস্তুতঃ, এই সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই লোভমূলে স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া হিন্দু চাকুরীতে প্রবেশ করিতে-ছিল। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে এই সময়ে বাঙ্গালী স্বধর্ম্ম, পরিত্যাগ করিয়া সার্ব্বজনীনভাবে দাসমনোবৃত্তির দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। তবে তাহার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, স্বধর্ম্মপালনের সংস্কার-মূলে সে মুনিবের নিকট বিশ্বাস রক্ষা করিত। জগতের অন্য কোনও জাতির এই বিশ্বস্ততা ছিল না এবং নাই। এই বিশ্বস্ততাই তাহার ধর্ম্মজীবনের শেষ চিহ্ন। সে স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়াছিল বলিয়াই চাকুরীগত প্রাণ হইয়াছিল এবং প্রতিক্ষেত্রে চাকুরী যাওয়ার ভয়ে ভীত ছিল। এই ভীতি হইতে তাহার দাসমনোবৃত্তির উৎপত্তি হইয়াছিল। দাসমনোবৃত্তির মৌলিক তত্ত্ব বিবেকের বিক্রয়। ইহা ভীতি হইতে হইয়া থাকে। এই ভীতি হেতু রাজনীতিতে দুর্নীতি প্রবেশ করিলেও দাস ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় না। কিন্তু শূদ্রও যখন স্বধর্ম্মপালন জন্য সেবাকার্য্যে ব্রতী হয়, তখন প্রভুর নিকট তাহাকে বিবেক বিক্রয় করিতে হয় না। শূদ্রের সেবা-ব্রতের উদ্দেশ্য তাহার চরিত্রশোধন। বিবেক বিক্রয়ে তাহা হয় না। এই কারণে স্বধর্ম্মপালনক্ষেত্রে শূদ্র যখন শাস্ত্রানুসারে প্রভুর আদেশের প্রতিবাদ করে, তখন সে প্রশংসিত হয়। পক্ষান্তরে চাকুরী-নীতিতে ইহা প্রভুদ্রোহ বলিয়া গণ্য হয়। যেদিন আমরা স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া চাকুরীনীতি গ্রহণ করিলাম, সেই দিনই আমরা আমাদের বিবেককে বিকাইয়া দিলাম। মুসলমান-রাজত্বেই ইহার প্রারম্ভ হইয়াছিল। এই

সময় হইতে আমরা বিবেককে ছোট করিয়া এবং বড় চাকুরীজনিত অর্থ ও আধিপত্যকে বড় করিয়া দেখিতে শিক্ষা করিয়াছি। অন্যথা মহারাজ মানসিংহের ন্যায় মহাবীরকে কখনও হলদীঘাটে প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে দেখা যাইত না। এই সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আমাদের ছোট বড় সকলেই বিবেক অপেক্ষা স্বার্থকে, ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্যক্তিগত লাভালাভকে এবং আচার অপেক্ষা সুবিধাকে বড় করিয়া দেখিতেছেন। আজ যদিও নব্যতন্ত্রী দেশের পরাধীনতার কথা বলিয়া চক্ষের জল নিক্ষেপ করেন, তথাপি তিনি বিবেককে বড় করিয়া দেখেন, এমন বলা যায় না। একটা স্বার্থলাভ ব্যতীত তাঁহার অন্য লক্ষ্য নাই। আবার স্বার্থই বিবেককে খর্ব্ব করিয়া দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, নব্যতন্ত্রীর একদল যদিও পূর্ণস্বরাজকামী, তথাপি এই স্বরাজের স্বরূপ নির্ণয় তাঁহারা করিতে পারিতেছেন না। তবে মোটামুটীভাবে ইংরাজের সংস্রব ত্যাগ করিয়া দেশবাসীর মতানুসারে দেশকে পরিচালিত করাই তাঁহারা পূর্ণ স্বরাজ মনে করেন। এইরূপ তত্ত্বের দোষ এই যে, দেশবাসী যদি Spainএর দৃষ্টান্তে একে অন্যের কণ্ঠচ্ছেদন করে, তাহা হইলেও তাহা দোষের বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ফলে বিজিত ব্যক্তি বিজেতার দাস হইতে বাধ্য হইবে। ইহাই স্বার্থবুদ্ধিজনিত বিবেকের আত্মবিক্রয়। আবার দেখ, অবশিষ্ট নব্যতন্ত্রী সকলেই ইংরাজের সংস্রব ও সম্পর্ক অত্যাবশ্যকীয় মনে করেন। ইহাতেই ইংরাজ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ভাই! স্বীকার করিলাম, তোমরা আমাদের সাহায্যে এই দেশে একটী জাতীয় রাজ্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা কর। বস্তুতঃ, আমরা এই বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষিত করাকে আমাদের ব্রত মনে করি। কিন্তু এই ব্রত উদ্‌যাপন হইবে কি প্রকারে, তাহা বুঝি না। কথা এই যে, তোমাদের সম্প্রদায়গুলিকে একমতাবলম্বী করিয়া

একটা জাতিনির্ম্মাণের প্রণালী আমরা বুঝিতেছি না। সুতরাং সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে জনসংখ্যার অনুপাতে ভাগবাটোয়ারা করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। নব্যতন্ত্রীও এই বিষয়ে কোনও উৎকৃষ্টতর সমাধান করিয়া দিতে পারিতেছেন না। ফলে সমগ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থঘটিত আন্দোলন এখন একটা চাকুরী বাটোয়ারার আন্দোলনে পরিণত হইয়া দেশের রাজনীতি চাকুরীর রাজনীতিতে পরিণত হইয়াছে। পূর্ণ স্বরাজ আসিলেও তাহাই হইবে।

এইরূপে নব্যতন্ত্রী প্রাচীনতন্ত্রীর দাসমনোবৃত্তি এড়াইতে যাইয়া এক অভিনব দাসমনোবৃত্তির দিকে ধাবিত হইতেছেন। প্রাচীন দাসমনোবৃত্তি শান্তিপরায়ণ ছিল। এখন ইহা এক উগ্র আকার ধারণ করিয়াছে। এই প্রভেদ লইয়াই তিনি আচার পরিত্যাগ করিতেছেন এবং গর্ব্ব করিতেছেন যে, তিনি প্রাচীনতন্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ, প্রভেদ কিছুই নাই। উভয়েই চাকুরীর কাঙ্গাল এবং উভয়েই চাকুরী-সর্ব্বস্ব। চাকুরীর জন্য মানসিংহ যেমন ক্ষাত্রধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, চাকুরীর জন্যই নব্য-তন্ত্রীও আচার পরিত্যাগ করিতেছেন। তবে প্রাচীনগণ মনে করিতেন যে, যতটুকু রাখিতে পারি রাখিব এবং নব্যগণ মনে করেন যে, রক্ষা অনাবশ্যক। এই মনোবৃত্তির একমাত্র কারণ রাজকীয় উচ্চপদ প্রাপ্তি ও রাজোৎসাহমূলে ওকালতী, ব্যারিষ্টারী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিপত্তির লোভ। এই লোভটা দেশের বৈজ্ঞানিক ভোগ্যদ্রব্যের লোভের দ্বারা আজকাল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তুমি রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে চল, কিন্তু বড় হইতে পারিলেই প্রথম শ্রেণীতে চলিবে। বড় হইলে একখানা কি ২।৪ খানা মোটর গাড়ী তোমার হইবে, বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিবে এবং বৈদ্যুতিক পাখাও ঘুরিবে। সময় মত বিলাত যাইতে পারিবে অথবা নিতান্ত পক্ষে শিলং, দার্জ্জিলিং,

মসূরীও ঘুরিতে পারিবে। এইরূপে নানালোভমূলে আমরা বড় চাকুরী চাই এবং রাজতুষ্টি দ্বারা ডাক্তারী ব্যারিষ্টারী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিপত্তি চাই। ফলে ব্যবসা, বাণিজ্যও আজকাল চাকুরীতে পরিণত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ রুষ্ট হইলে কোনও ক্ষেত্রেই প্রতিপত্তি আসে না। আবার এই অর্থ-প্রতিপত্তির লোভমূলেই রাজনীতিতে যদি কোনও দুর্নীতি থাকে, তবে আমরা ইহার কোনও প্রতিবাদ করিতে পারি না। প্রতি ক্ষেত্রে বিবেককে বিক্রয় করিয়া নীরব থাকি। সুতরাং পরাধীনতা ও দাসত্ব যে আমাদের অপ্রিয়, তাহা আদৌ বুঝা যায় না। কেবল আমরা যাহা চাই, তাহা পাই না বলিয়াই ক্ষুণ্ণ। চাই ধন, চাই মান, চাই প্রতিপত্তি। এই কয়টী থাকিলে ইংরাজ রাজত্বই হউক আর ইটালীয় রাজত্বই হউক, কিছুতেই আমাদের আপত্তি নাই। এই অবস্থায় দেশের উন্নতি বা জাতীয় উন্নতির জন্য আমরা আচারত্যাগ করিতেছি বলিয়া যাঁহারা বলেন, তাঁহারা আত্ম-প্রবঞ্চক মাত্র। ধন-মান-প্রতিপত্তি ও অজস্র ভোগের জন্য আচার পরিত্যক্ত হইয়াছে ও হইতেছে। মদ্যপায়ী যেমন মদ্যের লোভে পিতৃমাতৃ স্নেহ পরিত্যাগ করে, বেশ্যাসক্ত যেমন বেশ্যার লোভে নিজের ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করে; আমরাও তেমনি ভোগের আকর্ষণে আচার পরিত্যাগ করিতেছি। কিন্তু মুখে দোহাই দেই স্বাধীনতার। ধর্ম্মত্যাগ করিলে যে স্বাধীনতা হয়, এমন কথাও আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু তথাপি স্বাধীনতার দোহাই দিয়া আমরা ভোগের দাসত্বে ডুবিতেছি। আমরা মনে করিতেছি, যে আচার গ্রহণ করিলে গত ৫০ বৎসর যাবৎ কংগ্রেসের যোগে আন্দোলন করিয়া আমরা যে সকল অধিকার লাভ করিয়াছি, তাহা পণ্ড হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে হিন্দু ডেপুটীগিরি ও মুন্সেফীতেই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইত, এখন সে লাটগিরি পাওয়ারও আশা করে।

পূর্ব্বে সে সাধারণ দোকানদারীতে সন্তুষ্ট ছিল, এখন সে আমদানী রপ্তানী ও বহির্ব্বাণিজ্যের আলোচনা করে এবং যৌথ ব্যবসা ফাঁদিয়া ইংরাজের সহিত প্রতিযোগিতার চেষ্টা করে। পূর্ব্বে সে ওকালতী ও ডাক্তারীতে সন্তুষ্ট ছিল, এখন ব্যারিষ্টার ও বিলাত-ফেরত ডাক্তার তাহার ঘরে ঘরে। আচার রক্ষা করিয়া I. C. S, I. P. S, I. M. S., কিম্বা I. E. S. হওয়া যায় না এবং আচার-রক্ষা করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করা যায় না। সুতরাং এই সকলের জন্যই আমরা আচার-ত্যাগ করিতেছি, জাতীয়তার জন্য নহে। অনেকে আশঙ্কা করেন যে, আচার গ্রহণ করিয়া যদি দেশ স্বাধীন হয়, তবে হয়ত রেল, টেলিগ্রাফ থাকিবে না। বিদেশে যাওয়ার জাহাজ থাকিবে না, এরোপ্লেনে উঠিয়া মানব-জীবনের সার্থকতা হইবে না।

এইরূপে ভোগের মাদকতায় আমরা আজ শান্তির পথ ছাড়িয়া অশান্তির পথে চলিয়াছি এবং ইংরাজকে অধিক ভোগ করিতে দেখিয়া হিংসায় মরিতেছি। বস্তুতঃ, আমাদের দেশাত্মবোধও হিংসামূলক। ইংরাজ কেন অধিক ভোগ করিবে, এই চিন্তায়ই আমরা আকুল। এই চিন্তা হেতু আমরা কেবল পূর্ব্বপুরুষের দোষ দেখি এবং তাঁহারা কেন আমাদের জন্য একটা ভোগের রাজত্ব রাখিয়া গেলেন না ইহা ভাবিয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখি। স্বীকার করি, মুসলমান ও ইংরাজের নিকট তাঁহাদের পরাজয়টা দোষের হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আচার রক্ষা করিয়া কি এই পরাজয় হইয়াছিল? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ম্লেচ্ছজাতি আমাদের অস্পৃশ্য। এই অস্পৃশ্যতা কেবল আহার-বিহার মূলক নহে। তাহার সহিত সন্ধি করিয়া তাহার সাহায্যে স্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকে পরাজয় করার চেষ্টাও আপত্তিজনক। কান্যকুব্জ-রাজ জয়চন্দ্র এই পথে গিয়াই আচার লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। এইরূপে

মুন্সী নবকৃষ্ণ বা দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ কোন আচার লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তাহাও দেখিয়াছি। কিন্তু আমরা এই সকল চিন্তা করি না। আমরা পাশ্চাত্য, সভ্যতাজনিত যে ভোগে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহা হইতে বঞ্চিত হইব বলিয়াই ভীত। এই ভীতি-মূলে আমরা যে স্বাধীনতা ভ্রমে পরাধীনতাকে বরণক্রমে, এই দেশের অনুপযোগী এক জীবননীতি গ্রহণ করিতেছি, তাহা আমরা বুঝি না।

এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইহাতে পরাধীনতা কোথায়? যদি এই দেশে জাতি নির্ম্মিত হইয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়, তবে কি তাহাকেও তুমি দাসত্ব বলিবে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, স্পেনে কি ভিন্ন দেশীয় গভর্ণমেণ্ট ছিল? তবে তথায় আজ মারাত্মক বিপ্লব কেন? ইহার কারণ এই যে, সাম্যবাদ ও লঘুগুরুজ্ঞানের সামঞ্জস্য ম্লেচ্ছদেশে নাই। তোমার দেশে জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত হইলেও, এই সামঞ্জস্য হইবে না। কথাটা এই দেশে এমন সুপরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে যে, ইহা আজ আর অস্বীকার করিতে পারিবে না। বাঙ্গালী ইংরাজী-শিক্ষিত কবিশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন :—

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন-মহিমা-ধ্বজা।

—'হেমচন্দ্র'

ইহাই সাম্যবাদ। জীবনসংগ্রামবুদ্ধি আপনাকে প্রত্যেকের তুল্য-জ্ঞানে নিজের মহিমা-ধ্বজা জগতে উত্তোলন করিতে চাহে। তাই জাতিভেদ ভুলিবার ইচ্ছা। ইহাতে মানুষ নিজের অহঙ্কারকে উচ্চশির করিয়া

পরমেশ্বরকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিতে শিক্ষিত হয়। তাই কবি পুনরায় লিখিয়াছেন :—

জপ-তপ আর যোগ-আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনা—
এ সকলে আর কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর রে পূজা।

বস্তুতঃ, অহঙ্কার উচ্চশির হইলে, এই অহঙ্কার জড়শক্তিকেই শক্তি মনে করে এবং তূণীর কৃপাণের পূজাকে বড় বলিয়া জ্ঞান করে। তখন মানুষ আকাশে উঠিতে চাহে এবং গ্রহ-নক্ষত্র ছিঁড়িতে চাহে। তাই কবি পুনরায় বলিতেছেন :—

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু-উল্কাপাত বজ্র-শিখা-ধরে
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।

জগতে যদি সংগ্রামিক বুদ্ধি থাকে, তবে ইহাই সংগ্রামিক বুদ্ধি। এই বুদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্য :—

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী-সহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতা-রূপ রতনে মণ্ডিতে
যে শিরে এখন পাদুকা বও।

এইখানে প্রতিদ্বন্দ্বীসহ সমকক্ষ হইলেই যেন স্বাধীনতা-রত্ন ঘরে আসে। এই বিশ্বাস লইয়াই কবি আমাদিগকে জ্বলন্ত ভাষায় জীবনসংগ্রামে দাঁড়াইতে বলিয়াছেন। কিন্তু এইখানে একটু কথা আছে। কথাটা

নব্যতন্ত্রী পছন্দ করুন আর না করুন, ইহা একটী অপ্রিয় সত্য। রাজ-শক্তিকে সম্মান করিলেই কিছু তাহার পাদুকা শিরে ধারণ করা হয় না। এই শক্তি যখন কাণ ধরিয়া কাজ করায়, তখনই বস্তুতঃ শিরে পাদুকা-ধারণ হয়। এই কথা না বুঝিয়া অবিবেক অনেক সময়ে অপরকে সম্মান করাকেই তাহার পাদুকা শিরে ধারণ করা হইল, মনে করে। কিন্তু আর এক বুদ্ধি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দের পাদুকা বহন করিতেন। ইহাতে তাঁহার কোনও অপমান-বোধ হইত না। পক্ষান্তরে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বুদ্ধিতে পিতার পাদুকা মস্তকে ধারণও অপমানের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ যখন প্রত্যেক মানুষকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করে, তখন কাহারও নিকট সে মস্তক নত করিতে চাহে না। কাজেই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বুদ্ধির মূল কোথায়? একটু চিন্তা করিলেই অনুভূতি হইবে যে, ইহার মূল মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ভিতরে রহিয়া গিয়াছে। যেখানে মানুষ "বায়ু-উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে"-স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়, সেইখানে তাহার মনে প্রশ্ন আসে যে, আমি অপর হইতে ছোট কি প্রকারে? কাজেই তখন তাহার মনে হয় যে, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধটা সাম্যবাদমূলক। বলা বাহুল্য যে, এই সাম্যবাদ-মূলেই মানুষ পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ দেখে এবং পিতা-মাতার সহিত তাহার বৈষম্য কোথায়, তাহাও সে অনুভব করে না। কিন্তু কাণ ধরিয়া নোয়াইয়া দিলে বাহুবলের নিকট নত হয়। ইহা কি স্বাধীনতা?

বস্তুতঃ, শিরে পাদুকা-ধারণটাকে যে ব্যক্তি অপমান বোধ করে, তাহার ভ্রান্তি এইখানে। পাদুকা একটী অচেতন পদার্থ। ইহাকে বহন করা যে কথা, মণিমাণিক্য বহন করাও সেই কথা। কেবল প্রশ্ন থাকে এই যে, কে ইহাকে পদে ধারণ করে? তারপর, গুরুজ্ঞানে পাদুকা-

ধারণ হয়। এই গুরুজ্ঞান দুই প্রকারে হয়ঃ—(১) মানুষ কিছু মাতৃগর্ভ হইতে পতিত হইয়াই "সিন্ধুনীরে" অথবা "ভূধর-শিখরে" যায় না। সে প্রথমতঃ পিতামাতার স্নেহে লালিত পালিত হইয়া তাঁহাদের স্নেহের কোলে থাকিয়াই জ্ঞানলাভ করে এবং সেই জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই যৌবনে কর্ম্ম করে। এই অবস্থায় যে ব্যক্তি একবার "ভূধরশিখরে" উঠিয়াই পিতামাতাকে নিজের তুল্যজ্ঞান করে, তাহার জ্ঞানের প্রতি সম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায় এবং নিজের অহঙ্কারকেই সে বড় করিয়া দেখে। ফলে সে প্রতি পদে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এবং এই চেষ্টার দরুণ সমগ্র জগতের সহিত তাহার একটী প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানবের প্রতি মানবের প্রীতি নষ্ট করিয়া দেয়। এই কারণে সর্ব্ব-মানবে মানবের প্রীতিরক্ষার মূল পিতৃমাতৃভক্তি। ইহা হইতেই তাহার গুরুজ্ঞান আরম্ভ। ইহার পর সে যতই জ্ঞানলাভ করুক না কেন, পিতৃমাতৃদত্ত-জ্ঞানই সর্ব্বজ্ঞানের ভিত্তি। এই অর্থে পিতামাতা সাক্ষাৎ দেবতা।

(২) দ্বিতীয়তঃ, মানুষ যে দেহ-ধারণ করে, তাহা পিতৃমাতৃদেহ হইতে আগত হয়। এইরূপে এক দেহ হইতে অপর দেহ আগত হইয়া জীবের স্বভাবজাত মমত্ববোধ জন্মে। তারপর এই দেহের পুষ্টির উপর মমত্ববোধ আরও দৃঢ়তর হয়। ঐ মমত্ববোধের স্বভাব এই যে, ইহা লঘুগুরুবোধের দ্বারা মমত্ববোধকে দ্বিধা বিভক্ত করে। পিতা মনে করে যে, পুত্র আমা অপেক্ষা লঘু এবং পুত্র মনে করে যে, পিতা আমা অপেক্ষা গুরু। স্বভাব ইহা করাইয়া দেয় বলিয়া এই লঘুগুরুজ্ঞানের আর দ্বিতীয় উৎস নাই। এই উৎসে স্বভাবজাত যে লঘুগুরুবোধ থাকে, তাহাতে যতই তুমি আঘাত করিবে, ততই মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধবোধ তোমার নষ্ট হইয়া যাইবে। শৈশব হইতেই লঘুগুরুবোধ লইয়া মানুষ বড় হয়। তারপর বড় হইলে, তাহার আত্মবোধ প্রবল হইয়া উঠে এবং

লোকের সহিত ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ করে। তখনই প্রশ্ন আসে যে, আমি বড় কি অপরে বড়? এইখানে পিতামাতার প্রতি গুরুজ্ঞান তাহার অহঙ্কার খর্ব্ব করে এবং মানবের সহিত তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে। পিতামাতার প্রতি গুরুজ্ঞান থাকিলেই জগতের অপর মনুষ্যের সহিত যে তাহার লঘুগুরুসম্বন্ধ আছে, সেই বোধ তাহার হয় এবং এই বোধ-মূলে অপরের সহিত তাহার প্রীতিপ্রদ ব্যবহার হয়।

অতএব লঘুগুরুজ্ঞানই মানবের সহিত মানবের সম্বন্ধের মূল। মানবের সহিত মানবের সাম্য-সম্বন্ধ স্বভাবজাত হইলেও, ইহা যৌবনের বলদর্পজনিত জ্ঞান। এই জ্ঞানের দরুণ মানবের সহিত মানবের সম্বন্ধ প্রীতিকর না হইয়া অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। এই কারণে মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ লঘুগুরু-বোধমূলক। এই বোধমূলে মানুষ যখন মানুষের পাদুকাধারণ করে, তখন সে স্বভাবের অনুসরণ করিয়া জ্ঞানের সম্মান করে এবং যে মমত্ববোধ তাহাকে রক্ষা করিয়াছে, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। জাতীয়তা যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগ্রত করিয়া পাদুকা-বহনে অপমান বোধ করায়, তখন মানুষের এমন একটি অভিমানিতা জন্মে যে, তাহাতে প্রীতির সম্বন্ধ অপ্রীতিকর হয় এবং প্রেমে বিচ্ছেদ আসিয়া সংসার রণক্ষেত্র হয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যখন ইংরাজকে রাজা বলিয়া রক্ষকের আসনে বসাইয়াছিলেন, তখন একটা গুরুজ্ঞানমূলে তাঁহারা ইংরাজকে সম্মান করিতেন। এই সম্মান এই দেশে সর্ব্বদাই রক্ষকের আসনের প্রতি লঘুগুরুজ্ঞানমূলে প্রদর্শিত হইয়াছে। যতক্ষণ এই জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ অপমানেরও কোনও কারণ থাকে না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বলদর্পমূলক সাম্যবাদ আসে, সেই মুহূর্ত্তেই এই গুরুজ্ঞান নষ্ট হইয়া রাজা ও রাজপুরুষের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে অপমানের কারণ হয়।

মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে গুরুজ্ঞানের প্রতিকূলে সর্ব্বপ্রধান আপত্তি এই যে, যদিও প্রত্যেক দেশের সমাজেই শিশু নিজকে ছোট মনে করে এবং পিতামাতাকে গুরুজ্ঞানে তাঁহাদের নিকট হইতে নিজের জ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন করিয়া লয়, তথাপি যৌবনে এই ভাব থাকিবার কোনই কারণ থাকে না। পরন্তু যৌবনে যদি একটা আত্মনির্ভরশীলতা না থাকে, তাহা হইলে মানুষ জীবনে আর পৌরুষ-প্রদর্শন করিতেই পারে না। বলা বাহুল্য যে, এই সকল যুক্তি-মূলেই পাশ্চাত্যজগতে মানুষ বড় হইলেই পৌরুষ-প্রদর্শনের জন্য একটা মনোবৃত্তি (Spirit of adventure) লইয়া আর পিতামাতার স্নেহনীড়ে প্রতিপালিত হইতে চাহে না। পক্ষান্তরে, আমাদের দেশে আজীবন মানুষ লঘুগুরুজ্ঞান লইয়া পিতামাতার সেবাকে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর মনে করে। এই কারণে আমাদের সমাজে লঘুগুরুজ্ঞানটা সমাজের ভিত্তি এবং পাশ্চত্যসমাজে এই জ্ঞানটা কেবল বালকেই সীমাবদ্ধ।

এই বিষয়ে পাশ্চাত্য সমাজের সর্ব্বপ্রধান যুক্তি এই যে, আমি যদি আজীবন নিজকে ছোট মনে করি, তাহা হইলে ছোটই থাকিয়া যাই এবং বড় হওয়ার আমার কোনই স্পৃহা থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অনেকে দেখাইয়া থাকেন যে, আমাদের সমাজে দুই পুরুষ পূর্ব্বে যুবকগণের পৌরুষ-প্রদর্শনের স্পৃহাই ছিল না এবং গতানুগতিক জীবন লইয়া জগতে চিহ্ন না রাখিয়াই মরিয়া যাইত।

বস্তুতঃ, এই লঘুগুরুজ্ঞান লইয়া মানুষের পৌরুষ-প্রদর্শন-স্পৃহা হইতে পারে কি না এবং এই দেশে এই স্পৃহা কত দূর ছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে বিবৃত হইবে। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে লঘুগুরুজ্ঞান ব্যতীত সমাজে কোনও শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। শৃঙ্খলার (Discipline) মূল লঘুগুরুজ্ঞান এবং বিশৃঙ্খলার মূল সাম্যবাদ।

এই সাম্যবাদ-মূলেই আজ আমরা ইংরাজকে সম্মান করিতে কার্পণ্য করিতেছি। এদিকে ইংরাজও দেখিতেছেন যে, এই কার্পণ্যবোধ না কমিলে এই দেশের আইন ও শৃঙ্খলা অসম্ভব। এই জন্যই এই দেশে দমননীতি অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু এই দমননীতি দেশে যে লঘুগুরু-জ্ঞানের উৎপত্তি করিয়াছে, তাহাও যে দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির পরিপন্থী, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য যে, লঘুগুরুজ্ঞান না থাকিলে, কোনও প্রকার শৃঙ্খলা থাকে না। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য যে, ভয়হেতু যেখানে গুরুজ্ঞান হয়, সেইখানে গুরুশিষ্য উভয়েরই নৈতিক অধোগতি হইয়া বলক্ষয় হয়। এদিকে পাশ্চাত্য জগৎ হইতে আমদানী করিয়া কংগ্রেস এই দেশে যে সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিলে মানুষ দুর্ব্বিনীত হইয়া পড়ে। ফলে, পাশ্চাত্য-জীবননীতি লঘুগুরুজ্ঞান ও সাম্যবাদের সামঞ্জস্যের জন্য বল-প্রয়োগে একটা দাসমনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া শান্তিরক্ষা করে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা অনিশ্চিত থাকে; বস্তুতঃ, এই অনিশ্চিত জীবননীতির ধোঁকায় পড়িয়াই আজ আমরা হাবুডুবু খাইতেছি।

প্রেরিত নীতি

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এরূপ হয় কেন? এক সময়ে Sir Alexander Mackenjie বাংলার ছোট লাট ছিলেন। তিনি একদিন বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন "We taught them the language and they have learnt to curse" অর্থাৎ "আমরা ভারতবাসীকে ভাষা শিক্ষা দিয়াছি এবং তাহারা গালাগালি দিতে শিখিয়াছে।" কথাটা অতিশয় কর্কশ হইলেও একেবারে মিথ্যা নয়। Shakespeare-এর Tempest নামক গ্রন্থে Prospero নামক জনৈক দেশত্যাগী রাজা Caliban

নামক এক নরাকৃতি পশুকে ভাষা-শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই ভাষা শিখিয়া Caliban Prospero-র সুন্দরী কন্যা Miranda-র উপর বলাৎকারের চেষ্টা করিল। তারপর Prospero যখন তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন, তখন Caliban নিরুপায় হইয়া Prosperoকে অনবরত গালাগালি দিত। Sir Alexander Mackenjie এই ব্যাপারের সহিত তুলনা করিয়াই ভারতবাসীকে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই উপমাটী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইংরাজজাতির দেশে যে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা প্রচলিত আছে, তাহাই বৃটনের সুন্দরী কন্যা Miranda. ভারতবাসী ইহা বলপূর্ব্বক লাভ করিতে চায় বলিয়াই তাহাদের সহিত Caliban-এর তুলনা হইয়াছে। এই কারণেই বলিয়াছি যে, কথাটা একেবারে মিথ্যা নহে। আমরা ইংলণ্ডদেশে প্রচলিত প্রজাতন্ত্র-শাসনের মোহে এমন মুগ্ধ হইয়াছি যে, বর্ত্তমানে তাহা না পাইয়া আমরা ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ ব্যতীত আর কিছুই করি না। এমন কি, সময় ও সুযোগ পাইলে তাহাদিগকে গালাগালি করি। এই গালাগালির মূল আমাদের দুর্ব্বিনীত স্বভাব। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে দুর্ব্বিনীত করিয়াছে। দুর্ব্বিনীত স্বভাবের প্রধান দোষ এই যে, ইহা বলবান্ দেখিলে নত হয় এবং দুর্ব্বলতা দেখিলে অত্যধিক বাড়িয়া উঠে। ইহাতে বাড়াবাড়ি যেমন চূড়ান্ত, দাস-মনোবৃত্তিও তেমন চূড়ান্ত। এই স্বভাবে ন্যায়ান্যায় বোধ থাকে না। এই কারণে ইংরাজী শিক্ষাদ্বারা আমাদের চরিত্রে একটা দুর্ব্বিনীত ভাব ও দাসস্বভাবের সংযোগ হইয়া, ইহাকে মনুষ্যত্বের অতি নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করিয়াছে। আমাদের ঋষিগণ বলেন যে, ইহা অশুদ্ধচিত্ত মনুষ্য-কর্ত্তৃক প্রেরিত নীতির ফল। মানুষ যখন নিজের জীবনের আদর্শ নির্ণয় করিতে পারে না এবং কখন এই আদর্শ আর কখন সেই

আদর্শ, এইরূপ নানা আদর্শের সন্ধানে ফিরিয়া, বহু কথার মোহে পতিত হয়, তখন বলবান্ যাহা করে তাহাই তাহার নিকট ভাল বলিয়া মনে হয়। ইহাই প্রেরিত নীতি। এই নীতির ফলে মানুষ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে এবং প্রত্যেকেই এক একটা নীতি প্রেরণ করিয়া সমাজকে তাহা গ্রহণ করাইতে চায়। তারপর সমাজ ইহা গ্রহণ করিলে, ইহা বলবানের নীতিতে পরিণত হয়। এইরূপে মানুষ বলবানের শিষ্য হয় বটে, কিন্তু এই শিষ্যত্বের ভিতরে একটী সাম্যবাদ থাকিয়া যায়। এই সাম্যবাদের মূল নীতি-প্রেরণের অধিকার। প্রত্যেকেই মনে করে যে, আমি যদি ভালরূপ পড়াশুনা করিয়া একটী নীতি প্রেরণ করিতে পারি, তাহা হইলে সমাজ তাহা গ্রহণ করিবে না কেন? এইরূপে মানুষ বলবানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও, এই সাম্যবাদমূলে আন্তরিক ভাবে বলবানের বিদ্রোহী থাকে। এই বিদ্রোহিতাই পরিণামে স্বেচ্ছাচার ও সামাজিক বিপ্লববাদে পরিণত হয়। পরিবারে এই বিপ্লববাদের আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ, পুত্র যদিও মনে করে যে, আমি পিতার কথা শুনিতে বাধ্য, তথাপি পিতার স্বেচ্ছাচার দেখিয়া তাঁহার মনে হয় যে, আমিও বড় হইলে যাহা ভাল বুঝিব তাহা করিব। ইহার নাম ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব প্রত্যেক যুবকের বিবাহিত জীবনে প্রকটিত হইয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য জন্মাইয়া দেয়। ইহাতে পুত্র মনে করে যে, পিতা যখন তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা ভাল বুঝিতেছেন তাহাই করিতেছেন, তখন আমিই বা আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা ভাল বুঝিব, তাহা করিব না কেন? এইরূপে শৈশবে যে পিতাপুত্রের লঘুগুরু জ্ঞান থাকে, তাহা লুপ্ত হইয়া একটা স্বেচ্ছাচারের সাম্যবাদ জন্মে। পক্ষান্তরে, শৈশবে পুত্রের মনে পিতার প্রতি যে গুরুজ্ঞান থাকে, তাহাতে সে বলবানের প্রাধান্য ব্যতীত অপর কিছুই দেখিতে পায় না। পিতা

তাহার অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ বলিয়াই যেন সে তাহাকে গুরুরূপে মান্য করিয়াছে, এইরূপ একটা অনুভূতি তাহার জন্মে। এই অনুভূতিই পরিশেষে সমাজে বলবানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে।

অশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যের অহঙ্কারই ইহার মূল। কোনও ব্যক্তিই নিজের চিত্তশুদ্ধি করে না, কেবল একটা নূতন নীতি প্রেরণ করিয়া সমাজকে আপনার অভিপ্রায়ানুসারে গড়াইতে চায়। ইহাতে সমাজ-সংস্কার ইহাদের মূলমন্ত্র হইয়া নিজের প্রেরিত নীতিমূলে ইহারা শিষ্যসংগ্রহে ব্যস্ত হয়। ইহাই ম্লেচ্ছদেশের লঘুগুরু-সম্বন্ধ ও সাম্যবাদ। সমগ্র সমাজে এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত থাকায়, ইহার প্রত্যেক ব্যক্তিই ধনবল ও জনবলের উপাসক হয়—কখনও নীতি বা ধর্ম্মবলের উপাসনা করে না।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহ এইরূপে এই শ্রেণীর প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনুষ্যগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, অপরাপরের ব্যক্তিত্বকে নির্য্যাতন করে। তার পর এই নির্য্যাতনের ফলে অপরের যে অসুবিধা হয়, তাহাতে নূতন প্রেরিত নীতির উৎপত্তি হইয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর নূতন গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পুনরায় সাম্যবাদমূলে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। গুরুশিষ্য-সম্বন্ধমূলক বলবানের উপাসনাই আমরা ইংরাজী শিক্ষার সহিত শিক্ষা করিয়াছি। ইহার দরুণ আমরা প্রকৃত পিতৃভক্তি ও রাজভক্তি জানি না। বস্তুতঃ, পিতৃভক্তি ও রাজভক্তি উভয়ই এমন এক সার্ব্বভৌম নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকা কর্ত্তব্য, যেন তাহাতে পিতাপুত্র ও রাজাপ্রজা উভয়ই পরস্পরকে মমতার চক্ষে দেখিতে পারে। প্রেরিত নীতিমূলক স্বেচ্ছাচার এই মমতা লুপ্ত করে বলিয়াই আমাদের শাস্ত্রকারগণ প্রেরিত নীতিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের দেশের চিরন্তন ধর্ম্মনীতিই ইহার প্রমাণ। এই ধর্ম্মনীতি কোথা হইতে কি

প্রকারে আসিল, তাহা পরে বুঝান যাইবে। এইখানে কেবল আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা Caliban-এর ন্যায় নরাকৃতি পশু নহি। আমরা এক প্রাচীন সভ্যতার অযোগ্য সন্তান। প্রাচীন সভ্যতার সন্তান বলিয়া প্রেরিত-নীতি আমরা ভালবাসি না। আবার এই সভ্যতার অযোগ্য সন্তান বলিয়া আমরা আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মনীতিও গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইতে পারিতেছি না। ধর্ম্মনীতি আমরা বুঝি না বলিয়াই যেমন বুঝাইতে পারি না, তেমনই এই নীতিজ্ঞানের অভাবে আমরা পাশ্চাত্য প্রেরিত-নীতির মোহে পড়িয়া রহিয়াছি। এই মোহ-বশতঃ আমরা এতদিন বলপ্রয়োগে ইংলণ্ডদেশের তথাকথিত স্বাধীনতাকে এই দেশে আনিবার চেষ্টায় ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে, গভর্ণমেণ্ট Prospero-র ন্যায় আমাদের হস্তপদ আবদ্ধ করিয়া এই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পথ একপ্রকার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে কেবল ধর্ম্ম নষ্ট করা বিষয়েই আমাদের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। এই কারণে আমরা স্বাধীনতা-লাভের জন্য যাহাই করিতেছি না কেন, তাহার দ্বারাই আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে। আমরা পূর্ব্বপুরুষের এমনই অকৃতী সন্তান যে, অদ্য পর্য্যন্ত আমাদের অনেকে জানিতে পারেন নাই যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইচ্ছা করিয়া কেন ম্লেচ্ছদেশ-প্রচলিত তথাকথিত স্বাধীনতাকে প্রেরিত নীতি বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল যে আমরা এই কথাটী জানি না তাহা নহে, বর্ত্তমানেও এই প্রেরিত নীতির উপর আমাদের একটা মোহ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের রাজজাতির বাহুবল ইহার কারণ। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, রাজজাতি বলবান্ এবং আমরা দুর্ব্বল। ইহাতে আমরা অনুমান করিয়া লই যে, আমাদের ধর্ম্মনীতির দোষেই আমরা পরাধীন হইয়াছি। একবারও ভাবি না যে, বাহুবল ব্যতীত জগতে একটা জ্ঞানবলও আছে। এই কারণে

আমরা জ্ঞানবলকে উপেক্ষা করিয়া বাহুবলের মাপকাঠিতে নিজের মঙ্গলামঙ্গল ওজন করি। কিন্তু মানবের মঙ্গলামঙ্গল বাহুবলের মাপকাঠিতে ওজন হয় না। ইহা জ্ঞানবলের মাপকাঠিতে ওজন হয়। পাশ্চাত্য জগতে প্রেরিত নীতির ব্যর্থতাই ইহার প্রমাণ। প্রেরিত নীতিগুলি ব্যর্থ না হইলে পাশ্চাত্য জগতে পুনঃ পুনঃ বিপ্লব হইত না। আবার আমাদের দেশে গত ৫০ বৎসর যাবৎ যে সকল প্রেরিত নীতি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহাও পৌনঃপৌনিক ব্যর্থতাপ্রযুক্ত নিষ্ফল বলিয়া প্রমাণিত হইত না। যে ঔষধে রোগের বৃদ্ধি হয়, সেই ঔষধ দ্বারা রোগীর চিকিৎসা হইলে তাহার মৃত্যু হয়। প্রেরিত নীতি আমাদের দেশের পরাধীনতা-রোগের তদ্রূপ ঔষধ। ইহাতে সমগ্র দেশ মৃত্যুর পথে চলিয়াছে।

প্রকৃত তত্ত্বকথা এই যে, লঘুগুরুজ্ঞান যখন শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গুরু-শিষ্য বা রাজা-প্রজা উভয়কে আকর্ষণ করে, তখন এই লঘুগুরুজ্ঞানই পরস্পরের মনুষ্যত্ব অনুভব করিয়া সাম্যবাদরূপে পরিণত হয়। ইহা মনুষ্যত্বের সাম্যবাদ, স্বেচ্ছাচারের সাম্যবাদ নহে। ইহাতে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ যেমন থাকে, সচ্চরিত্রতাজনিত একটা সাম্যবাদও তেমন প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্লেচ্ছদেশে এই মনুষ্যত্বের অনুভূতি নাই বলিয়া তথায় চিরদাসত্ব ও চির অশান্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, পরস্পরের শ্রদ্ধা ও প্রীতিজনিত লঘুগুরু-জ্ঞান লইয়া আমাদের ঋষিগণ এই দেশের রাজনীতি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে রাজা প্রজা উভয়কেই চরিত্রবান্ হইতে বলা হইয়াছে। যথা:—

স্বারাধ্যো নীতিমান্ রাজা দুরারাধ্যস্ত্বনীতিমান।
যত্র নীতিবলে চোভে তত্র শ্রী সর্ব্বতোমুখী॥

শুক্রনীতি ১ম অধ্যায় ১৭ শ্লোক।

অনুবাদ :—নীতিমান্ রাজা সু-আরাধ্য এবং অনীতিমান্ দুরারাধ্য। যেখানে নীতি ও বাহুবল উভয়ই থাকে, সেইখানে শ্রী সর্ব্বতোমুখী হইয়া থাকেন।

এই শ্রী রাজাপ্রজা পরস্পরের শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলীমূলক। এই পুষ্পাঞ্জলী যাহাতে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে দিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই ঋষিগণ এই দেশে শাস্ত্রীয় চরিত্র প্রতিষ্ঠিত করার পথ করিয়া দিয়াছেন। তুমি বলিতে পার যে, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মাবলম্বী রাজা না হইলে, তাহার নিকট শাস্ত্রীয় চরিত্র প্রত্যাশা করা বৃথা। কিন্তু এই কথাতে একটী ভুল আছে। স্বজাতি ও স্বধর্ম্মাবলম্বী চরিত্রবান্ রাজার অভাব হইলে, দেশ কখনও অরাজক থাকিতে পারে না। এই কারণে মনু তাহার রাজধর্ম্মপ্রকরণে বলিয়াছেন যে, সকল ক্ষেত্রেই যে ক্ষত্রিয় রাজা ব্যতীত অপর কাহাকেও রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে না, এমন কোনও কথা নাই। এই কারণে ভিন্ন-জাতীয় রাজাও যদি ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করেন, তাহা হইলে তাহাকেও রাজা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মনুসংহিতার রাজধর্ম্মপ্রকরণের ১ম শ্লোকের বিচার দ্বারাই ইহা প্রতিপন্ন হয়। এই অর্থে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মুসলমান ও ইংরাজকে রাজা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অনেক মুসলমান রাজা ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজও তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে এই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র ইহার দৃষ্টান্ত। তিনি যখন তাঁহার ঘোষণা পত্রদ্বারা এই দেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজপক্ষের নিরপেক্ষতা প্রচার করিয়াছিলেন, তখন ইংরাজ জাতি আমাদের ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। আকবর প্রভৃতি মুসলমান সম্রাট্ও ত্রই মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়াও নিরপেক্ষ ছিলেন। আমরা মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে সম্রাট্ আকবরের সহিত তুলনা করিলে, দেখিতে

পাই যে উভয়ের ভিতরে একটা যুক্তিঘটিত সাদৃশ্য আছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে ইংরাজ-জাতি বুঝিয়াছিলেন যে, কোনও দেশেই কোনও সামাজিক নৈতিক বা ধর্ম্মঘটিত কোনও প্রথা বৃথা গড়িয়া উঠে না। দেশের লোকের প্রকৃতি অনুসারেই তাহা গড়িয়া উঠে, এই অবস্থায় দেশের লোককে এই বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা প্রদান করাই কর্ত্তব্য। সম্রাট্‌ আকবরের ইতিহাস পাঠ করিলেও, তাঁহার মনে এই যুক্তিরই প্রাধান্য ছিল বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, ইংরাজীশিক্ষা এই যুক্তির ভিত্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই শিক্ষা পাইয়া আমরা আমাদের ঘরের জিনিষ ফেলিয়া দিতে লাগিলাম এবং কংগ্রেস করিয়া পাশ্চাত্য-দেশ-প্রচলিত প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী এই দেশে আনিতে চাহিলাম। তখনই ইংরাজ বুঝিলেন যে, দেশের লোকই যখন তাহার নিজের দেশের শাসনপ্রণালী পছন্দ করে না, তখন আমাদের দেশে যে শাসনপ্রণালীকে আমরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি, তাহা এখন এই দেশে আনিতে দোষ কি? ইংরাজ যে ইহা সরলভাবেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহা Vincent Smith লিখিত ভারতের ইতিহাসের উপসংহারের কতিপয় কথার দ্বারা প্রমাণিত হয়ঃ—"Indians, like other Asiatic peoples, usually have been been content with despotic rule, so that the difference between one government and another has lain in the personal characters and abilities of the several despots rather than in the change consequent upon the gradual development of institutions."

অনুবাদ ঃ—অপরাপর এসিয়াবাসীর ন্যায় ভারতবাসীও জটিলতাহীন সরল স্বেচ্ছাচার প্রণালীর শাসনে সন্তুষ্ট থাকিত, এই কারণে এক রাজার সহিত অপর রাজার প্রভেদ তাহারা রাজার ব্যক্তিগত চরিত্র ও গুণপনার দ্বারা বিচার করিত, ইউরোপের ন্যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমোন্নতি ও ক্রমাবনতির দ্বারা বিচার করিত না।

কথাটা যে কেবল Vincent Smithই বলিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, সকল ইংরাজ ঐতিহাসিকেরই এই ধারণা। এমন কি, দেশের বর্ত্তমান শাসকসম্প্রদায় ও ইংলণ্ডবাসী জনসাধারণসহ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও এই ধারণাই বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ইহা ভুল। এই দেশের শাসনপ্রণালী কোনও রাজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতির উপর ইহা নির্ভর করিত। আমাদের যুগতত্ত্বই ইহার প্রধান। সত্যাদি যুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত থাকায়, তখন রাজাগণ ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেন। এই কারণে তৎসময়ে বর্ণাশ্রমী জগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। তারপর কলিযুগে যখন বর্ণাশ্রম শিথিল হইয়া গেল, তখনই রাজগণের স্বেচ্ছাচার জাতীয় শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া দিল। বিদেশীয় কর্ত্তৃক ভারতাধিকার এই বলহ্রাসের ফল। দুর্ভাগ্যক্রমে, বিদেশীয়গণের ন্যায় আমরাও এই কথাটী না বুঝিয়া মনে করিতেছি যে, এই দেশ বুঝি চিরকালই স্বেচ্ছাচার-প্রণালীর শাসনে অভ্যস্ত ছিল। এই ভ্রান্তিবশতঃই আমরা বিদেশ-প্রচলিত প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী এই দেশে আনিতে চাহিয়া মনে করিয়া বসিলাম—ইহাই বুঝি সংস্কৃতি ও সভ্যতা। কিন্তু কাজের বেলা দেখা গেল যে, আমরা সভ্য হওয়ার পরিবর্ত্তে দুর্ব্বিনীত ও অসভ্য হইয়া পড়িয়াছি এবং সংস্কৃতির পরিবর্ত্তে বিবেকহীনতাকে গ্রহণ করিয়া নীতিজ্ঞানহীন দাসে পরিণত হইয়াছি। ইহা ইংরাজের দোষ নহে, আমাদের দোষ। বস্তুতঃ, যে পথে আমরা চলিয়াছি, তাহার ফল উদ্ধত ভিক্ষাবৃত্তি অথবা বিবেকহীন দাসত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে। দাস যখন বিবেকসম্পন্ন থাকে, তখন তাহার দাস্যভাবের উন্নতি হইয়া ভগবৎকৃপালাভ হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহাপেক্ষা অধিক লাভের আমরা আশা করিতে পারি না। কিন্তু বিবেকহীন উদ্ধত দাস পশুর সমান

হইয়া যায়। এই কারণে এই পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপথে চলিয়া যাহাতে আমরা মানবস্বাধীনতার আদর্শ দেখাইতে পারি, তজ্জন্যই এই গ্রন্থের প্রয়োজন হইয়াছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র ছলনা নহে। ইহা ইংরাজজাতির উদারতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আজও জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য এই জাতির যে প্রচেষ্টা দেখা যায়, ইহাতে তাহাদের উদারতারই যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম্মে যে সার্ব্বভৌম ভাব আছে তাহা আজ বুঝিতে পারিলে, এই জাতি কখনও এই ধর্ম্মের পথে কণ্টক রাখিবেন না। আমাদের স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেই সর্দ্দা আইন দ্বারা বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিয়াছেন। আবার অসবর্ণ-বিবাহবিষয়ক নানা আইন প্রণয়ন করিয়া এই ধর্ম্মকে জগতের গাত্র হইতে লুপ্ত করার চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই যুক্তি প্রদত্ত হয় যে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-সভ্যতা কার্য্যোপযোগী ও পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই মিথ্যা অজ্ঞানতার প্রতিবাদ যদি এখন না হয়, তাহা হইলে দেশে আর ধর্ম্ম থাকিবে না। ইতর ভদ্র সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত তুলনায় আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল্য কতটুকু আছে, তাহা দেখিতে চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। এই কারণে এই গ্রন্থ কাহারও অন্তরে আঘাত দেওয়ার জন্য লিখিত হইতেছে না এবং শাস্ত্রে ম্লেচ্ছ-শব্দ ব্যবহৃত আছে বলিয়াই এই গ্রন্থেও এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দ ব্যবহার না করিলে, শাস্ত্রালোচনা অসম্ভব ও বাহ্য জাতির সভ্যতার সহিত আমাদের সভ্যতার তুলনা অসম্ভব। সর্ব্বশেষে, এই তুলনা না হইলে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার ব্যাখ্যা অসম্ভব। কথাটা পাঠক পরে বুঝিতে পারিবেন।

অষ্টম অধ্যায়

দাসত্বের স্বরূপ কি?

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, অধর্ম্মের ফল দাসত্ব। কিন্তু কথাটা আজকাল অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না। এই কারণে এই অধ্যায়ে দাসত্বের একটী স্বরূপ-প্রদর্শন আবশ্যক। বস্তুতঃ, পূর্ব্ব অধ্যায় পাঠ করিয়াই প্রতিপক্ষ বলিবেন যে, ইহা কেমন কথা? স্বাধীনতার সন্ধানে থাকিয়া জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করিলে, বৈজ্ঞানিক উন্নতি হইয়া একটা সভ্যতার উৎপত্তি হয়। এই সভ্যতাতে যদি অশান্তি থাকে, তবে ঐ অশান্তিই বরণীয়। কিন্তু সভ্যতা কি দাসত্বের জনক? ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। অবশ্য জাতীয় উন্নতি ও সভ্যতা রক্ষা করিতে হইলে, সত্যাদি ধর্ম্ম সকল সময়ে রক্ষা করা যায় না। পক্ষান্তরে, সভ্যতা-রক্ষার নিমিত্ত স্বদেশপ্রেম আবশ্যক। তাহা এই দেশে ছিল না বলিয়াই এই দেশের এত অধঃপতন। এই অবস্থায় এই স্বদেশপ্রেম-বিহীন দেশের প্রাচীন পরিত্যক্ত এক সভ্যতার পুনরুদ্ধার করিয়া আমরা কি করিব? বস্তুতঃ, পাশ্চাত্য স্বদেশপ্রেমই যে আমাদের অনেককে পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণে এই অধ্যায়ে একাধারে স্বদেশপ্রেম ও দাসত্বের স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

সকলেই জানেন যে, ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় প্রশ্নকে দূরে রাখিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানহীন জাতীয়োন্নতি-বিষয়ক সঙ্কল্প হইতে আমাদের স্বদেশপ্রেমের উৎপত্তি হয়। দেশকে উন্নত করিয়া ইহাকে একটা নন্দন-কাননে

পরিণত করিব; এই সঙ্কল্পই আমাদের স্বদেশপ্রেম। এই সঙ্কল্প-গ্রহণকালে কেহ নিজের দোষ-গুণের দিকে দৃষ্টিপাত করে না; সর্ব্বদাই সমাজের দোষগুণের সমালোচনা করে। বিশ্ববিদ্যালয়েরে সাহিত্য-সমালোচনায় এই পরচর্চ্চাই শিক্ষা হয় এবং ঐতিহাসিক আলোচনায় এই পরচর্চ্চারই গলাধঃকরণ হয়। আবার ফিলজফিতে এই পরচর্চ্চাই জ্ঞানের চরম অবস্থা বলিয়া প্রমাণিত হয়। অবশ্য আত্মশুদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে পরের দোষ আলোচনা আবশ্যক হয়। কিন্তু যেখানে আত্মশোধনের কোনও সঙ্কল্প থাকে না, সেইখানে পরচর্চ্চা কেবল পরকে মাজিয়া ঘষিয়া নিজের স্বার্থসাধন করার উপায়-স্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে। দেশোন্নতির আদর্শই বল, আর ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শই বল, প্রত্যেক আদর্শই স্বার্থসাধনের যন্ত্র। অশোধিত বিবেকে এমন আদর্শ কল্পিত হয় না, যদ্দ্বারা কল্পনাকারীর নিজের কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কেহ চাহেন বৈষয়িক উন্নতি এবং কেহ চাহেন খ্যাতি-প্রতিপত্তি। এইরূপে ব্যক্তিগত আদর্শ ও দেশোন্নতির আদর্শ সর্ব্বদাই পরকে মাজিয়া ঘষিয়া নিজের মতলব অনুযায়ী গড়িতে চাহে এবং তাহাতেই মানুষ সমাজ-সংস্কারের নাম দিয়া একে অন্যকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দেয়। এই দাসত্ব সার্ব্বজনীন, সর্ব্বব্যাপী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বদেশপ্রেম বাহিরের চাপজনিত একটা বহির্ম্মুখী সঙ্কল্পের ফলমাত্র। বহির্ম্মুখী সঙ্কল্প সর্ব্বদাই অন্তর্ম্মুখী সঙ্কল্পের বিরোধী। মনোবৃত্তির এই প্রভেদ হেতু স্বাধীনতাবিষয়ক জ্ঞানেরও প্রভেদ হয়। ম্লেচ্ছজাতি মনে করেন যে, মানুষ সমষ্টিভাবে পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল মনে করে, তাহাই ব্যক্তির পক্ষে ভাল এবং যাহা মন্দ মনে করে, তাহাই ব্যক্তির পক্ষে মন্দ। ইহাতে ব্যক্তি মনে করে যে, সমষ্টিগত এই স্বেচ্ছাচার যদি ভাল হয়, তবে আর ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের অপরাধ কি? এইরূপে সমাজে

একটা স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় হয় এবং এই প্রশ্রয়-মূলে মানুষ যেখানে মৃদু বাধা পায়, সেইখানেই অকুতোভয়ে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে এবং তীব্র বাধার ক্ষেত্রে অনিচ্ছাতে স্বেচ্ছাচার হইতে ক্ষান্ত থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে, ম্লেচ্ছদেশে কর্ম্মের উচ্ছৃঙ্খলতার নামই স্বাধীনতা। তবে তথাকার পণ্ডিতগণ এই কথা স্বীকার না করার কারণ এই যে, তথায় সমষ্টির মতের বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেওয়া হয় না। সুতরাং তথায় সমষ্টির স্বার্থ বজায় রাখিয়া যদি ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল হয়, তাহা হইলে দোষের হয় না। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না যে, ইহাতেই তাঁহাদের সমাজে একটা সার্ব্বজনীন দাসত্ব আসিয়া পড়ে। ব্যক্তি যেখানে সমষ্টিগত স্বেচ্ছাচারের অধীন থাকে, সেইখানে সমষ্টির স্বার্থের বিরুদ্ধে সত্যকথাও সে বলিতে পারে না। মানুষ মাত্রেরই একটা বিবেক আছে। মিথ্যা কথা বলিতে গেলে, এই বিবেক আহত হয়। কিন্তু তুমি ইংরাজ হইয়া যদি ইংরাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের পথে চল, তাহা হইলে তুমি সমগ্র জাতির নিকট অবিশ্বাসী হইয়া উঠিবে। একটু চিন্তা করিলে বুঝিবে যে, ইহার ন্যায় দাসত্ব আর জগতে নাই। কিন্তু এই দাসত্ব ম্লেচ্ছদেশে সর্ব্বব্যাপী। তথায় চরিত্র অপেক্ষা নিমকহালালী শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে রাজার নিমকহালালীকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হইত, এখন জাতিগত নিমকহালালীকে (Loyalty to national interest) শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। ফলে, এই নকল সমাজে চরিত্রবান্ ও ধার্ম্মিক মনুষ্যগণ একটা অসহনীয় দাসত্বের জ্বালায় অধীর হইয়া সাহিত্যের সাহায্যে দেশে বিপ্লবের বীজ রোপণ করেন। Reausseau, Voltaire হইতে আরম্ভ করিয়া Lennin প্রভৃতি মনুষ্যগণ এই শ্রেণীর লোক। ইঁহাদিগকে তুমি চরিত্রবান্ বলিয়া স্বীকার না করিলেও, ইঁহারা যে দুষ্ট-বিদ্বেষী, তাহা তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এদিকে আমাদের চরিত্রই

স্বাধীনতা। আমরা আচারের দ্বারা চরিত্রের সাধনা করি এবং দশজনের স্বার্থ যদি শাস্ত্রীয় আচারের বিরোধী হয়, তবে আমরা এই স্বার্থত্যাগ করিয়াও শাস্ত্রীয় আচার রক্ষা করি। আচার-রক্ষার উদ্দেশ্য শাস্ত্র-রক্ষা এবং শাস্ত্র-রক্ষার উদ্দেশ্য জাতীয়-চরিত্র-রক্ষা। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, মুসলমানের সহিত আহার বিহার ও বিবাহাদি হইলে, এই দেশে একটা ভারতীয় জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু আমরা আচার-রক্ষার জন্য ইহার পক্ষপাতী হই না। ইহাতে জাতীয়তাবাদী মনে করেন যে, আমরা মূঢ়, নিজের স্বার্থ নিজের পায়ে ঠেলিতেছি। কিন্তু আমরা মনে করি যে, জাতীয় চরিত্রই জাতীয় স্বাধীনতা। যদি আমরা আচারভ্রষ্ট হই, তাহা হইলে আমাদের চরিত্র থাকিবে না। আবার চরিত্র না থাকিলে, স্বাধীনতাও থাকিবে না। জাতীয়তাবাদী এই কথা না বুঝিবার কারণ এই যে, তিনি প্রথমতঃ আচারের সহিত চরিত্রের সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝেন না। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয়তাবাদ যে ব্যক্তিগত বিবেককে দাস করিয়া সমষ্টির উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিকে চালাইয়া দেয়, তাহাও তাঁহারা বুঝেন না। এইখানে প্রশ্ন এই যে, ব্যক্তিগত বিবেকটা দশ জনের মতের দাস হইবে কি ইহা মুক্ত থাকিবে? দাসত্বের জ্বালা ও তাহা হইতে মুক্তির সুখ প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করে এবং এই সুখ-দুঃখের অনুভূতিই পরিণামে শান্তি ও বিপ্লবের কারণ হয়। অন্যথা শান্তিও অসহনীয় হয়। এই অবস্থায় ব্যক্তিকে সমষ্টির দাস করিলে, সমাজে শান্তি থাকে না। এইজন্য ব্যক্তিগত বিবেক সর্ব্বদাই মুক্ত থাকা আবশ্যক। ব্যক্তিগত বিবেক মুক্ত থাকিলে, সমষ্টি ইহার দাস হয় না। এই কথার ভিতরে যে রহস্য আছে, তদ্বিষয়ে বোধ না থাকায়, আমাদের শাস্ত্রকার যাহাকে দাসত্ব নামে অভিহিত করেন, ম্লেচ্ছজাতি তাহাকেই স্বাধীনতা বলিয়া ভ্রম করেন। সমস্তই মানুষের মনোবৃত্তির উপর নির্ভর

করে। মানুষ যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম করে, তখন তাহার এই ভ্রম দূর করা অতিশয় কঠিন হয়। এইজন্য আজকাল এই দেশেও মানুষের এই ভ্রম দূর করা অতিশয় কঠিন। বহুকালব্যাপী ম্লেচ্ছশিক্ষার ফলে এই দেশেও বর্ত্তমানে এই ভ্রমটা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য এই গ্রন্থে এই ভ্রান্তিটা সর্ব্বাগ্রে দূরীকৃত না হইলে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ গণ্য হইয়া যাইবে এবং পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের দুন্দুভিধ্বনির ভিতরে লুক্কায়িত দাসত্বটা কোথায় আছে, তাহা মানুষের বোধগম্য হইবে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গ্রন্থরাশি পাঠ করিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, এই দেশে কখনও স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রেমের সাধনা ছিল না। আমরাও শৈশব হইতে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করায় এবং শাস্ত্রপাঠ আমাদের অনভ্যস্ত থাকায়, এই পণ্ডিতগণের ভ্রান্তিই আমাদের ভিতরে সংক্রামিত হইয়াছে। ফলে, প্রকৃত স্বাধীনতা কোথায় এবং কিরূপ, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এইজন্য বর্ত্তমানে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণও ম্লেচ্ছদেশপ্রচলিত মিথ্যা স্বদেশপ্রেম ও মিথ্যা স্বাধীনতার সাধনার দিকে অগ্রসর হইতেছেন এবং তাহাতে আমাদের দাসত্বশৃঙ্খল ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতেছে। কথাটা অনেকের নিকট অদ্ভুত মনে হইবে বলিয়া, প্রথমতঃ পাশ্চাত্য স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা জ্ঞানের একটু সমালোচনা করিয়া, তৎপরে প্রকৃত দাসত্ব কাহাকে বলে, তাহার পরিচয় দিব। তাহা হইলেই জাতীয়তাবাদের ভ্রান্তি কোথায়, তাহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"Soldiers" says Sir Charles Napier, "are instituted to fight declared enemies, not to be watchers and punishers of criminals. They should be in thought and reality identified with their country's glory—the proudest of her sons."

অনুবাদ :—সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ সেনাপতি নেপিয়ার বলিয়াছেন যে, প্রকাশ্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করার জন্য সৈনিকমণ্ডলীর সৃষ্টি হইয়াছে, অপরাধীদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করা এবং তাহাদিগের দণ্ডবিধান্ করার জন্য ইহাদের সৃজন হয় নাই। ইহাদের চিন্তায় ও কার্য্যে যাহাতে দেশের গৌরবে আত্মবোধ জন্মে এবং দেশের সন্তানগণের মধ্যে যাহাতে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গর্ব্বিত সন্তানে পরিণত হয়, তাহাই বাঞ্ছিত।

ইহারই নাম পাশ্চাত্য দেশাত্মবোধ। অপরের সহিত প্রতি-যোগিতামূলে নিজের বড় থাকিবার চেষ্টাকে যেমন ব্যক্তিগত আত্মবোধ বলা যায়, অপর দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় নিজের দেশকে বড় রাখিবার ইচ্ছাকেও তেমন দেশাত্মবোধ বলা যায়। উভয়েরই মূলে একটা তত্ত্ব নিহিত আছে। উহার নাম—জীবনসংগ্রামতত্ত্ব (struggle for existence)। এই তত্ত্ব মানুষকে বলিয়া দেয় যে, যদি সংসারে বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে যুঝিয়া বাঁচিয়া যাও। ইহাতে যে ব্যক্তি বা জাতির অধিকতর যোগ্যতা থাকে, সে রক্ষা পায় এবং অপরের ধ্বংস হয়। এই জীবনসংগ্রাম দেশের ধন-ধান্য-পুষ্পাদি উপভোগ করার বাসনা হইতে আরম্ভ হইয়া শেষে ব্যক্তিগত ও দেশগত প্রতিযোগিতাতে যাইয়া পরিণামপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেশাত্মবোধ-শব্দের যদি শব্দগত অর্থ করা যায়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, দেশের গৌরবের ভিতরেই মানবের দেশাত্মবোধ রহিয়াছে। এক্ষণে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, দেশের এই গৌরব কিছুই নহে, ইহা বাহুবলের গৌরব। প্রথমতঃ, দেশের গৌরব আমাদিগকে আত্মপ্রশংসী করে এবং দেশে দেশে ঘুরিয়া নিজের গৌরব-ঘোষণার জন্য প্ররোচনা দেয়। যেখানে এই গৌরব-ঘোষণা বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেইখানেই সদসদ্বিবেকশূন্য হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করার ইচ্ছা হয়। সর্ব্বশেষে, প্রতিদ্বন্দ্বী যদি শ্রেষ্ঠ চরিত্রের

লোক হয়, তাহা হইলে তাহার অন্যায় সমালোচনা দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা এই স্বদেশপ্রেমের কর্ত্তব্য হয়। ইহাতে পাত্রাপাত্র-বিচার থাকে না, এমন কি ভগবান রামচন্দ্রকেও সমালোচনা করিতে কেহ দ্বিধাবোধ করে না।

এইখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তবে কি ম্লেচ্ছদেশে সদসদ্বিবেক নাই ? বস্তুতঃ, বিবেক মনুষ্যমাত্রেরই আছে। কিন্তু লোভ এই বিবেকের শত্রু। ইহা এই বিবেককে এমন ভ্রান্ত করিয়া দেয় যে, ইহা কি চাহে, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। এই জন্য এই বিবেক যখন লোভের বশে সদসদ্বিচার করে, তখন এই বিচারেও ভ্রম হয়। স্বদেশ-প্রেম এই লোভের ফল। ইহাতে মনে হয় যে, একটা অজানিত সত্যের সন্ধানে চলিতেছি ; কিন্তু বস্তুতঃ, ইহা অপ্রাপ্য ও মিথ্যা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখ, আমাদের দেশেও এই শ্রেণীর অন্ধবিবেকমূলক স্বদেশপ্রেম আসিয়া এক স্বরাজের আদর্শ কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু ইহার স্বরূপ কি, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। বিবেকের এইরূপ একটা অন্ধ ভাবকে শাস্ত্রকার তমোগুণ বলিয়াছেন। যথা—

যত্তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তবিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ।

—মনু ১২ অধ্যায় ২৯ শ্লোক।

অনুবাদ :—সদসদ্বিবেকশূন্য অব্যক্ত বিষয়াত্মক ও অপ্রতর্ক্য দুর্জ্ঞেয় যে বিষয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাহাকে তম বলিয়া জানিবে।

টীকাকার কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন—যৎ পুনঃ সদসদ্বিবেকশূন্যং অস্ফুট-বিষয়াকারস্বভাবমতর্কনীয়স্বরূপমন্তঃকরণবহিঃকরণাভ্যাং দুর্জ্ঞানং তত্তমো জানীয়াৎ।

বস্তুতঃ, এই নবাগত স্বরাজের আদর্শে কোনটা সৎ, কোনটা অসৎ, তাহা আমরা বুঝি না। এইজন্য স্ত্রীপুরুষ একত্র মিলাইয়া পিকেটিং করাই। আবার গভর্ণমেণ্টের নিকট Dominion Status চাহিব কি পূর্ণ স্বরাজ চাহিব অথবা গভর্ণমেণ্ট যাহা দেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব, তাহা অস্ফুট থাকিয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করে। ফলে, স্বরাজের স্বরূপটা কি, তাহা আমাদের নিকট অতর্কণীয়-স্বরূপবিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ইহাকেই তমঃ বলিয়া জানিবে। এই তমোগুণাত্মক বিবেক লোকের চালক হওয়া দূরে থাকুক, ইহা মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করে। ফলে, আত্মপ্রশংসী ও দুষ্ট মনুষ্যগণই দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বসে। মানবচিত্তের বিভ্রান্ত অবস্থা ইহার কারণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দেশের গৌরবমূলক স্বদেশপ্রেমের উদ্দেশ্য অপরের পরাজয়। যে দেশ অপর সমস্ত দেশকে পরাজিত করিতে পারে, সেই দেশই সমধিক গৌরবান্বিত হয়। কিন্তু অপরকে পরাজিত করিতে হইলে, দেশবাসীর পরস্পর মিলন আবশ্যক। সুতরাং এই মিলন কোন, সূত্রে হয়, তাহা একবার দেখা যাউক।

নেপিয়ার যে সৈনিকপুরুষগণের গর্ব্বে গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা সমস্তই বেতনভোগী সৈনিক। দেশের অপর লোকের সহিত ইহাদের বন্ধন কি? অন্নের বন্ধন। দেশের রাজশক্তিতে সমষ্টির শক্তি কেন্দ্রীভূত আছে এবং ঐ কেন্দ্রীভূত শক্তি হইতে সে বেতন পায়। এই বেতনের দরুণ অন্নের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সে দেশের গর্ব্বে গর্ব্বিত। কিন্তু দেখা যায় যে, এই গর্ব্বে তাহার দাসত্বের মাত্রাই অধিক। জগতে অন্নের দাসত্ব ব্যতীত আর দাসত্ব নাই। এই দাসত্ব লইয়াই সিপাই মদগর্ব্বে গর্ব্বিত। কারণ, যে শক্তি তাহাকে গোলাম করিয়া রাখিয়াছে, সেই শক্তি অপর শক্তিকে পরাজিত করিয়াছে। কিন্তু এই গৌরবে

স্বাধীনতা কোথায় আছে, তাহা দেখা যাউক। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, এই সিপাই যদিও অন্নগতভাবে পরের দাস, তথাপি সে চরিত্রগতভাবে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন। কেন না—অন্নের সর্ত্তরূপী কর্ত্তব্য বজায় রাখিয়া, সে যাহা খুসী করিতে পারে। সকালে বিকালে Parade এবং তৎপর তাহার কামাচার। এই কামাচার-মূলে ইহারা কোথায় যাইয়া কখন কি করে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

কথাটা যে কেবল সিপাহী সম্বন্ধেই সত্য এমন নহে। আজকালকার গৌরবান্বিত দেশসমূহের প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধেই ইহা খাটে। প্রত্যেকের স্বার্থ রাজশক্তির নিকট আবদ্ধ এবং তন্মূলে প্রত্যেকেই স্বদেশপ্রেমিক। রাজশক্তি আবার তাহাদের স্বার্থ নানা প্রকারে উদ্ধার করিয়া দেন এবং বাণিজ্য বল, ব্যবসা বল, আর চাকুরীক্ষেত্র বল, প্রতিক্ষেত্রেই রাজশক্তি যেন প্রত্যেক ব্যক্তির গোলাম। ইংরাজ যেখানেই থাকুন না কেন, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার স্বার্থ দেখেন এবং ফরাসী যেখানেই থাকুন না কেন, ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাঁহার স্বার্থ দেখেন। এই স্বার্থ দেখিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা না হইলে, মানুষের স্বদেশপ্রেম থাকে না এবং স্বদেশপ্রেম না থাকিলে, গভর্ণমেণ্ট টিকে না। কিন্তু ইহাতে রাজশক্তির স্বার্থ ব্যক্তির নিকট আবদ্ধ এবং ব্যক্তির স্বার্থ রাজশক্তির নিকট আবদ্ধ। উভয়ে উভয়ের গোলাম। এইখানেও আবার একটা স্বাধীনতা আছে। উপরে যে স্বার্থের দাসত্বের কথা বলা হইল, সেই দাসত্বের সর্ত্ত রক্ষা করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই চরিত্রগতভাবে স্বাধীন। এক কথায় বলিতে গেলে, দেশের স্বার্থ বজায় রাখিয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেই রাজা প্রজা উভয়ে স্বাধীন। কেহ কাহারও ব্যক্তিগত খবর লয় না এবং যে পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত চরিত্র দেশের স্বার্থের বিরোধী না হয়, সেই পর্য্যন্ত দেশের আইন এই চরিত্রের স্বেচ্ছাচারে বাধা দেয়

না। আবার রাজশক্তিও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিয়া যাহা করে, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির সমর্থন পায়। জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিয়া ব্যক্তি যদি খুন ডাকাতিও করে, তথাপি জাতীয় রাজশক্তি তাহাকে সমর্থন করিবে এবং জাতীয় স্বার্থরক্ষা করিয়া রাজশক্তি যদি একটা দেশের মনুষ্যসমষ্টিকে বিষাক্ত বাষ্পের সাহায্যে বিনাদোষে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও প্রজা তাহাকে সমর্থন করিবে।

সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে, ইহা অন্নগত দাসত্ব এবং কর্ম্মগত উচ্ছৃঙ্খলতা; ইহাকেই আজকাল স্বাধীনতা বলে। এই স্বাধীনভাবের পরিকল্পনায় নীতি (Morality) বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। কেহ কোনও নির্দ্দিষ্ট আচার, নিয়ম বা অনুষ্ঠানের অধীন নহে। এইজন্য এই সকল সমাজে বিবাহের কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, অবাধ যৌন সম্মিলনেও যুবকযুবতী কোনও বাধা পায় না। ইহাতে বাল্যবিবাহরূপী আচারের দাসত্ব নাই, অথবা বিধবা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারে। পুরুষও তদ্রূপ। এইরূপ নানাদিকে ইহা কর্ম্মঘটিত স্বাধীনতা। ইহার বন্ধন অন্নঘটিত, চরিত্রঘটিত নহে। এক কথায় বলিতে গেলে, এই স্বদেশপ্রেম চরিত্র চাহে না, ধন চাহে। এইজন্য ধনকে বন্ধনসূত্র করিয়া এই প্রেমে জাতীয় মিলন হয়। ফলে, ধনটাই আবদ্ধ থাকে। আজ সমাজতন্ত্রবাদ ধনকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া এই কথাটার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ইহাতে প্রত্যেকের ধন সমষ্টির নিকট আবদ্ধ হইয়া জাতীয় বন্ধনসূত্র হইয়াছে। ফলে, সমগ্র জাতীয় ধন সমষ্টির নিকট আবদ্ধ হইয়া ব্যক্তিকে সমষ্টির দাস করিয়াছে। সমাজের এইরূপ ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই সমষ্টির অন্নদাস। এই অবস্থা যে আজ নূতন হইয়াছে, তাহা নহে। চিরকালই ধন ইহাদের জাতীয় বন্ধন-সূত্র। এই কারণে চরিত্রগতভাবে ইহারা

স্বাধীন। এই স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত আমাদের ভারতের ইতিহাসে ইংরাজের ভারত-বিজয়ে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে :—

"It was at this time that the final and specific accusations against Lord Clive, which had long been impending over him, were brought forward by the Chairman of the Select Committee, in the shape of a demand for enquiry into the death and deposition of Seeraj-ood-Dowlah, and the fictitious treaty. On Clive's part, nothing was denied ; he gloried in every act he had done, and the sympathy of both Houses, representing the English nation, ultimately went with him."

Meadows Taylor's History of India.

অনুবাদ :—এই সময়ে লর্ড ক্লাইভের বিরুদ্ধে নির্দ্দিষ্ট অভিযোগগুলি উপস্থিত করা হইল। এই সকল অভিযোগ অনেক দিন যাবৎ তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত ছিল এবং এক্ষণে সিলেক্ট কমিটীর সভাপতি-দ্বারা এইগুলি স্থাপিত হইল। অভিযোগের সার এই যে, সিরাজ-উদ্দৌলার মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে এবং যে অলীক-সন্ধিপত্র দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে তদন্ত হউক। ক্লাইভ তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই গৌরব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং পার্ল্যামেণ্টের উভয় গৃহের সহানুভূতি পরিণামে তাঁহার পক্ষেই গিয়াছিল।

ইহাতে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডের ২।৪ জন লোক যদিও তখন চরিত্র চাহিতেন, তথাপি সমগ্র জাতির মনোবৃত্তি তাহা ছিল না। এই মনোবৃত্তিতে প্রত্যেকের ধারণা ছিল যে, জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইলে,

রাজশক্তির পক্ষে ব্যক্তিগত চরিত্রকে স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করিতে দিয়া ধন আহরণ করার সুযোগ-প্রদান কর্ত্তব্য। অন্যথা, আজ যদি এই পার্ল্যামেণ্ট চরিত্রকে আবদ্ধ রাখার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে কাল আমাদের জাতীয় স্বার্থলাভ হইবে না। এইজন্য ব্যক্তির নিকট সমষ্টি এবং সমষ্টির নিকট ব্যক্তি স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ থাকুক, চরিত্র-দ্বারা নহে। স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ থাকিলে, পার্ল্যামেণ্ট কোনও যুক্তিতে ক্লাইভকে দণ্ডিত করিতে পারেন না। কেন না, Clive জাতীয় স্বার্থ নষ্ট করেন নাই। যাঁহারা Burke's "Impeachment of Warren Hastings" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, এই ক্ষেত্রেও Hastings এই যুক্তিমূলেই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা গেল যে, স্বার্থকে আবদ্ধ করিয়া একটী জাতীয় বন্ধন-সূত্র পাশ্চাত্য জাতীয়তার মূলসূত্র। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহাতে চরিত্র স্বেচ্ছাচারী থাকে এবং কর্ম্মের একটা স্বাধীনতা হইয়া এই স্বাধীনতাকেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলিয়া মনে হয়। এইখানে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, এত লোক থাকিতে স্বদেশ-প্রেমিকের দৃষ্টান্তস্বরূপ Clive ও Hastingsএর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হইল কেন? ইহাতে কেবল পাশ্চাত্য জাতিকে গালাগালি দেওয়া ব্যতীত গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য দেখা যায় না। যে দেশে Robert Bruce আছেন, Oliver Cromwell, Pym, Hampden প্রভৃতি আছেন এবং Edmund Burke-এর ন্যায় মহাপ্রাণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া Clive এবং Hastingsকে লওয়া হইল কেন? তারপর, ম্লেচ্ছদেশেই Garibaldi, Mazzini প্রভৃতির জন্ম। এই অবস্থায় ইঁহাদের নাম করা হইল কেন? কিন্তু কথার উদ্দেশ্য আছে। ইঁহাদের ন্যায় কেহই ভারতসাম্রাজ্যস্থাপনরূপী

বৃহৎ জাতীয় স্বার্থ উদ্ধার করেন নাই। স্কটল্যাণ্ড উদ্ধার করা আর ভারতসাম্রাজ্য স্থাপন করা এক কথা নহে। ইটালীর স্বাধীনতাপ্রতিষ্ঠা করা ও ভারতসাম্রাজ্যস্থাপন করাও এক কথা নহে। প্রশ্ন এই যে, স্বদেশপ্রেমে জাতীয় বন্ধনসূত্রটা কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বার্থ ইহার বন্ধনসূত্র। এই সূত্রকে অবলম্বন করিয়া জাতিরূপী যে মাল্য রচনা করা হয়, তাহাতে Clive ও Garibaldi উভয়েরই স্থান আছে। মূল সূত্র যেখানে স্বার্থ, সেইখানে লঘুগুরু-বিচার হইবে কিরূপে? প্রত্যেকে স্ব স্ব রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে কেহ Garibaldi হয় এবং কেহ বা Clive হয়। সুতরাং এইখানে ব্যক্তিগত বা জাতিগত নিন্দার উদ্দেশ্য নাই। একটা নীতির সমালোচনাই উদ্দেশ্য।

কথা এই যে, Clive এবং Hastings-দ্বারা ইংলণ্ডের যে জাতীয় স্বার্থ উদ্ধার হইয়াছে, Robert Bruce-দ্বারা তাহা হয় নাই। পার্লামেণ্টের অধিকাংশ মেম্বার যদি Cliveএর অথবা Hastings-এর বিরুদ্ধে থাকিতেন অথবা দৃঢ়তার সহিত Clive এবং Hastingsকে দণ্ডিত করিতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, এই সমাজে বিত্তলাভ অপেক্ষা চরিত্রের আদর অধিক। কিন্তু তাহা হয় নাই। কারণ, চরিত্র এই সমাজের বন্ধনসূত্র নহে। স্বার্থ ইহার বন্ধনসূত্র। এই সূত্র লইয়া কেহ কেহ চরিত্রের আদর করিতে পারে না। Clive ও Hastings যে ধন-দৌলতের মধ্যে পড়িয়াছিলেন, Robert Bruce কিংবা Oliver Cromwel সেইরূপ ধন-দৌলত জীবনে দেখেন নাই, আবার Clive ও Hastings যে ক্ষেত্রে পড়িয়াছিলেন, এইরূপ ক্ষেত্রও তাঁহারা দেখেন নাই। হয়ত তাঁহারা যে চরিত্রের লোক ছিলেন, এইরূপ চরিত্রের লোক-দ্বারা এই কার্য্য সাধিতও হইত না। যাঁহারা জাতীয় স্বার্থ লাভ করাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া ইংরাজজাতি

কোনও অন্যায় করিয়াছেন, এমন বিচার কোন নীতি অবলম্বনে করিবে? বস্তুতঃ, চিন্তা করিলে দেখিবে যে, এই বিচারের কোনও মানদণ্ড নাই। যদি দেশের উন্নতির অনুপাতে স্বদেশপ্রেমিকগণকে বিচার কর, তাহা হইলে Clive ও Warren Hastings-এর ন্যায় স্বদেশপ্রেমিক এযাবৎ ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কথাটা লইয়া যিনিই যত তর্ক করুন না কেন, Robert Bruce কি হেতুতে Lord Clive অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা পাশ্চাত্যনীতি-বিজ্ঞানের কোনও সূত্র দ্বারা তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন না। এই কারণে দেশের প্রয়োজনে চরিত্র গঠিত হইবে, কি চরিত্রের প্রয়োজনে দেশ গঠিত হইবে, এই প্রশ্নের মীমাংসা পাশ্চাত্য রাজনীতিতে নাই। কার্য্যতঃ, দেশের প্রয়োজনে চরিত্র গঠিত হইতেছে; চরিত্রের প্রয়োজনে দেশ চলিতেছে না। এই জগতে একমাত্র আমাদের শাস্ত্রকারগণই চরিত্রের প্রয়োজন ও দেশের প্রয়োজনকে একত্র করিয়াছেন। অন্যত্র ইহা নাই। এইজন্য স্বদেশ-প্রেম ও চরিত্রের মিলন একত্র দেখা যায় না। পাশ্চাত্য জগতের জনসাধারণের কুলক্রমাগত সংস্কার এই যে, দেশের প্রয়োজনের সহিত নীতিধর্ম্মের সংঘর্ষণ হইলে, নীতিধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। Edmund Burke যখন Warren Hastings-কে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন, তখন ইংলণ্ডের লোক Warren Hastings-এরই পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন এবং Lord Clive ও পার্ল্যামেণ্টে অভিযুক্ত হইয়া অপদস্থ হন নাই।

এই অবস্থায় প্রশ্ন এই যে, ম্লেচ্ছদেশে যাঁহারা Edmund Burke অথবা Garibaldi-র ন্যায় সচ্চরিত্র লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের মূল্য কত? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সকলে একবাক্যে এই মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা দেশের নেতা হইলেও, বস্তুতঃ তাঁহারা জন-সাধারণের মতানুবর্ত্তী। "They seem to lead, but they

really follow.” কথাটা বস্তুতঃই সত্য। তাঁহারা দেশের সমবেত আকাঙ্ক্ষারাশির প্রতিনিধি-মাত্র। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষারাশির অর্থ কি? বলা বাহুল্য যে, এইগুলি চিরকালই অনিশ্চিত এবং যে সকল আকাঙ্ক্ষা এক সময়ে জনসাধারণ কর্ত্তৃক নিশ্চিত হয়, সেই সকল আকাঙ্খাই জাতীয় উচ্ছৃঙ্খল কর্ম্ম-দ্বারা পূরণ হইয়া পরিশেষে বৃথা বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। এই অবস্থায় এই সকল চরিত্রবান্ পুরুষের চরিত্র আর জীবন-সংগ্রামের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। যাঁহারা বাহাদুরী লাভ করেন, তাঁহারা কেবল সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াই বাহাদুরী লাভ করেন অথবা জনসাধারণকে জয়লাভের পথ দেখাইয়াই বাহাদুরী লাভ করেন। কিন্তু এই বাহাদুরীতেও ইঁহারা জাতীয় নৃশংসতার অংশ গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই বাধ্য হইয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, Warren Hastings যে সকল নৃশংস আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে Burke মুক্ত হইতে পারেন নাই। কারণ, ভারত-সাম্রাজ্যের নীতি তিনি পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই। প্রকৃত কথা এই যে, পুরুষার্থ-নিশ্চয়ের অভাব যেখানে থাকে, সেইখানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিকৃষ্টের মতানুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হন এবং নিকৃষ্ট শ্রেষ্ঠকে ততদিনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে, যতদিন শ্রেষ্ঠ-দ্বারা তাহার স্বার্থ সিদ্ধি হয়। এইজন্য এইরূপ সমাজে পারিবারিক শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষা কেবল বাহাদুরী লওয়ার প্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোনও প্রবৃত্তির জনক হয় না। যে সমাজের নীতিতে সদসদ্বিবেক কেবল মানবজীবনের একটী অনিশ্চিত লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে, সেই সমাজের শ্রেষ্ঠ মনুষ্য কেবল তাহার সমসাময়িক মনুষ্যগণের ঊর্দ্ধে উঠিয়া সমাজের অদূর ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষারাশির চিত্র মাত্র অঙ্কিত করিতে পারে। কিন্তু এই চিত্রাঙ্কনের মূল্য অধিক নহে। ইহা কেবল মানব-জীবনের আর একটা পরিত্যজ্য অধ্যায়কেই অঙ্কিত করে, অপরিত্যজ্য

কোনও অধ্যায়কে অঙ্কিত করিতে সক্ষম হয় না। ফলে, এই সকল মনুষ্য দেশের জনসাধারণের চরিত্রকে সংশোধিত করিতে পারে না। এইরূপে দুষ্টের স্বার্থবুদ্ধি সমষ্টিতে সংক্রামিত হইয়া একটা সম্প্রদায়ে কেন্দ্রীভূত হয় এবং সমষ্টির নিকট একটা জন্মাবচ্ছিন্ন আবদ্ধতাহেতু ব্যক্তি তাহার পাণ্ডিত্য ও সচ্চরিত্রতা লইয়া স্বদেশপ্রেমের খাতিরে দুষ্টের দাস হইয়া পড়ে। এই কারণে স্বদেশপ্রেম একটা দাসত্ব এবং সাম্প্রদায়িকতা ইহার জনক। দুষ্টের ও শিষ্টের স্বার্থ একত্র আবদ্ধ হইয়া সম্প্রদায় নির্ম্মিত হয় এবং সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য রাজশক্তির পরিচালক হয়। তারপর, এই পরিচালক-সম্প্রদায়ের কাছে সমাজের প্রত্যেক মনুষ্যত্বসম্পন্ন ব্যক্তির বিবেক বিক্রীত হইয়া তাহার দংশন-জ্বালায় দাসত্বের অনুভূতি জন্মে।

ম্লেচ্ছজাতি মনে করেন যে, মানবের কর্ম্মগুলি কোনও স্থায়ী নিয়ম-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিলেই দাসত্ব জন্মে। এইজন্য আইন-নিয়মের পরিবর্ত্তন ম্লেচ্ছ-স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। ইহাতে উচ্ছৃঙ্খলতাই স্বাধীনতা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা নহে। অন্নের ও তন্মূলক স্বার্থের আবদ্ধতাই প্রকৃত দাসত্ব। মায়া-মমতার ক্ষেত্র হইতে অন্নদাতৃত্ব সরাইয়া লইয়া নির্ম্মম ও হিসাবপরায়ণ মনুষ্যের হস্তে এই অন্নের ভার অর্পিত হইলেই দাসত্বানুভূতি হয়। এই অর্থে স্বাধীনতা ধনগত ও অন্নগত। দাসত্বও তদ্রূপ। এইজন্য স্বার্থের সার্ব্বজনীন আবদ্ধতা দাসত্বের উৎপত্তি করে।

নবম অধ্যায়

দাসত্ব ও বিপ্লববাদ

এ যাবৎ যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যাইবে যে, ম্লেচ্ছদেশে স্বাধীনতা নাই। মানুষ তথায় শক্তিকে স্বাধীনতা বলিয়া ভ্রম করে এবং এই ভ্রান্তিমূলে কতকগুলি স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য সমস্বার্থে একত্র হইয়া সমাজের দুর্ব্বল লোকের শোষণ-দ্বারা ভোগসুখলাভের চেষ্টা করে। ইহা দ্বারা অল্প সময়ের জন্য ভোগলাভ হয় বটে, কিন্তু একটা দাসত্বের বন্ধনই এই ভোগের মূল হয়। তারপর, এই বন্ধন ক্রমে অসহনীয় হইয়া সমাজ-বিপ্লবমূলে শক্তি ও ভোগ উভয়ই নষ্ট হয়। মানুষ যখন পরস্পরের স্বার্থ পরস্পরের নিকট বন্ধক রাখে, তখন একটা শক্তি-সঞ্চয় হয় বটে; কিন্তু ভিতরে যে স্বার্থবুদ্ধি থাকে, তাহাই ছোট বড় সকলকে দাস করিয়া তুলে। এই কারণে এই দাসত্বের জ্বালাই বিপ্লব উপস্থিত করে। বিপ্লবের মূল সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য। মানুষ একের স্বার্থ অপরের নিকট বন্ধক রাখিয়া সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করে এবং কতিপয় সম্প্রদায় লইয়া একটা জাতি নির্ম্মিত হয়। ইহার পর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী একটী সম্প্রদায় জাতির মুখপাত্র হইয়া রাজশক্তি পরিচালন করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দেশের সর্ব্বপ্রকার অন্নশক্তি এই রাজশক্তিতে কেন্দ্রীভূত করিয়া একটী সম্প্রদায়ই লোকের অন্নদাতৃ-রূপে পরিণত হয়। এইরূপে ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ও মানবের বৃত্তি-ব্যবস্থার যে সকল উপায় আছে, তাহার সমস্তই রাজশক্তিতে কেন্দ্রীভূত হইয়া রাষ্ট্র একটা রন্ধনশালাতে পরিণত হয়। এই রন্ধন-

শালা হইতে অন্নদান না হইলে, কেহ অন্নপ্রাপ্ত হয় না এবং যে সম্প্রদায়ের হস্তে কর্ত্তৃত্ব-ভার থাকে, সেই সম্প্রদায়ের অনুগ্রহ না হইলে, কাহারও অন্ন মেলে না। হইতে পারে, ইহার দ্বারা পররাষ্ট্র জয় করার একটা শক্তি জন্মে। হইতে পারে এই রাষ্ট্রশক্তির শীতল ছায়ায় অন্নপুষ্ট হইয়া বহু লোকে বিজ্ঞান-চেষ্টা দ্বারা উন্নত হয়। হইতে পারে এই রাষ্ট্রশক্তির অস্ত্রসম্ভারের প্রভাবে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইয়া জগদ্বাসী প্রাণী ভয়ে ব্যাকুল হয়; কিন্তু চিন্তা করিলে, দেখা যাইবে যে, এই রাষ্ট্রশক্তির ভিতরে যাহারা বাস করে, তাহাদের কোনও ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব থাকে না। যেখানে সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য-মূলে অন্ন-বিতরণ হয়, সেইখানে রাষ্ট্র একটী সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধিময় নির্ম্মম কঠোর যন্ত্রে পরিণত হয়। এই কঠোর যন্ত্র হইতে অন্ন পাইয়া মানুষ এমন নীচবুদ্ধিসম্পন্ন হয় যে, প্রত্যেকে তাহার জন্মগত কর্ত্তব্য ও অধিকার ভুলিয়া যায়। "আহারোপি মনুষ্যাণাং জন্মনা সহ জায়তে" এই মহাবাক্য ম্লেচ্ছদেশে নাই বলিয়া তথাকার মনুষ্যের জন্মগত অধিকার-বোধ নাই এবং এই অধিকার-বোধ না থাকা হেতু তথায় একের প্রতি অপরের সহানুভূতি-মূলক কর্ত্তব্য বুদ্ধি নাই। সকলেই মনে করে যে, সমষ্টি ব্যক্তির অন্নদাতা। কিন্তু সমষ্টি এই অন্নের হিসাব রাখিতে সক্ষম হয় না বলিয়াই তথায় বেকার-সমস্যা হয়। তারপর, এই বেকার-সমস্যাই ইহাদিগকে বহুভাষী করিয়া তুলে। এই বহুভাষা-মূলে আজ তাহাদের Feudalism, কাল তাহাদের Capitalism, পরশু তাহাদের Communism—কখনও ইহারা স্থিরচিত্ত নহে। এই অস্থিরচিত্ততা লইয়া ইহারা অন্নসমস্যার প্রকৃত মীমাংসা কোথায়, তাহা বুঝিতে পারে না এবং কেবল ভোগের লালসা লইয়া জড়শক্তির সাধনা করে। এই জড়শক্তির সাধনাই জড়-বিজ্ঞানের উৎপত্তি ঘটাইয়া ইহাদের দৃষ্টি কামনার প্রসারণের দিকে লইয়া

যায়। তারপর, কামনার প্রসারণবুদ্ধিমূলক এক আদর্শবাদ তাহাদের সাম্প্রদায়িক দাসত্বের মূল হয়। অতএব ইহাদের ফিলজফিই ইহাদের দাসত্বের জনক। এই কারণে এই অধ্যায় ইহাদের ফিলজফির একটা সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রদত্ত হইল। নিম্নে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, আমরা কামনা (Desires)-মূলেই কর্ম্ম করি। এই সকল কামনার যত সম্প্রসারণ (Multiplication of desires) হয়, ততই সভ্যতার বৃদ্ধি হয়। সুতরাং ভোগবুদ্ধির যে এইখান হইতেই আরম্ভ হয়, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সংসার কিছু একজনকে লইয়া নির্ম্মিত হয় নাই। এইজন্য একের ভোগে অপরে বাধা দেয় এবং তজ্জন্য পরস্পর একটা আপোষে মীমাংসার (Compromise) কারণ হয়। এইরূপ আপোষ-মীমাংসাতে উভয় পক্ষই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া যে ভোগ-সামঞ্জস্য করিয়া লয়, তাহার নাম আইন ও শৃঙ্খলা (Law and order). অতএব দেখা যায়, যে ভোগবুদ্ধিতেও ত্যাগস্বীকার না থাকিলে, জগৎবাসের উপযোগী থাকে না। কিন্তু এই ত্যাগস্বীকারের বিশেষত্ব এই যে, সংঘর্ষণ না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগবুদ্ধি কখনও ত্যাগস্বীকার করে না। সুতরাং এই ত্যাগস্বীকার পরাজয়-স্বীকারের নামান্তর।

যে ক্ষেত্রে ত্যাগস্বীকার না করিলে, যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া রক্তপাতের আশঙ্কা হয় অথবা যে ক্ষেত্রে রক্তপাত আরম্ভ হইয়া সর্ব্বনাশের কারণ হয়, সেই ক্ষেত্রেই এই আপোষমূলক ত্যাগস্বীকার হইয়া আইন ও শৃঙ্খলার সৃজন হয় এবং যতদিন ভোগবুদ্ধি এই আইন ও শৃঙ্খলাকে সম্ভ্রম করিয়া চলে, ততদিন একটা বাহিরের পশুশক্তির ভীতিই তাহার এই সম্ভ্রমকে স্থায়ী রাখে। এই ভীতি দূর হইলেই, আবার ইহা আইন

লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করে। এই কারণে ভোগবুদ্ধিতে আইন-শৃঙ্খলা কখনও আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হয় না। ঔষধের প্রতি রোগীর যেমন শ্রদ্ধা থাকে, ইহার প্রতিও লোকের তেমনই শ্রদ্ধা থাকে।

সুতরাং ভোগবুদ্ধির চরম পরিণতি সর্ব্বপ্রকার আইনকে অমান্য করা। এই আইন অমান্যের ভাব প্রথমতঃ চুরি, পরদারগমন প্রভৃতি তস্করতার প্রসারণ দ্বারা লুক্কায়িতভাবে সমাজে স্থায়ী থাকে এবং ইহার পর যখন সমাজে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা-বৃদ্ধি হয়, তখনই তাহারা দলসংগ্রহ করিয়া বল সঞ্চয় করিতে থাকে। ইহার পর যুদ্ধ ও বিপ্লবে কিছুদিনের জন্য নূতন প্রকার রফা-নিষ্পত্তি হয় ও তাহাতে নূতন আইন প্রণীত হইয়া নূতন শান্তি স্থাপিত হয়।

তামসিক সাহিত্যের বীর

এই আইন ও শান্তির ভিত্তি সমাজের অনিচ্ছাকৃত ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় বিপ্লবান্তে যে আইন প্রণীত হয়, তাহও পুনরায় আইন-অমান্যের বীজ লইয়াই কার্য্যারম্ভ করে এবং তন্মূলে পুনরায় রক্তপাত ও বিপ্লবে যাইয়া ইহা পরিণামপ্রাপ্ত হয়।

অতএব দেখা যায় যে, ভোগবুদ্ধি অনিচ্ছাকৃত ত্যাগমূলে কিছুকাল সৃষ্টিরক্ষা করে বটে ; কিন্তু এই রক্ষা বিনাশেরই নিদানভূত হয়। কেবল যে এই বুদ্ধি পরিণামে রক্তপাত ও নরহত্যার কারণ হয়, তাহা নহে, প্রথম হইতেই ইহা অসন্তোষ ও অশান্তির কারণ লইয়া আরব্ধ হয়। ইহাতে গোপনে আইন অমান্য করিতে কেহ দ্বিধা বোধ করে না। গুপ্তভাবে আইন-অমান্যকারীর সংখ্যাধিক্য-প্রযুক্ত এইরূপ সমাজে আইন-অমান্য করাই বাস্তবজীবনের (Reality) লক্ষণ হইয়া উঠে এবং জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে সর্ব্বদা আইনবিরোধী কার্য্যের প্ররোচনাই চলিতে থাকে।

এই প্ররোচনার ফলে মানুষের মন তাহাকে একদিকে টানে এবং আইন নিয়ম তাহাকে অপর দিকে টানে। উভয়ের টানে প্রত্যেকের জীবন ভারবহ ও দুর্ব্বিসহ হয় এবং শাসনকার্য্য দুরূহ ও জটিল হইয়া পড়ে। এইরূপে অশান্তি, রক্তপাত ও বিপ্লব লইয়া ভোগবুদ্ধিপরায়ণ সমাজ মানবকে আর বিশ্রাম দিতে পারে না এবং অনবরত সংঘর্ষণ ও অশান্তির দরুণ জীবিকা-নির্ব্বাহ পর্য্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। যুদ্ধ-বিগ্রহ দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দেয় এবং শস্যোৎপাদনাদি অবশ্যকরণীয় কর্ম্ম বন্ধ হইয়া পৃথিবী বিরল-শস্য ও বিরল-প্রাণী হইয়া ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। গত ইউরোপীয় যুদ্ধের পর বলশেভিজ্‌ম্ সৃজিত হইয়া জগৎকে পুনরায় যে রণসজ্জায় সজ্জিত করিতেছে, তাহাতে প্রত্যেকেই শঙ্কিত হইতেছে যে, পুনরায় যদি আর এক যুদ্ধ হয় তাহা হইলে জগতে মনুষ্য-সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যাইবে। এই অবস্থায় যে ভোগবুদ্ধিতে জগৎ চলিতেছে, তাহাতে ইহা যে অতি সত্বরই খণ্ড প্রলয়ের দিকে যাইবে, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই অনুমান করিতে পারেন। তোমার বাড়ীতে যদি আত্মকলহের সম্ভাবনা জন্মে, তাহা হইলে অপর দশজন এই কলহ-নিবারণক্রমে মোকদ্দমা ও রক্তপাত নিবারণ করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু তাহাতে মোকদ্দমা নিবারিত হয় না। এইরূপে যুদ্ধের কারণ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই আজ League of Nations গঠিত হইয়াছে। অন্যথা, তাহা হইত না। কিন্তু কেহই মনে করে না যে, ইহাতে যুদ্ধ নিবারিত হইবে। যাহারা ইহার আশা করে, তাহাদের বৃথা আশা অকস্মাৎ ভ্রান্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভোগপ্রবৃত্তিমূলে যে আইন প্রণীত হয় তাহা সমাজের কৃত্রিম ত্যাগমূলে প্রণীত হওয়ায় একটা কৃত্রিম শান্তি আনয়ন করে। এইরূপ ক্ষেত্রে আইন-নিয়ম রক্ষা করাও একটা কৃত্রিম

পদার্থ (Convention) বলিয়া মনে হইয়া একটা অবাস্তব পদার্থে পরিণত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, আইন-অমান্যকারী জীবনই বাস্তব জীবন (Real life)-এ পরিণত হইয়া, তাহা এমন একটা সৌন্দর্য্য বিকাশ করে যে, লোক তাহার প্রতি সর্ব্বদা আকৃষ্ট হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, এইরূপ আইন অনুসরণ করাই বাস্তবতা, কি ইহা পরিহার করাই বাস্তবতা। যদি ইহা অনুসরণ করিয়া চলা যায়, তাহা হইলে জীবন একটা কৃত্রিম শাস্তির ভিতরে গঠিত হইয়া ইহার উন্নতিশীলতা নষ্ট হইয়া যায়। আর যদি ইহার বিরুদ্ধে চলা যায়, তাহা হইলে তাহাতে শক্তিমানের সহিত যুদ্ধ হইয়া মৃত্যুর কারণ হয়। কিন্তু তথাপি এই মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া একদল লোক ইহার বিরুদ্ধে চলিতে থাকে। এইরূপ আইনের অনুসরণ ও পরিহার উভয়বিধ ব্যাপার অলক্ষিতে চলিয়া জগত মৃত্যুর দিকে চলিতে থাকে। ফলতঃ, যাঁহারা এই প্রকার আইন অনুসরণ ও পরিহার করাকে বাস্তব জীবন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, ইহার ভিতরে প্রকৃত বাস্তবতা (Reality) কিছুই নাই। ইহা একটা সৃষ্টিনাশিনী বাস্তবতা মাত্র। মৃত্যুতে যে বাস্তবতা আছে, ইহাতেও সেই বাস্তবতা আছে। কিন্তু যাহারা জীবন চাহে, তাহাদের পক্ষে ইহার আইন মান্য করা যেমন অবাস্তব, ইহার আইনকে অমান্য করাও তেমনি অবাস্তব। কারণ উভয়ই মানবকে মৃত্যুর পথে লইয়া যায়।

পাশ্চাত্য ফিলজফি ইহার মূল। পাশ্চাত্য জগৎ যদিও স্বীকার করেন যে, আমরা কামনামূলে কর্ম্ম করি, তথাপি এই কামনাগুলি কোথা হইতে আসিল, তাহার অনুসন্ধান পাশ্চাত্য জগৎ এ যাবৎ করেন নাই। তথায় সাধারণতঃ বলা হয় যে, স্বভাব হইতে কামনার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এই স্বভাব (Nature) কোথা হইতে আসিল, তাহার বিচার

তথায় হয় নাই। কামনামূলে যদি আমরা কর্ম্ম করি এবং কামনাও যদি স্বভাবমূলক হয়, তাহা হইলে কর্ম্মমাত্রই স্বভাবজাত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে দোষগুণের আরোপ করার কিছুই থাকে না। এই অবস্থায় বিদ্রোহিতা নামক কর্ম্মের দোষ কোথায়, তাহা পাশ্চাত্য ফিলজফি বুঝাইতে পারিতেছে না। তথায় কেবল এই মাত্র বলা হয় যে, আইন ও শৃঙ্খলা (Law and order) ইহাতে থাকে না। কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে মানব বাধ্য কেন, ইহার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ এযাবৎ পাশ্চাত্য জগৎ দিতে পারেন নাই। তথায় নীতিকে (Morality) প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে সকল মতবাদের প্রচার হইয়াছে, তন্মধ্যে আদর্শবাদ (Idealism) আজকাল একশ্রেণীর লোক গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই আদর্শ কি, তাহা পরিষ্কার করা হয় নাই এবং মানব তাহা বুঝিতে ও ধরিতে পারে না। ফলে, যে ব্যক্তি যত দূর বুঝে, তত দূরই তাহার আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ আদর্শ ব্যক্তিকে বাধ্য করিতে পারে বটে, কিন্তু সমাজকে বাধ্য করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, বিবেকবাদ (Intuitionalism) নামক অপর মতবাদও এইরূপ। ইহাতে ব্যক্তি তাহার বিবেক দ্বারা বাধ্য হইলেও, সমাজের ইহাতে বাধ্য হওয়ার কারণ নাই।

তৃতীয়তঃ, যুক্তিবাদ (Rationalism) নামক অপর মতবাদ সমাজকে বাধ্য করিবার কোন কারণ নাই। একের যুক্তির সহিত অপরের মিল থাকে না এবং একের যুক্তি দ্বারা অপরে বাধ্য হয় না।

চতুর্থতঃ, সুখান্বেষবাদ (Hedonism) নামক আর এক প্রকার মতবাদও ব্যক্তি ব্যতীত সমাজকে বাধ্য করিতে সক্ষম হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তি এক কার্য্যদ্বারা সুখ অনুভব করে না, কাজেই সুখান্বেষবাদমূলে আইন হইতে পারে না।

এইরূপে সমস্ত মতবাদই সমষ্টির পক্ষে অপ্রযুজ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার আইন-প্রণয়ন কার্য্যে এখন সুবিধাবাদ (Expediency) নামক একটী মতবাদ গৃহীত হইয়াছে। এই মতবাদ অধিকাংশের সুখান্বেষণবাদ (Utilitarianism) ও ক্রমোন্নতিবাদের (Evolution) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতে কৌশলে বাধা অতিক্রম করাকেই সমাজের উন্নতিকর বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

এই মতানুসারেই অদ্য পর্য্যন্ত আধুনিক সকল দেশের আইন প্রণীত হয়। এই সুবিধাবাদ নীতিটী যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইহা কেবল জনশক্তির ভিত্তির উপর একটা অনিশ্চিত পুরুষার্থ-বাদ লইয়া দণ্ডায়মান। প্রথমতঃ, একটা কৃত্রিম উপায়ে জনশক্তির কতিপয় প্রতিনিধি নিযুক্ত হয় এবং এই প্রতিনিধিগণের অধিকাংশের যাহাতে মত হয়, তাহার পশ্চাতেই একটা জনশক্তি আছে বলিয়া অনুমিত হইয়া সেই মতানুযায়ী আইন-কানুন প্রণীত হয় এবং তদ্দ্বারাই অপরকে বাধ্য করা হয়। কিন্তু মানবের বাসনারাশি (desires) তাহাতে প্রবোধ মানে না। বরং এই জনশক্তির বাহুবলের প্রভাবে নিজকে অন্যায় রকমে পর্য্যুদস্ত দেখিয়া আত্মাবমাননা অনুভব করে। বিভিন্ন মনুষ্যের বুদ্ধি ও রুচি বিভিন্ন প্রকার। এই বৈষম্যের মধ্যে একটা কৃত্রিম সাম্য আনয়ন পূর্ব্বক প্রতিনিধি মনোনীত করার প্রথা থাকায়, সাধারণতঃ যাহারা অর্থশালী ও প্ররোচনা-কার্য্যে পটু, তাহারাই প্রতিনিধি হয় এবং প্রতিনিধি-পদে নির্ব্বাচিত হইয়া পরে নিজ নিজ-মূর্ত্তি প্রকাশ করে। তখন নিয়োগকারিগণ বুঝিতে পারে যে, তাহারা কেবল ধনবলের নিকটই পরাজিত হইয়াছে। এই আত্মাবমাননা দুই প্রকার বিদ্রোহিতা সৃজন করিয়া সমাজে অশান্তি সৃজন করে এবং তাহাই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। এই দুই প্রকার বিদ্রোহিতার এক দৃষ্টান্ত আইন-

অমান্য-আন্দোলন এবং অপর দৃষ্টান্ত বাস্তবতা মূলক সাহিত্যের ভিতর দিয়া সর্ব্ব প্রকার নিয়ম-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে আন্দোলন। অবশ্য আইন-অমান্য-আন্দোলনটী সুবিধাবাদ নীতির একটা তীব্র প্রতিবাদ। সুবিধাবাদ-নীতি বাহুবলের আশ্রয় করিয়া জনমতের অবমাননা করিতেছে বলিয়া আইন-অমান্য দ্বারা ইহাতে তীব্র প্রতিবাদ হইতেছে। এই প্রতিবাদের ভিতর একটা সত্যানুসন্ধিৎসা আছে, সন্দেহ নাই। কেন না, ইহা দ্বারা আইনকর্ত্তাকে আত্মশোধনের জন্য চেষ্টা করিতে বলা হইতেছে। এই জন্য ইহা বিদ্রোহ দূর করার একটা চেষ্টা বটে। তথাপি ইহাতে বিদ্রোহ দূর হইতেছে না কেন, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ যেমন বুঝেন না, আন্দোলনকারিগণও তেমন বুঝেন না। প্রকৃত কথা এই যে, যতটুকু তাঁহারা অস্বীকার করেন, ততটুকুই সত্য; কিন্তু যাহা তাঁহারা প্রস্তাব করেন, তাহা অসত্য। দেশ ত নিষেধ-বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের নিষেধ-বিধি স্পষ্ট, কিন্তু বিধি অস্পষ্ট। তাঁহারা মনে করেন যে, দেশের প্রতিনিধিগণের হস্তে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পিত হইলেই মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। কিন্তু দেশবাসীই যে দেশের প্রতিনিধি হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। কোন মনুষ্যই ভগবান হইতে কোন দেশে বাস বা আধিপত্য করার জন্য পাট্টা লইয়া আসে নাই। এইজন্য যোগ্যতা থাকিলে, আমিও ইংলণ্ডে আধিপত্য করিতে পারি এবং যোগ্যতা থাকিলে, ইংরাজও এই দেশে আধিপত্য করিতে পারেন। বিশেষতঃ, মুসলমান এই দেশবাসী। তাহার স্বার্থের সামঞ্জস্য না করিয়া, আজকাল সকলে যাহাকে স্বাধীনতা বলেন, তাহা কিরূপে হইবে, তাহা বুঝা যায় না। পাশ্চাত্য জগতে যাহারা এক জাতি বলিয়া পরিচিত, তাহাদের স্বার্থের সামঞ্জস্য যখন সুবিধাবাদ-নীতিতে হইতেছে না, তখন বহুজাতিপূর্ণ একটা মহাদেশের মধ্যে সুবিধাবাদ-

নীতিতে স্বার্থের সামঞ্জস্য হওয়া অসম্ভব। গবর্ণমেণ্টও এই কথা বলেন। স্বীকার করি, গবর্ণমেণ্টের এই কথা বলার উদ্দেশ্য আছে ও থাকিতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্য-মূলেও সত্য কথা বলিলে, তাহা অগ্রাহ্য করা যায় না। তারপর, দেশের প্রতিনিধিগণও মানুষ। তাঁহারা ভুল করিলে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইতে পারে, এই কথা আন্দোলনকারিগণ বুঝেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, ইহা অপরিহার্য্য। কিন্তু ইহা যদি অপরিহার্য্য হয়, তবে violence এবং বিপ্লবও অপরিহার্য্য। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যদি বলেন যে, এত কাল যাহাদের শাসন-সংরক্ষণ আমরা শান্তিতে সম্পাদন করিয়া আসিয়াছি, তাহাদিগকে আমরা বিপ্লবের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া যাইব না। ইহাতে ইহাদেরও ক্ষতি, আমাদেরও ক্ষতি। আমাদের লাভ থাকিলে, না হয় আমরা ইহাতে স্বীকৃত হইতাম। কিন্তু তাহা যখন নাই, তখন আমরা একবার আমাদের পূর্ব্বাবস্থা আনিতে চেষ্টা করিব। আমরা বুঝিয়াছি, এরূপ ক্ষেত্রে বাহুবলের প্রাধান্য ব্যতীত অন্য কোনও প্রাধান্য হইতে পারে না। সুতরাং সেই বল এইখানে প্রয়োগ করিব।

গবর্ণমেণ্ট এই উত্তর দিলে, সুবিধাবাদীদের পক্ষে পাল্টা বাহু-বল-প্রদর্শন ও ভীতি-উৎপাদন ও অরাজকতা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাই বলিতেছিলাম, পাশ্চাত্য ফিলজফির সুবিধাবাদ-নীতিই জগতের বিদ্রোহিতা ও অশান্তির মূল।

বিরাগের উপর সংসার দাঁড়ায় না। অনুরাগের ভিত্তির উপর সংসার প্রতিষ্ঠিত। এই অবস্থায় কেবল বিরাগের বশবর্ত্তী হইয়া আইন অমান্য করিলে, মানিবার যোগ্য আইন কোথায় পাইব, এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। অবশ্য আইন-অমান্যকারিগণ বলিতেছেন যে—হে আইনকর্ত্তৃগণ! তোমরা এই দেশবাসী নহ, তোমাদিগকে আমরা আইন করিতে দিব না। কিন্তু এই কথার কোনও অর্থ নাই। একটা দেশে বাস করিলেই কিছু

সেই দেশের প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা হয় না এবং আমাদের ঋষিগণের ন্যায় চরিত্রবিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি যদি ভিন্ন দেশবাসীও হন, তাহা হইলে কেবল ভিন্ন দেশবাসী বলিয়াই তিনি প্রতিনিধিত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন না। ভিতরের কথা এই যে, আইন নিরপেক্ষতায় অদোষস্পর্শী হইলে এবং তদ্রূপ নিরপেক্ষ ব্যক্তি ইহার পরিচালক হইলে, আইনকর্ত্তা ও পরিচালক কোন দেশবাসী, সেই প্রশ্ন আলোচনার অযোগ্য। কিন্তু দুঃখ এই যে, এইরূপ দোষস্পর্শশূন্য মনুষ্য দেশেও পাওয়া যায় না, বিদেশেও পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় আমার দেশবাসী আইন করিবে, তোমরা করিতে পারিবে না, এই কথার মূল্য নাই। মানুষের মূল্য তাহার পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। যদি এই দেশবাসী মনুষ্যসমষ্টি কখনও একই পুরুষার্থে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই পুরুষার্থকে লক্ষ্য করিয়া চলিবার জন্য অপরদেশবাসী ভিন্ন পুরুষার্থবাদী মনুষ্যগণকে বলে যে, তোমরা এখান হইতে সরিয়া যাও, তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এক নহে, তাহা হইলে কথাটা কতক যুক্তিসঙ্গত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও, বক্তৃগণের পুরুষার্থ এমন হওয়া চাই, যাহা পৃথিবীর সর্ব্ব মানবের পক্ষে কল্যাণদায়ক হয়। পুরুষার্থটী এমন হওয়া চাই, যাহাকে অবলম্বন করিয়া তুমি বলিতে পার যে, তুমি সরিয়া গেলে তোমার আমার উভয়েরই যুগপৎ উন্নতি হইবে।

বস্তুতঃ, একটী সর্ব্বজনীন কল্যাণকর পুরুষার্থ লইয়া জগতের কল্যাণের জন্য কোনও কথা বলিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রবোধ পায়। অন্যথা যদি প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, ইহার উন্নতিতে আমার অবনতি, তাহা হইলে কেহই অপরকে উন্নত হইতে দেয় না। জীবের বাসের জন্য বিধাতা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই অবস্থায় একটী কুকুরকেও কোনও দেশে বাস করিতে নিষেধ করার কাহারও অধিকার নাই। তারপর, যোগ্যতা

থাকিলে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপর আধিপত্য করিবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার উপর আধিপত্য করার যোগ্য বলিয়া অহঙ্কার করে, তাহার যেমন আইন করার অধিকার থাকে না, তেমনই আমার স্বদেশবাসী কেহ যদি এরূপ অহঙ্কারী হয়, তবে তাঁহারও আইন করার অধিকার থাকে না। অনিচ্ছাকৃত ত্যাগমূলক আইনের কর্ত্তা বলিয়া যদি বিদেশীর আইন মান্য করিতে তুমি পশ্চাৎপদ হও, তাহা হইলে তোমাকে বুঝাইতে হইবে যে, তুমি যে আইন করিতে চাও, তাহা স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগমূলক। ইহা না দেখান পর্য্যন্ত তাহাকে পদচ্যুত করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তোমার বর্ত্তে না। বলিতে পার যে, ইহা আকাশকুসুম ; বলিতে পার যে, এইরূপ পুরুষার্থ জগতে নাই। কিন্তু এমন দৃঢ়ভাবে কথা বলিলে, নিজের অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে। পক্ষান্তরে, আইন-অমান্যের অধিকারও বর্ত্তিবে না। এদিকে আইন-অমান্য-দ্বারা যে হিংসার বীজ রোপিত হইল, তাহা দেশের মর্ম্মে মর্ম্মে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া দেশকে দুর্ব্বল করিবে।

সুবিধাবাদ-নীতি যতদিন আছে, ততদিন সর্ব্বদেশেই এই শ্রেণীর বিদ্রোহিতা অনিবার্য্য। বস্তুতঃ, আইন মানিতে মানবের বাধ্য-বাধকতা কোথায়, তাহা আজিকালিকার-শাসনশক্তি বুঝাইয়া দিতে পারিতেছেন না। এইজন্য আন্দোলনকারিগণ পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে ভ্রান্তপথে চলিতেছেন। বিদ্রোহিতা সুবিধাবাদ নীতিরই ফল। মানুষ যখন দেখে যে, রাজশক্তিও একটা সুবিধাবাদ নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, তখন তাহার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবেও সুবিধাবাদ-নীতি অবলম্বন করা স্বাভাবিক। কিন্তু আইন-প্রণয়নকালে যে সুবিধাবাদ-নীতি ত্যাগবুদ্ধি আনয়ন করে, ব্যক্তিগত কার্য্যে সেই নীতি তাহা আনিতে পারে না। কারণ, আইন-প্রণয়নকালে বহু লোকের স্বার্থের সংঘর্ষণ হওয়ায়, ত্যাগের

আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়; পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত কার্য্যে কামনারাশি এই ত্যাগবুদ্ধি আনয়ন করে না। তখন মনে হয় যে, আইন বলবানের আধিপত্য-স্থাপনের যন্ত্র মাত্র। যে স্থলে তাঁহার সুবিধার জন্য তিনি আইন করিতে পারেন সেই স্থলে আমার সুবিধার জন্য আমি ইহাকে অমান্য করিব না কেন? এই ক্ষেত্রে আত্মসম্মান জ্ঞান অপেক্ষা কামনার তাড়না অধিক থাকে এবং মানুষ কামনার বশে কোনও আইন মানিতে চাহে না। আইনের ভিতরে কোনও সৌন্দর্য্য থাকে না। ইহা শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় রসশূন্য। কিন্তু কামনা জগৎকে সুন্দর করিয়া চিত্রিত করিয়া দেয়। কাজেই মানব যখন কামনার বশে কাজ করে, তখন সৌন্দর্য্যই চাহে, শুষ্ক কাষ্ঠ চাহে না। এইরূপ অবস্থায় যাহারা কাব্যে ও সাহিত্যে জগতের সৌন্দর্য্যগুলি চিত্রিত করিয়া দেয়, তাহারা গুপ্ত-ভাবে সমাজের গুরুস্থানে যাইয়া ইহাকে চালনা পূর্ব্বক সমগ্র সমাজের চরিত্র নষ্ট করিয়া দেয়। ফলে, ইহাতেই প্রকৃত বিদ্রোহিতার সৃষ্টি হইয়া সমাজে বিদ্রোহীর সংখ্যা-বৃদ্ধি হয় এবং আইন-অমান্যের পথ আরও অধিকতররূপে পরিষ্কৃত হয়। আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, ইহাদেরই দণ্ড সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। কিন্তু পাশ্চাত্য-জগৎ এই সকল সাহিত্যের উৎসাহ দিতেছেন। সুবিধাবাদ-নীতির ভিতর এমন একটা কাপুরুষতা আছে, যাহাতে ইহা দুর্ব্বলের সহিত বলবানের সম্বন্ধের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করে না। সমাজে ধনবান্ ও বলবান্ ব্যক্তি যদি কিছু আধিপত্য না পায়, তাহা হইলে সে রাজশক্তিকে সাহায্য করিতে চাহে না। কাজেই সে যাহাতে সমাজে তাহার নিজ স্বার্থ ও আধিপত্য রক্ষা করিতে পারে, রাজশক্তি তাহার সুযোগ প্রদান করেন। এই সুযোগ-প্রদান যে কৌশলে হয়, তাহার নাম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব (Representation of interest)। ইহাতে প্রত্যেককেই নিজ নিজ

স্বার্থরক্ষা করিতে বলা হয় বটে ; কিন্তু দুর্ব্বল তাহা না পারিয়া বলবানের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। তখন বলবান্ দুর্ব্বলকে কায়দায় পাইয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করে এবং বলিতে থাকে যে, তাহার এই অবস্থার কারণ তাহার অক্ষমতা। ভগবান শুক্রাচার্য্য লিখিয়াছেন :—

'অমন্ত্রমক্ষরং নাস্তি নাস্তি মূলমনৌষধম্।
অযোগ্যো পুরুষো নাস্তি যোজকস্তত্রদুর্ল্লভম্।'

অনুবাদ :—এমন অক্ষর নাই, যাহা দ্বারা মন্ত্র হয় না ; আর এমন বৃক্ষ নাই, যাহার দ্বারা ঔষধ হয় না। এইরূপে এমন পুরুষও নাই, যাহার ভিতরে কোনও প্রকার যোগ্যতা নাই ; কিন্তু কর্ম্মের সহিত পুরুষের যোজনা-কার্য্য কঠিন। এই যোজনাকারী লোকই জগতে দুর্ল্লভ।

বস্তুতঃ, জগতের রাজশক্তি এই যোজনা-কার্য্য অবগত নহেন বলিয়াই কাপুরুষতা-মূলে দুর্ব্বলকে সবলের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া সমাজকে রাজনীতি হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছেন। বলবানের প্রভুত্ব-রক্ষাই ইহার উদ্দেশ্য এবং সুবিধার অনুসন্ধানই এই বন্দোবস্তের কারণ। ইহাতে দুর্ব্বলের স্বার্থ কিরূপে রক্ষিত হইবে, তাহা রাজশক্তি দেখিতে চাহেন না। সুবিধাবাদ মনে করে যে, দুর্ব্বল ব্যক্তি জগতে বাস করার অযোগ্য। অতএব তাহার স্বার্থরক্ষার দিকে দৃষ্টি করার কোনও কর্ত্তব্যই রাজনীতির নাই। এই যুক্তিমূলে এই নীতি সমাজকে রাজনীতি হইতে পৃথক্ করিয়া, কেবল সবলের স্বার্থরক্ষার ভার রাজহস্তে রাখিয়াছে। কিন্তু সংসারে দুর্ব্বলতা স্থায়ী পদার্থ নহে। অবস্থানুসারে মানুষ দুর্ব্বল থাকে এবং অবস্থানুসারে সে সবল হইয়া পড়ে। সুতরাং অবস্থার পরিবর্ত্তন-দ্বারা যখন দুর্ব্বল সবল হয়, তখনই সমাজে বিপ্লব সাধিত হয়। দুর্ব্বলের প্রতি এই উপেক্ষাই আইনের প্রতি মানবের শ্রদ্ধা নষ্ট করিয়া দেয় এবং তন্মূলে সে আর কোন

প্রকারের আইন মানিত চাহে না। আইনের প্রতি সার্ব্বজনীন শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার জন্য যে দুর্ব্বলের রক্ষাই সমধিক প্রয়োজন, ইহা পাশ্চাত্য জগৎ আদৌ বুঝিতে পারেন নাই ; এইজন্য সমাজ-রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক বলপ্রযুক্ত না হইয়া কেবল বলবানের স্বার্থরক্ষার জন্যই ইহার বল প্রযুক্ত হয়। রাজনীতির এই কাপুরুষতাই দুর্ব্বলের উপর বলবানের অত্যাচারের কারণ। এই অত্যাচার বলবান্‌কে কামী ও স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলে এবং এই স্বেচ্ছাচার ও কামের প্রশ্রয়-হেতু এক শ্রেণীর লোক অবাধ কাম-চরিতার্থতাকেই মানবজীবনের সারবস্তু মনে করিয়া সৌন্দর্য্যবাদের সৃজন করে।

ফলে, সৌন্দর্য্যবাদের উপর আঘাত করিলে, বলবানের উপর আঘাত পড়ার আশঙ্কায় ভীত রাজশক্তি তাহার দিকে ঘেঁষিতে চাহে না এবং ইহাতেই কখনও দুর্ব্বলের ন্যায্য সম্পত্তি অপহৃত হয়, অথবা বলবানের দ্বারা দুর্ব্বলের সুন্দরী কন্যার অপহরণ হয়। রাজশক্তি তাহাকে কোনও ফল প্রদান করিতে সক্ষম হয় না। এইরূপে নানা বিপত্তির মধ্যে পতিত হইয়া দুর্ব্বল ব্যক্তি পাঁচ জনকে ধরিয়া কান্নাকাটির দ্বারা যে স্বার্থটুকু লাভ করে, তাহাতেই তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। আর সবল ব্যক্তি আত্মশক্তিতেই তাহার চতুর্গুণ স্বার্থ লাভ করিয়া, যথেচ্ছা চলিলেও তাহার দণ্ড হয় না। কাজেই ধনী ব্যক্তি অশ্লীল সৌন্দর্য্যময়ী সাহিত্যালোচনায় সুখী হয় এবং তাহারই আশ্রয়ে থাকায় দুর্ব্বল ব্যক্তিও এই শ্রেণীর সাহিত্য লিখিয়া সমাজকে দূষিত করে।

একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই সুবিধাবাদ-নীতিতে দুর্ব্বল ব্যক্তি যে জীবনসংগ্রামে পতিত হয়, তাহাতে কিছুকাল জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের পর সে নিজ জীবনকে ভারবহ এবং দুর্ব্বিষহ মনে করিতে বাধ্য হয়। জীবনরক্ষা ও স্বার্থরক্ষার জন্য যদি প্রতিদিনই

কেবল যুদ্ধ করিয়াই যাইতে হয়, তাহা হইলে জীবন কেবল উদ্দেশ্য-বিহীন, আহার, নিদ্রা এবং মৈথুনাত্মক জীবনে পরিণত হইয়া পড়ে। তখন মনে প্রশ্ন আসে যে, ইহার কি অন্য উদ্দেশ্য নাই? যদি না থাকে তবে পশুজীবনে এবং মানবজীবনে প্রভেদ কি? এই পশুজীবনের প্রবর্ত্তনের জন্য কে প্রকৃতপক্ষে দণ্ডনীয়, তাহা সে স্থির করিতে পারে না এবং এই জন্য যখন বিপ্লবের উত্তেজনা আরব্ধ হয়, তখন পাত্রাপাত্র-বিচার-শূন্য হইয়া যাহার তাহার উপরই তাহার খড়্গাঘাত নিপতিত হয়। ইহারই নাম বিপ্লব বা অরাজকতা। সুবিধাবাদ-নীতিমূলক আইন ইহার প্রবর্ত্তক এবং বাস্তবতা-মূলক সাহিত্য ইহার ইন্ধন-সরবরাহকারক।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই আইন ও সাহিত্যের ভিতরে জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করার কোনই সম্ভাবনা নাই। অন্ধকার ঘরে সর্প আছে মনে করিলে, যেমন সকল ঘরেই সর্প আছে মনে হয়, অন্ধ জনের পথচলা যেমন সর্ব্বদাই শঙ্কাজনক হয়, এই আইন ও সাহিত্যের ভিতর বাস করা মানবের পক্ষে তদ্রূপ শঙ্কাজনক। ইহাতে জীবন বিষময় হয় এবং জীবনই মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হয়।

মহাভারত বলিতেছেন:—

"উচ্ছিদ্যতে ধর্ম্মবৃত্তমধর্ম্মো বর্ত্ততে মহান্।
ভয়ামাহুর্দিবারাত্রং যদা পাপো ন বার্য্যতে॥"

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব—৯০ অধ্যায় ৮ম শ্লোক।

অনুবাদ:—পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, মানবগণের যখন পাপ নিবারিত না হয়, তখন তাহাদের ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইয়া অধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয় এবং দিবারাত্র ভয় হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ, রাষ্ট্রকে রন্ধনশালায় পরিণত করিয়া, ইহাকে সকল মনুষ্যের অন্নের মালিক করিয়া দিলে, কতক লোক অন্ন পায় এবং কতক লোক বেকার হইয়া ফিরে, অল্প কতিপয় লোক অন্ন-প্রাচুর্য্য ও ভোগ-প্রাচুর্য্যের মধ্যে থাকিয়া অপরকে শোষণ করিতে থাকে এবং অধিকাংশ লোক এই শোষণের ফলে "নিত্য ভিক্ষা তনু-রক্ষা" নীতিতে জীবন কাটাইতে বাধ্য হয়। ইহাতেই বিপ্লববাদের প্রশ্রয় হইয়া দেশে দেশে একটা ভয়ের রাজত্ব (Terrorism) প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্ত্তমান আদর্শবাদ এই ভয়ের রাজত্বের মূলে (Reign of terror)। ইহা মানুষকে কাম-লক্ষ্যে চালাইয়া দেয় এবং এক এক মানুষের ভিতরে এক একটী কামনা প্রবল হইয়া বহু-কথার ভিতরে সমাজকে জ্ঞানহারা করে। এই জ্ঞানহারা অবস্থাই মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া সমাজে ভয়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

———

দশম অধ্যায়।

"পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ"

আজকাল আধিপত্যসম্পন্ন জগতে ফেসিজম্ ও কমিউনিজম্ নামক দুইটি মতবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কমিউনিজ্‌মের জনপ্রিয়তার কারণ এই যে, ইহা সাম্যবাদমূলে ধনের যথাযোগ্য বণ্টন করিয়া মানবের পীড়া দূর করার গৌরব করে এবং ফেসিজমের জনপ্রিয়তার কারণ এই যে, ইহা লঘু-গুরু-জ্ঞানমূলে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করিয়া ধনাহরণ দ্বারা জাতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার গৌরব করে। বলা বাহুল্য যে, উভয় নীতিই মানববুদ্ধি-প্রসূত অর্থাৎ কতিপয় বুদ্ধিমান্ মনুষ্য-কর্ত্তৃক প্রেরিত। ম্লেচ্ছদেশ চিরকালই এইরূপ নানাপ্রকারে প্রেরিত নীতিমূলে চলিয়া আসিতেছে এবং যদিও এক এক সময়ে এই সকল নীতির এক একটী নাম হয়, তথাপি এই নীতিগুলি যথাক্রমে সাম্যবাদ ও লঘুগুরু-জ্ঞানের তারতম্য দেখাইয়া একবার সাম্যবাদের এবং একবার লঘুগুরু-জ্ঞানের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। এইরূপ বিচারে দেখা যাইবে যে, পূর্ব্বকালে যাহা ফিউডেলিজম্ নামে অভিহিত হইত, তাহাই রূপান্তরিত ও কালোপযোগী হইয়া, এবং দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এখন সাম্রাজ্যবাদ ও ফেসিজম্ নাম ধারণ করিয়াছে। ফরাসীবিপ্লবে যে সাম্যবাদ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া জগৎকে মোহিত করিয়াছিল, তাহাই আজ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া কমিউনিজম্ নামে পরিচিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) ও ফেসিজমের উদ্দেশ্য জাতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি এবং কমিউনিজমের উদ্দেশ্য আভ্যন্তরীণ পরপীড়ার নিবারণ-

দ্বারা জাতীয় উন্নতি। কিন্তু কাজের বেলায় উভয় নীতিই দারুণ পরপীড়াপ্রদ। ফেসিজমের পরপীড়াপ্রবৃত্তি আবিসিনিয়া-লুণ্ঠনে ও অসীম রণসম্ভার-সংগ্রহে যেমন প্রতীত হয়, তেমনই কমিউনিজমের পরপীড়া-প্রবৃত্তি ধনিকগণের প্রতি ব্যবহার দ্বারা প্রমাণিত হয়। সকলেই জানেন যে, ইহাতে সমষ্টি ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি লুপ্ত করিয়া তাহা সমষ্টির সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছে এবং সমষ্টিই ব্যক্তির গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মানবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করার অধিকার সমষ্টির কোথায় ও ইহাকে দস্যুতা বলিব না কেন? পরের প্রতি দায়িত্ববোধের গুরুতর অভাব না থাকিলে, মানুষ একযোগে এইরূপ কার্য্য কখনই করিতে পারে না। অনেকে মনে করেন যে, সমগ্র জাতির পরদুঃখকাতরতা হইতে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভুল। ইহা রাগ-দ্বেষের ফল। ধনীর প্রতি বিদ্বেষের ফলে দরিদ্রের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ধনীর সুখবিলাস ও নৃশংসতা তাহার প্রতি দ্বেষের জাগরণ করিয়াছে। এই দ্বেষ হইতে তমোগুণের উৎপত্তি হইয়া যে পরস্ব-লুণ্ঠন প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, তাহা হইতেই পরদুঃখকাতরতা পর্য্যন্ত দস্যু-বুদ্ধিতে পরিণত হইয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সৃষ্টি করিয়াছে। অন্যথা, জনমত একত্র হইয়া কখনও ধনিকগণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত না এবং জার-পরিবারকে সমূলে ধ্বংস করিত না।

এদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজম্ যেমন জাতির প্রতি সহানুভূতি-বশতঃ ইহার উন্নতির জন্য ব্যস্ত, তেমনই ইহা লোভ-হেতু জগতের কৃষ্ণ-বর্ণ ও পীতবর্ণ জাতির প্রতি সহানুভূতি-শূন্য। লোভ ইহার মূল। ইহার দ্বারা স্বজাতিপ্রেম একটা নৃশংসতার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, আবিসিনিয়া যখন আক্রান্ত হইল, তখন

জাতিসঙ্ঘ নিজের স্বার্থহানির আশঙ্কা করিয়া ইটালীর বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমন কি, আবিসিনিয়ার সম্রাট্‌কেও আশ্বস্ত করিলেন। কিন্তু যখন ইটালীর ব্যবহার দ্বারা বুঝা গেল যে, আঘাত না পাইলে তাহার জাতিসঙ্ঘকে আক্রমণ করার অভিপ্রায় নাই; পক্ষান্তরে আঘাত পাইলে, সে একটা জগদ্ব্যাপী যুদ্ধ বাধাইয়া বসিবে, তখন জাতিসঙ্ঘ পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি ও সত্য ভুলিয়া হাবসী জাতিকে অবাধে ভূলুণ্ঠিত হইতে দিল। যুক্তি হইল "আত্মানং সততং রক্ষেৎ"—কিন্তু এই আত্মরক্ষার যুক্তিতে যে সত্য-ধর্ম্ম সমস্ত বিসর্জ্জিত হইল এবং একটা কাপুরুষোচিত হীনতা প্রকাশিত হইয়া জাতির অভ্যুত্থান অবনতির দিকে চলিল, তাহার প্রতি এই রাজনৈতিক পণ্ডিতগণের আদৌ দৃষ্টি রহিল না। এই কারণেই শুক্রনীতি বলিয়াছেন যে, মানুষ যখন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে, তখন সে অবিবেকী হইয়া উঠে। দুর্ব্বলের রক্ষাই রাজধর্ম্ম। এই অবস্থায় দুর্ব্বল যখন প্রবল রাজশক্তিসমূহের উপর নির্ভর করিয়া নিজেকে নিরাপদ্ মনে করিতে পারে না, তখন তাহার শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যায় এবং বলবান্ হইতে পারিলে, এই নপুংসক রাজশক্তিকে ধ্বংস করিয়া দেয়। লোভ ও নিজস্ব হারাইবার ভয় এই নপুংসকত্বের মূল। কমিউনিজম্ দুর্ব্বলের এই দুঃখ দূর করার নিমিত্তই মানুষের পরধন শোষণ করার প্রবৃত্তিকে সংযত করার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু লোভ এই চেষ্টাকে প্রতিহত করে। মানুষের পরস্ব-লুণ্ঠন-বুদ্ধি যদি প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে জগতের তহবিলকে সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করিলেও, তহবিল-রক্ষক নানা উপায়ে ঐ তহবিল তছরূপ করিবে এবং সকলকে পীড়া প্রদান করিবে। কমিউনিষ্ট রুশিয়াতে এই কারণে অনবরত দলাদলি ও রক্তপাত হইতেছে। অন্যথা, রুশিয়াতে মতভেদ ও দলাদলির আর কোনও কারণ থাকিত না। প্রকৃত কথা

এই যে, জগতের বিষয়রাশি মানবের একচেটিয়া নহে। সমস্ত জীবই এইগুলি ভোগ করার অধিকারী। জীবের এই অধিকার রক্ষার জন্যই বিধাতা আমাদের হৃদয়ে মায়ামমতা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ দিয়াছেন। মানবহৃদয়ে এই সকল গুণ থাকায় জীবজন্তুকে আহার দিতে তাহার রুচি হয়। বিষয়গুলিকে যখন সে সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া মনে করে, তখন জীবজন্তুকে আহার দেওয়া দূরের কথা, মানুষকে আহার দেওয়ার সময়ও তাহার হিসাব আসিয়া পড়ে। এই কারণে তাহার দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ শুষ্ক হইয়া যায়। দেখ, তুমি টাকা কর্জ্জ করিতে যাইয়া যদি ব্যক্তি-বিশেষের নিকট হইতে কর্জ্জ কর, তাহা হইলে বিপদ সময়ে তাহার নিকট হইতে একটু কৃপাও লাভ করিতে পার। কিন্তু Loan কোম্পানী হইতে তাহা পাও না। কারণ লোন কোম্পানী সাধারণের সম্পত্তি। ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি কতকগুলি কামকল্পিত নিয়মে বাঁধা। এইরূপ কাম-কল্পিত নিয়মে যখন রাজ্যগুলি বদ্ধ হইয়া যায়, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করে যে, আমি public servant. ইহাতে ব্যক্তিগত দয়াদাক্ষিণ্য-প্রদর্শনের অধিকার আমার নাই। ফলে মানুষটী লৌহাদি জড় বস্তু-নির্ম্মিত যন্ত্রে পরিণত হয়। তাহার ব্যক্তিগত দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ-গুলিকে বিকশিত করার আর কোনও সুযোগই হয় না। তারপর এই যান্ত্রিক অভ্যাস তাহাকে দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণশূন্য করিয়া ফেলে। ফলে সমগ্র জগৎ মানবের এই যান্ত্রিক অবস্থার চাপে প্রপীড়িত হইয়া পড়ে এবং সাধারণতঃ যাহাকে রক্তসূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ কাগজাতের শাসনপ্রণালী (Red tapeism) বলা হয়, তাহার প্রভাবে মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া যায়। আজকাল যাঁহারা অভিজ্ঞতা-মূলে বর্ত্তমান জগতের শাসনপ্রণালী ও ইহার রক্ত-সূত্রে আবদ্ধ কাগজ রক্ষার প্রণালী অবগত নহেন, তাঁহাদের নিমিত্ত কথাটার একটু ব্যাখ্যা এখানে আবশ্যক। সাধারণতঃ সরকারী অফিসের

রক্ষিত কাগজগুলি স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রভাবে বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র রক্তসূত্রে আবদ্ধ হয়। এই আবদ্ধ কাগজাতের নাম ফাইল। প্রত্যেকটী ফাইল স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বিষয়ে বিভক্ত থাকায়, নূতন বিষয় উপস্থিত হইলেই একটী নূতন ফাইল আরম্ভ হইয়া তাহা হইতে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া হয়। এই ক্রিয়াতে এত বিলম্ব হয় যে, তাহা সর্ব্বদাই পীড়াকর হইয়া উঠে। আবার অনেক সময় হাস্যাস্পদও হয়। এই সম্বন্ধে আমাদের দেশের এক জমিদার-বাড়ীর একটী গল্প আছে। গল্পটী এই :—

এই দেশের কোনও এক জমিদার-বাড়ীতে এক অতিথিশালা ছিল। প্রাচীন কর্ত্তাদের আমলে এই অতিথিশালায় যিনি আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তিনিই আহার পাইতেন। ইহাতে কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না এবং অতিথি আসিলে অতিথিশালার প্রধান কর্ম্মচারী নিজ দায়িত্বে তাঁহাকে খাওয়াইতেন। কিন্তু কালক্রমে সাবেক কর্ত্তার মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র B. L. পাশ করিয়া আসিয়া পিতার গদিতে বসিলেন এবং সর্ব্বপ্রথমেই দেবার্চ্চনা ও অতিথিশালার ব্যয়সঙ্কোচে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে নিয়ম হইল যে, managerএর আদেশ ব্যতীত কোন অতিথি খাইতে পারিবে না। ইতিমধ্যে একদিন সেখানে জনৈক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতি প্রত্যূষে তিনি আসিয়া যখন অতিথিশালায় দেখা দিলেন, তখন অতিথিশালার প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে managerএর আদেশ লইয়া আসিতে পাঠাইলেন। Manager প্রাতে ১১ ঘটিকার পূর্ব্বে অফিসে আসেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণ ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত অফিসে বসিয়া রহিলেন। তারপর manager বাবু আসিলে দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তখানা manager বাবুর দস্তখৎ হইয়া ফাইলভুক্ত হইতে একঘণ্টা গেল। তাহার পর ইহাতে আদেশ হইল যে, এই ব্যক্তি এখানে কাহারও

পরিচিত কি না এবং ইনি প্রকৃত অতিথি কিম্বা বঞ্চনা করিয়া খাইতে আসিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া report দেওয়া হউক। বলা বাহুল্য যে, এই বিষয়ে অনুসন্ধান হইয়া নোট হইতে বেলা ১টা বাজিল। বেলা দেড় ঘটিকার সময় আদেশ হইল যে, এই ব্যক্তিকে মধ্যাহ্নের আহার দেওয়া হউক। এই কালমধ্যে ব্রাহ্মণের পিত্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি বাহিরে আসিয়া কাগজখানি একটী সূতার দ্বারা তাঁহার লাঠির অগ্রভাগে বাঁধিলেন এবং লাঠিটি উপরদিকে তুলিয়া কাগজখানা আকাশে ঘুরাইতে লাগিলেন। এমন সময় অফিসের কতিপয় আমলা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনার ইহা কিরূপ ব্যবহার ? আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া এক বেলা আহার করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সেই আদেশকে আপনি এরূপ অবজ্ঞা করিতেছেন কেন ? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন যে, মহাশয় আমি কখনও আদেশ অবজ্ঞা করি না। আমার সন্দেহ হইয়াছে যে, অতিথিশালায় যাইয়া আহার পাইব কি না। এক বেলা আহার দিতে যখন আপনাদের এতগুলি দস্তখৎ লাগিল, তখন হয়ত স্বর্গীয় কর্ত্তাদেরও এক একটা দস্তখতের আবশ্যকতা হইতে পারে। 'এইজন্য কাগজখানা আকাশে ঘুরাইতেছি। যদি তাঁহারা দয়া করিয়া আসিয়া দস্তখত করিয়া যান।

ইহা যদিও একটী হাস্যরসাত্মক গল্প, তথাপি ইহার দ্বারা বর্ত্তমান জগতের কেন্দ্রীভূত শাসনপ্রণালীর একটী পরিচয় পাওয়া যায়। শোভিয়েট ব্যবস্থাতে যদিও তাড়াতাড়ি কাজ হওয়ার ব্যবস্থা আছে বলিয়া শুনা যায়, তথাপি যদি দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যাপারের জন্য প্রত্যেককে এইরূপ এক একটা শোভিয়েটের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে, প্রত্যেক মনুষ্যকে যে ব্যক্তিগতভাবে কত লাঞ্ছনাভোগ

করিতে হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যাইতে পারে না। এই লাঞ্ছনার কারণ এই যে, বর্ত্তমান যান্ত্রিক ব্যবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষও নিজের দয়াদাক্ষিণ্য দেখাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন না। প্রত্যেকেরই এক একটা ব্যক্তিগত দায়িত্ব থাকে এবং এই দায়িত্ব এড়াইবার জন্য তাহাদিগকে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কেন্দ্রীভূত শাসন-প্রণালীর ভিতরে দুষ্টের দুষ্টবুদ্ধির ক্রিয়া নানারূপে হইয়া বঞ্চনার অসংখ্য সুযোগ থাকে। এই কারণে দায়িত্বশীল কর্ম্মচারীমাত্রেরই সাবধান হওয়ার প্রয়োজন হয়। এই সাবধানতার প্রণালী পাত্রভেদে নানারূপ হইয়া শাসনপ্রণালী এমন জটিল হইয়া উঠে যে, যাহারা এই শাসন-প্রণালীর ভিতরে থাকে, তাহারা তদ্দ্বারা অসহ্য জ্বালা অনুভব করে। এই জ্বালা দূর করার শক্তি কেন্দ্রীভূত শাসনপ্রণালীর হয় না। বস্তুতঃ, যে সমাজব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থায় মানুষের দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণ স্ফুরিত হইতে পারে না, তাহা সমাজব্যবস্থাপদবাচ্য নহে। মানবের দুঃখ দূর করার জন্যই বিধাতা আমাদের ভিতরে ন্যায়নিষ্ঠা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণ দিয়াছেন। এই সকল গুণের স্ফুরণদ্বারাই মানবের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। কিন্তু এই কেন্দ্রীভূত শাসনপ্রণালীর দ্বারা এই সকল গুণের স্ফুরণ হয় না। এই কারণে আজ কাল সমগ্র মানবসমাজ কেবল ব্যক্তিগত দয়াদাক্ষিণ্য-প্রদর্শনের সুযোগাভাবেই পীড়িত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, জগতের বিষয়রাশি যদি সাধারণের সম্পত্তি হইয়া পড়ে, তাহা হইলে মানুষ দয়াদাক্ষিণ্য-প্রদর্শনের সুযোগ আর আদৌ পাইবে না। উহাতে জগৎ যে পীড়াপ্রাপ্ত হইবে, তাহা সাধারণ পীড়া নহে। শীতার্দ্দিত দেশের শীতপীড়া এবং গ্রীষ্মার্দ্দিত দেশের গ্রীষ্মপীড়ার ন্যায় ইহা সার্ব্বজনীন হইয়া উঠিবে। এই কারণেই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ লোক বুঝিতে পারে না যে, তাহাদের দেশের লোক যে দলাদলি করে, তাহার

মূল কোথায়? আজকাল শোভিয়েট রুশিয়াতে যে সকল মতভেদ লইয়া নেতৃত্ব-বিরোধ জন্মিতেছে, তাহার মূল এইখানে। এক সময় জগতে পুরুষকে খোজা করিয়া রাজান্তঃপুরে রাখার ব্যবস্থা ছিল। যে দেশের বিষয়গুলি সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়া দেশের শাসন-প্রণালীর সহিত ব্যক্তিগত জীবনও হৃদয়হীন রক্তসূত্রগ্রন্থিবদ্ধ কাগজাতের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া যায়, সেই দেশের মনুষ্যত্ব খোজা হইয়া যায়। পরমপিতা পরমেশ্বর সর্ব্বজীবের রক্ষার জন্য মানবহৃদয়ে যে দয়া দিয়াছেন, সেই দয়া যেখানে কাগজের বন্ধনে ও নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ, সেইখানে কেবল মনুষ্যত্বের অভাবেই সমাজ দুর্ব্বল ও পঙ্গু হওয়ার কারণ হয়।

এই সকল কারণে গঠন-পরিবর্ত্তন দ্বারা সমাজ কখনও লাভবান হয় না। সমাজের দোষ দেখিয়া ঐ দোষ-সংশোধনের জন্য যতই তুমি ইহার গঠন-পরিবর্ত্তন করিবে, ততই মানুষটী মনুষ্যত্ববিহীন যন্ত্রে পরিণত হইবে। এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা সমস্ত জাতিকে দাসের জাতিতে পরিণত করে। এই কারণে রাজা-প্রজা উভয়েই দাস। কারণ, ইহারা উভয়েই চরিত্রহীন। চরিত্রহীনতা মানুষকে একের নিকট অপরকে আবদ্ধ করে। সাম্যবাদ ও তজ্জনিত জীবনসংগ্রামবুদ্ধি মানুষকে পশুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল করে এবং এই উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার বন্ধনের কারণ হয়। এই জগতে যন্ত্র ব্যতীত কোনও বন্ধন হয় না। দড়ি দিয়া যদি কোনও গরুকে বাঁধ, তাহা হইলে তাহাও একটা যন্ত্রের ন্যায় হইয়া যাইবে। তারপর মানুষকে যদি হাতকড়ি দাও, তাহা হইলে তাহাও একটী যন্ত্র হইবে। এইরূপে এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা মানবের একটী বন্ধন-যন্ত্র। ইহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া অধিকাংশ লোকই দুঃখ পায়। যাহারা সুখী হয়, তাহারাও এই বন্ধনের ভিতরেই থাকিয়া দুঃখকে সুখ বলিয়া জ্ঞান করে।

তারপর যখন প্রতিক্রিয়া হইয়া বিপ্লব হয়, তখন এই সুখই তাহাদের দুঃখপ্রদ হয়।

এইরূপে কামের দাসত্ব সুখকে দুঃখে পরিণত করিয়া অজ্ঞানতারূপ পাপের দণ্ডপ্রদান করে। ম্লেচ্ছদেশের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাই কামের দাসত্বমূলক। এইজন্য তথায় দুঃখ দূর হইয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তথায় জীবকে অপূর্ব্ব মনে করিয়া সমষ্টি যে আদর্শ কল্পনা করে, তাহারই অনুসরণ করিতে ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়। এই বাধ্যবাধকতা অন্নের বন্ধনমূলে হওয়ায়, প্রত্যেকে এমন একটা অন্নগত দাসত্বে আবদ্ধ থাকে যে, রাজা-প্রজা কাহারও এই দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় থাকে না। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কমিউনিজম্ মানুষের পরধন-শোষণ-প্রবৃত্তিকে প্রশমিত করার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করার চেষ্টা করে। কিন্তু এইখানে ভ্রান্তি এই যে, এই নীতির প্রেরকগণ পরধন-শোষণ করার প্রবৃত্তির মূল কোথায়, তাহা দেখেন না। বস্তুতঃ, ইহার মূল মানব-প্রকৃতিতে। প্রকৃতিতে কামনামক যে পদার্থ আছে, তাহাই লোভনামে প্রকটিত হইয়া পরধন-শোষণ করে। ব্যক্তিভেদে এই লোভের মাত্রাধিক্য ও মাত্রাল্পতা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদিও লোভ প্রত্যেক ব্যক্তিতেই অল্পাধিক পরিমাণে আছে, তথাপি যাহার ভিতরে ইহার পরিমাণ অল্প, সে অল্প ধনে সন্তুষ্ট হয় এবং কেবল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, তাহার পরধন-শোষণ-প্রবৃত্তি আদৌ নাই। এই অবস্থায় লোভ-দমন ও পরধন-শোষণ-প্রবৃত্তি এককথা নহে। যাহার শোষণ-প্রবৃত্তি নাই, সে ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারাই ভগবদ্বিশ্বাস-মূলে লোভ-দমন করিতে পারে। এইরূপে যাহার শোষণ-প্রবৃত্তি আছে, তাহার শোষণ-প্রবৃত্তি-দমনজন্য সমাজগত চেষ্টা আবশ্যক। এই চেষ্টায় দেখা যায় যে, লোভদমনে সক্ষম ও এই

বিষয়ে অক্ষম হিসাবে মানুষ দুই প্রকার। সমাজতন্ত্রবাদ এই দুই শ্রেণীর হিসাব না রাখিয়া প্রত্যেকেরই শোষণপ্রবৃত্তি আছে বলিয়া কল্পনা করেন এবং এই কল্পনা-মূলে প্রত্যেককে সমাজের চাপ দিয়া শোধন করার চেষ্টা করেন। ইহাতে যিনি স্বল্পধনে স্বভাবতঃ তুষ্ট থাকেন, তিনি স্বীয় প্রকৃতির গতিরোধ হেতু একটা গুরুতর পীড়ানুভব করেন। আমি যেখানে ৪ বিঘা ভূমি পাইয়া স্বাধীনভাবে থাকিতে পারিলেই সন্তুষ্ট, সেইখানে যদি আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকে এবং আমাকে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যোগ্যতা দেখাইয়া স্বীয় জীবিকা লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে একটা দাসত্বের অনুভূতি আসিয়া আমার জীবনকে দুর্ব্বিসহ করিয়া উঠায়। ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে, জীবনধারণের জন্য যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্ন থাকিতে পারে না। জীব জন্মগ্রহণ করা মাত্রই আহার পাইয়া জীবনধারণের যোগ্য। এই অবস্থায় কি পরিমাণ পাইয়া আমি জীবনধারণ করিব, তাহা নির্ণয় করার অধিকার অপরের নাই। আমি অপরকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করি কি না—এই বিষয় মাত্র দেখিবার অধিকার সমাজের আছে। অতএব আমি যদি কেবল জীবনধারণের উপযোগী ৪ বিঘা ভূমি পাইয়া সন্তুষ্ট থাকি, তাহা হইলে এই ৪ বিঘা হইতে আমাকে বঞ্চিত করার তুমি কে? বস্তুতঃ, সমাজতন্ত্রবাদ তাহার পরধন-শোষণ-সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া দুষ্টদমন-ব্যপদেশে শিষ্টদমন করার চেষ্টা করেন এবং তাহাতেই সমাজে একটা দাসত্ব স্থাপিত হইয়া ইহার জ্বালামূলে সমাজ-বিপ্লব হয়। এদিকে আমাদের শাস্ত্রকার এ বিষয়ে অন্য সমাধান করিয়া, যাঁহাদের পরধন-শোষণ করার প্রবৃত্তি নাই, তাঁহাদিগকে ত্রৈবর্ণিক ও যাঁহাদের এই প্রবৃত্তি আছে, তাঁহাদিগকে শূদ্রনামে অভিহিত করতঃ জাতিভেদ করিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত

বিবরণ অপর এক খণ্ডে প্রদত্ত হইবে। তবে এইখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মনুষ্যগণমধ্যে যিনি স্বভাবতঃ নির্লোভ এবং আমি অধিক ভোগ করিলে অপরে কষ্ট পাইবে, এই চিন্তা করিয়া ভগবানের সেবাতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতঃ ত্যাগাত্মকভাবে অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকেন, সেই মহাপুরুষই ব্রাহ্মণ। ইহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করার অধিকার সমাজের থাকা দূরে থাকুক, সমাজের প্রত্যেক মনুষ্য ইহার আদেশবাহী ভৃত্য হওয়ার যোগ্য। ইহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা করিলে ব্যক্তিগত দয়াদাক্ষিণ্যের স্ফুরণ হইয়া এই দৃষ্টান্তে সমাজের দুঃখ দূর হইয়া থাকে। এই ব্রাহ্মণ যিশুখৃষ্ট ও মহম্মদ প্রভৃতি আচার্য্যরূপে ম্লেচ্ছদেশে সময় সময় জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তথাকার সমাজ ইঁহাদের উপরই হস্তক্ষেপ করতঃ পুনঃ পুনঃ পাপসঞ্চয় করে। তারপর এই পাপ হইতেই তথায় বিপ্লব হইয়া একের কণ্ঠ অপরে ছেদন করে। বস্তুতঃ, লোভ এই সাধুনিগ্রহের মূল এবং লোভকেই আমাদের শাস্ত্রকার শূদ্রত্বরূপে ধর্ম্মপরিপন্থী জ্ঞান করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, মনু এই কৃষ্ণমৃগক্ষুরচিহ্নিত পবিত্র ভূমিভাগকে যজ্ঞভূমিনামে অভিহিত করিয়া জগতের অবশিষ্ট ভূমিভাগকে ম্লেচ্ছদেশনামে অভিহিত করিয়াছেন। যখন ম্লেচ্ছদেশের মনুষ্যগণ বিপ্লবক্লান্ত হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মাহাত্ম্য অনুভব করেন, তখনই ইঁহাদের অনেকের ম্লেচ্ছত্ব দূর হইয়া জগতে শান্তিস্থাপিত হয়। অন্যথা লোভ হেতু তাঁহারা জগৎকে ব্যাকুল করিয়া উঠান। মনু এই একটী শ্লোকে মাত্র ম্লেচ্ছশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যথা আর সর্ব্বত্র ইঁহাদিগকে শূদ্রসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক-খণ্ডে প্রদর্শিত হইবে যে, শূদ্রত্ব দুই প্রকার (১) আশ্রিত শূদ্রত্ব (২) অনাশ্রিত শূদ্রত্ব। যাঁহারা নিজের লোভনামক রিপুকে পরাজয়

করা উদ্দেশ্যে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা আশ্রিত শূদ্র। আর যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ পালন করেন না—তাঁহারা অনাশ্রিত শূদ্র। এই অনাশ্রিত শূদ্রগণই ম্লেচ্ছনামে পরিচিত। ঐতিহাসিক-খণ্ডে প্রদর্শিত হইবে যে, আমাদের ঋষিগণ ম্লেচ্ছদেশের আচার-ব্যবহার সমস্ত জানিতেন এবং তথাকার সমাজনীতি সাধু মহাত্মাগণের পক্ষে পীড়াপ্রদ বলিয়া অনুভব করতঃ বলিয়াছেন :—

ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেন্নাধার্ম্মিকজনাবৃতে।
ন পাষণ্ডিগণাক্রান্তে নোপসৃষ্টেঽন্ত্যজৈর্নৃভিঃ॥

মনু ৪র্থ অধ্যায় ৬১ শ্লোক

অনুবাদ :—শূদ্র যে দেশের রাজা, যে দেশ অধার্ম্মিক লোকে অন্তর্বাহ্য পরিবৃত, যে দেশ বেদবহির্ভূত চিহ্নধারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত অর্থাৎ যাহাতে ইহারা বসতি করে এবং যে দেশ অন্ত্যজ ম্লেচ্ছজাতি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা উপদ্রুত হয়, সেই দেশে বাস করিবে না।

এই শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন—

মন্ত্রীসেনাপতিদণ্ডকারিকাদ্যাঃ সপ্তপ্রকৃতয়ো রাজ্যং।
যত্র সর্ব্বাঃ শূদ্রজাতীয়াঃ তত্র নিবাসনিষেধোঽয়ম্॥

অনুবাদ :—মন্ত্রী সেনাপতি ধর্ম্মাধিকরণের অধিপতি এবং প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী লইয়া সপ্তপ্রকৃতিবিশিষ্ট রাষ্ট্রকে রাজ্য বলা যায়। যেখানে ইহারা সকলেই অনাশ্রিত শূদ্র সেইখানে সাধুপীড়ার সম্ভাবনা থাকা হেতু তথায় ত্রৈবর্ণিকের বাস নিষিদ্ধ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যিশু-মহম্মদের পীড়া দ্বারা ম্লেচ্ছদেশে সাধু-পীড়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহার পর ইংলণ্ডে রাণী মেরীর সময় খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণের সজীব-দাহন, অষ্টম হেনরীর সময়ের পণ্ডিত-নির্য্যাতন ও বর্ত্তমান কালে রুশিয়া ও স্পেনে ধর্ম্মযাজক হত্যা ও নির্য্যাতন ম্লেচ্ছ-

দেশে সাধুপীড়ার দৃষ্টান্ত। এইখানে প্রশ্ন এই যে, তথায় এই সাধুপীড়ার কারণ কি? ইহার কারণ মনুর ৮ম অধ্যায়ে পরিষ্কার হইয়াছে। যথা:—

যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্ম্মবিবেচনং।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥

মনু ৮ম অধ্যায় ২১ শ্লোক।

অনুবাদ:—যে রাজ্যে শূদ্র ধর্ম্মনির্ণয় করে, সেই রাজ্যের প্রজা অধর্ম্মরূপ পঙ্কে পতিত হইয়া পঙ্কে পতিত গাভীর ন্যায় আত্মত্রাণে অশক্ত ও নিমগ্ন হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ, শূদ্ররাজ্যে কোনও কালেই রাজনীতি, সমাজনীতি ও পারিবারিক নীতির সহিত ধর্ম্মের সংস্রব নাই। তথায় ধর্ম্ম ব্যক্তিগত এবং অবসরসময়ে আলোচ্য। এইজন্য বৈষয়িক আদর্শমূলক বহু-কথার হিড়িকে পড়িয়া এই সকল রাজ্য কখনও ফিউডেলিজ্‌ম্ কখনও কমিউনিজ্‌ম্ এবং কখনও ফেসিজম্ গ্রহণ করে। তারপর এই পরিবর্ত্তন ও যুদ্ধবিগ্রহ উপলক্ষে সাধুপীড়া হয়। কেহই শান্তিতে ধর্ম্মজীবনযাপন করিতে পারে না। পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাসে দেখা যাইবে যে; ইহা যদিও অনবরত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতেছে, তথাপি কোনও পরিবর্ত্তনই ইহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। গ্রীস দেশের এথিনিয়ান সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং রোমান-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ছিল আইন ও শৃঙ্খলা। যে দিন খৃষ্টধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইল, সেই দিন হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতা স্বার্থের সহযোগিতা-মূলে একটা সাম্যবাদ প্রচারিত করিতে লাগিল। সুতরাং তখন হইতে সাম্যবাদ পাশ্চাত্য সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়া অদ্য পর্য্যন্ত ইহা এই সভ্যতার অঙ্গের ভূষণ রহিয়াছে। তারপর খৃষ্টধর্ম্মের যৌবনসময়ে (middle ages) এই সাম্যবাদ খৃষ্টজগতে একতা-প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে

পবিত্র রোমসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত হইল। খৃষ্টানগণ জানিতেন যে, সেই রোমসাম্রাজ্য এখন আর নাই—কিন্তু তাঁহারা ভাবিলেন যে, রোমের আইন ও শৃঙ্খলাকে খৃষ্ট-ধর্ম্মের পবিত্র ভাবের সহিত মিলাইলে ইহা পবিত্র হইয়া উঠিবে এবং এই পবিত্রতার ছায়াতলে এক অভূতপূর্ব্ব নূতন সাম্রাজ্য গঠিত হইয়া খৃষ্টজগৎকে এক-প্রাণতা প্রদান করিবে। এককথায় বলিতে গেলে, এইখানে একাধারে রোমের শৃঙ্খলার সহিত খৃষ্টান-সাম্যবাদের মিশ্রণে এক নূতন একপ্রাণতা-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইল। কিন্তু ফল তাহাতে কিছু হইল না। সাম্যবাদের সহিত শৃঙ্খলার সামঞ্জস্য হইল না।

ইহার পর ইউরোপের রাজমণ্ডলে ভারকেন্দ্র রক্ষা দ্বারা এক নূতন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইল এবং সকলে মৈত্রীমূলে পরস্পর পরস্পরের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য যত্নবান হইল। কিন্তু দুর্ব্বলের উপর বলবানের অত্যাচার ইহার মেরুদণ্ড ভগ্ন করিয়া দিল। তখন দেখা গেল যে, রাজ-মণ্ডলীর ভাবকেন্দ্র রক্ষার ভিতরে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা নাই। কেন না, ইহাতে বাহিরের আবরণ রক্ষিত হইলেও অত্যাচারের জ্বালা নিবারিত হয় না। পরন্তু প্রত্যেক রাজ্যের ভিতরে দুর্ব্বল বলবান কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে থাকে।

এই প্রদাহ-নিবারণের জন্য ফরাসীবিপ্লব মানবের জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া দেশের রক্তে দেশকে রঞ্জিত করিতে শিক্ষা দিল এবং এই শিক্ষা যদিও জ্ঞানের প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত হইল, তথাপি ইহা যেন জ্ঞানের অভাবেই জ্ঞানহীনভাবে নির্ব্বাপিত হইয়া বর্ত্তমান জগতের জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিল।

বলা বাহুল্য যে, আজকাল এই জগতে জাতীয়তার পালা গাইতে সকলেই আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার দোষ এই যে, ইহাতে জগতে

বাহুবলের দাবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক জাতি অপর জাতিকে পীড়ন করিতেছে এবং এই দৃষ্টান্ত-অবলম্বনে প্রত্যেক ব্যক্তিই অপর ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করতঃ ধনবলের দাবীতে (capitalism) স্বীয় ভ্রাতাকে পর্য্যন্ত অন্নদাস করিয়া রাখিয়াছে।

এইরূপে ফরাসীবিপ্লব মানবের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা ইহাতে প্রতিহত হইয়া ব্যক্তি এখন অধিকতররূপে সমাজের দাস হওয়ার উপক্রম করিয়াছে এবং সমাজতন্ত্রবাদ যতই সামাজিক সাম্যবাদমূলে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের চেষ্টা করিতেছেন, ততই ব্যক্তির অস্তিত্ব সমাজের অস্তিত্বে ডুবিয়া যাইয়া ব্যক্তির অন্তরের জ্বালা দ্বিগুণতররূপে বর্দ্ধিত হইতেছে। যে মুহূর্ত্তে তুমি একটী রাজশক্তির উপর সমাজনিয়মনের ভার অর্পণ করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ তোমার ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া উঠিবে। ইহাই জ্বালার সর্ব্বপ্রধান কারণ। এইখানে তুমি বলিতে পার যে, এই রাজকর্ম্মচারিগণ আমাদেরই ভৃত্য। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখ, আমরা কে? সমাজযন্ত্রের ভিতরে যাঁহারা কোনও উপায় বা কৌশল-অবলম্বনে অধিকাংশ লোককে স্বমতাবলম্বী করিতে পারেন, তাঁহাদের মতকেই তোমরা "আমার মত" এই কথা বলিতে বাধ্য হও। কিন্তু ইহারা কি স্বার্থসম্বন্ধ শূন্য? কখনই নহে। তারপর স্বার্থসম্বন্ধ থাকুক, আর না থাকুক, ইহারা সর্ব্বদাই ভ্রমপ্রমাদপরায়ণ। এইরূপ একটী মনুষ্য-সমষ্টির মতানুসরণই সাম্প্রদায়িক মতানুসরণ। প্রথমতঃ উপায়ান্তর না দেখিয়াই মানুষ স্বেচ্ছায় অপরের মতকে নিজের মত বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু কিছুকাল পরে প্রত্যেকে বুঝিতে পারে যে, ইহারা বঞ্চনা দ্বারা আমাদিগকে নিজ-স্বার্থবুদ্ধির অনুগত দাসে পরিণত করিয়াছে। তখন অন্তরে যে জ্বালা উপস্থিত হয়, তাহা অসহনীয়। ইহার জ্বালা অনুভব করিয়াই মানুষ অনবরত

বিপ্লবপরায়ণ থাকে এবং দুরাশার বশীভূত হইয়া পুনরায় আর এক দল লোকের মতানুসরণ করে। ফলে কম্বল ছাড়াইতে যাইয়া পুনরায় কম্বলের বেষ্টনেই আবদ্ধ হয়। প্রজাতন্ত্রবাদের মৌলিক দোষটা এইরূপে সমাজতন্ত্রবাদকে আচ্ছন্ন করিয়া ব্যক্তিকে সর্ব্ববিষয়ে সমষ্টির দাস করে এবং সেই জ্বালা সে অনন্তকাল অনুভব করিতে থাকে। আজ সেই জ্বালা জগদ্ব্যাপী হইয়া ইহাকে জ্বর-রোগীর ন্যায় অনবরত তৃষ্ণাতুর করিয়া রাখিয়াছে। বিপ্লবের পর বিপ্লব আসিতেছে, কিন্তু বিপ্লব নিরাকরণের কোন পথ হইতেছে না। পিপাসার পর জ্বালা বা অন্য কোনও পরিবর্ত্তন হইলেও যেমন জ্বর ছাড়ে না, তেমন এই বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন-রাশি দ্বারা অশান্তির নিবৃত্তি হয় না। বরং জ্বরও এক সময় ছাড়িয়া যায়, কিন্তু বিপ্লবের আর শান্তি হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক বিপ্লবের পর যে পরিবর্ত্তন আসিতেছে, তাহাও বিপ্লবাত্মকই বটে। এই অবস্থায় এই সকল পরিবর্ত্তনের কোন মূল্য নাই। পরিবর্ত্তন-গুলি নিতান্ত একঘেঁয়ে এবং একই মূল হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়। এই সকল পরিবর্ত্তনে সুখের লেশমাত্র থাকে না,—কেবল অতৃপ্ত তৃষ্ণা এবং অনন্ত দুঃখরাশি ও রক্তপাত ইহাদের লক্ষণ। কাম, ক্রোধাদির ক্রিয়া দ্বারা, এই সকল উপাদানেই ইহারা নির্ম্মিত এবং দুঃখ ব্যতীত ইহাদের অন্য কোন ফল হয় না। তাই বলিতেছিলাম যে, ইহারা পরিবর্ত্তনহীন পরিবর্ত্তন। সমাজের উপর কামক্রোধের এই অবাধ ক্রিয়া সংযত হইয়া যে পর্য্যন্ত ইহাতে ভিন্ন উপাদানঘটিত একটি পরিবর্ত্তন না হয়, সেই পর্য্যন্ত ইহাদের একঘেঁয়ে দোষ দূর হইতে পারে না। এতদিন বিপ্লবের এক ঘেঁয়ে দোষ কেহ ধরিতে পারে নাই। কারণ বিপ্লব তখন জগদ্ব্যাপী হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে বিপ্লব জগদ্ব্যাপী হইয়া মানুষকে বুঝাইয়া দিতেছে যে, জগতের এই অবস্থা—ইহার স্থিতির

নিতান্ত প্রতিকূল। হয়ত ইহার এই অবস্থা চলিলে, একটী যুদ্ধ দ্বারাই, বর্ত্তমান সভ্যতা চূর্ণ হইয়া যাইবে। আর যুদ্ধ না হইলেও, এই অশান্তির ভিতর জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ অসম্ভব। ইহার বেকারসমস্যার সমাধান হইতেছে না, অধিকাংশের দুঃখের নিবৃত্তি হইতেছে না। প্রতি পদে মানুষ মানুষের শত্রু। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। তারপর এখন আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা অসম্ভব। শাসনকর্ত্তার প্রাণসংশয়, বিচারকের প্রাণসংশয়। কাজেই বিপ্লববাদ জগৎকে অচল করিয়া দিয়াছে। বিবেকের নির্য্যাতন ও অবিবেকী দুর্জ্জনের প্রশ্রয় ইহার কারণ। বিবেকের প্রাধান্য ও দুর্জ্জনের দমন না হওয়া পর্য্যন্ত এই রোগের শান্তি নাই। সমাজ আজ যেমন অচল, কালও তেমন অচলই থাকিবে। এই অচল অবস্থার দরুণই আজ এই সভ্য-জগৎ পঙ্কে পতিত গরু। ইহার এক পদ উঠাইতে গেলেই আর এক পদ পঙ্কে ডুবিয়া যায়। এই অবস্থায় যদি তুমি পাশ্চাত্য সভ্যতা চাও, তবে ঐ পথে যাও। কিন্তু ইহাতে স্বাধীনতা পাইবে না। ইহাতে যতটুকু শক্তি সঞ্চিত হইবে, তাহাতে কেবল এক একটী করিয়া পদোত্তোলন করার ক্ষমতা মাত্র তোমার হইবে। তারপর এই পদ উত্তোলন করিতে গেলে তোমার অপর তিন পদ পঙ্কে ডুবিয়া যাইবে। কিন্তু এই পদোত্তোলন—গরুর পদোত্তোলন নহে। মনুষ্যের পদোত্তোলন। আবার পঙ্কও সাধারণ পঙ্ক নহে। ইহা পাপ-পঙ্ক। এই পাপ-পঙ্ক হইতে পদোত্তোলন-কার্য্য পাপের দ্বারাই হইয়া থাকে এবং যখন বিপ্লবরূপী পাপের দ্বারা এই পদোত্তোলন-কার্য্য সম্পন্ন হয়, তখন ঝড়ে যেমন বৃক্ষ পতিত হয় এবং তুফানে যেমন নৌকাডুবি হয়, তেমনই বিপ্লবের দ্বারা সাধুপীড়া হইয়া থাকে। এই বিপ্লব আবার রাজপক্ষ ও প্রজাপক্ষ উভয়ের দ্বারাই হয়। রাজা বিপ্লব-দমনের জন্য বিপ্লব করেন এবং প্রজা দাসত্বের জ্বালায় বিপ্লব করে। ইহাতেই সাধুর ধর্ম্মজীবনের ব্যাঘাত হয়।

একাদশ অধ্যায়

আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্যতার সূচনা

এ যাবৎ পাশ্চাত্য জগতে দাসত্বের অবস্থা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া অনেকেই বলিবেন যে, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট থাকিলে ইহাও বরং সহ্য করা যায়, তথাপি আজকাল আমাদের দেশে যে রাষ্ট্রীয় দাসত্ব আছে, তাহা সহ্য করা যায় না। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় অধ্যায়ে লিখিত দাসত্ব চিরকালই ম্লেচ্ছদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সাময়িকরূপে দেশ শাসন করেন এবং ধনবলে বলীয়ান থাকেন, তাঁহারা এই দাসত্ব অনুভব করেন না। এই কারণে এই দাসত্ব চিরকাল ম্লেচ্ছ-দেশে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, এক শ্রেণীর লোক ইহার অনুকূলে থাকিয়া রক্তদান করে। এই রক্তদান এক অদ্ভুত ব্যাপার। বর্ত্তমান স্পেনের বিপ্লবের দিকে চাহিয়া দেখিলেই বুঝিবে যে, ইহাতে যাহারা গভর্ণমেণ্টের পক্ষাশ্রিত তাহারাও বিদ্রোহী হইতেছে এবং বিদ্রোহিগণমধ্যেও অনেকে সরকারী-পক্ষে যাইতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, সরকারপক্ষ রক্ষণীয়, কি বিদ্রোহীপক্ষ রক্ষণীয়, তাহা ইহারা বুঝে না, অর্থাৎ দাসত্ব কোথায় রহিয়াছে, তাহা ইহারা বুঝে না। ঐ সকল দেশের যদি এই অবস্থা না থাকিত তাহা হইলে বিপ্লব কখনও সম্ভবপর হইত না। ফল কথা এই যে, এই দাসত্বে একদল সরকারের অনুকূলে থাকে এবং অপর দল ইহার প্রতিকূলে থাকিয়া যুদ্ধ করে। ইহাই এই দাসত্বের স্বভাব। এই স্বভাব এই দেশেও সংক্রামিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—

কংগ্রেস যাহাকে রাষ্ট্রীয় দাসত্ব ও জাতীয় অবমাননা বলেন, তাহা এই দেশের অনেক শিক্ষিত লোকই অনুভব করেন না। কেবল একদল ইংরাজী-শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনুষ্যগণই ইহা অনুভব করিতেছেন। ইহার কারণ এই যে, ম্লেচ্ছদেশের দাসত্বের ন্যায় এই দেশের দাসত্বও একটা প্রেরিতনীতিজনিত দাসত্ব। ইংলণ্ড হইতে যে নীতি প্রেরিত হয়, তাহার আনুকূল্য করিয়া এক শ্রেণীর লোক অসংখ্য সুখ-সুবিধা ভোগ করেন। সুতরাং তাঁহারা এই নীতির কোনও দোষ দেখেন না। আবার যাঁহারা ইহার জ্বালা অনুভব করেন, তাঁহারা দাসত্বটা কোন্‌খানে তাহা বুঝিতে পারেন না। এদিকে, শ্রমজীবী ও কৃষকগণ এবং সাধারণ ব্যবসায়ীবর্গ রাজনীতির কোন ধার ধারে না। তাহারা নিজের দুঃখকে অপরিহার্য্য জ্ঞানে ইহার প্রতি উদাসীন থাকে। সুতরাং তাহারাও এই নীতির কোনও দোষ দেখে না। যাঁহারা সজ্ঞানে ইহা দ্বারা পীড়িত হন, তাঁহারাই বস্তুতঃ ইহার দোষ দেখেন। অপর সকলে পরস্পর দোষারোপ করতঃ মামলা-মোকর্দ্দমায় ও সাংসারিক কার্য্যে দিনযাপন করে। ইহাতে একদল পীড়িত হইয়া গোলযোগ করে এবং অপর সকলে তজ্জনিত অশান্তিভোগ করে। অশান্তির ন্যায় দুঃখ নাই বলিয়া যদ্দ্বারা দেশে অশান্তি প্রেরিত হয়—তাহাকেই প্রকৃত দাসত্ব বলা যাইতে পারে। এই কারণে সর্ব্বপ্রকার প্রেরিতনীতি হইতেই দাসত্বের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ও বিজাতীয় গভর্ণমেণ্টের মধ্যে কোনও তফাৎ থাকিতে পারে, এমন কথা বুঝিবার কোনও কারণ নাই। আজ যদি শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরু কর্ত্তৃক প্রেরিত কোনও নীতিমূলে আমরা পীড়া অনুভব করি, তাহা হইলে, তাহাও দাসত্ব বলিয়াই পরিগণিত হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে প্রেরিতনীতিই সর্ব্বপ্রকার দাসত্বের মূল। কথাটা পাশ্চাত্য

জগতের সুবিধাবাদ-নীতির সমালোচনায় ইতিপূর্ব্বে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। মানব যখন কামনার প্রসারণকেই সভ্যতা বলিয়া মনে করে, সমাজে তখন সুবিধাবাদ-নীতি ব্যতীত অন্য কোনও নীতিই থাকে না। এই দুর্নীতিকেই ভগবান শুক্রাচার্য্য অনীতিনামে অভিহিত করিয়াছেন। জগতের মনুষ্য সকল এই দুর্নীতির প্রেরণায়ই বহুকথার আশ্রয়গ্রহণ করিয়া নীতি-প্রেরণক্রমে অপর সকলকে পীড়া প্রদান করে। তন্মধ্যে যাহাদের নীতিজ্ঞান আছে, তাহারা এই পীড়া অনুভব করে এবং যাহাদের ইহা নাই তাহারা ইহা অনুভব করে না। মনে করে ইহা অদৃষ্টজনিত দুঃখ।

আজ যদি এই ভারতবর্ষে এই দুর্নীতি নূতন প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে না হয় বিদেশীয়কে দোষ দিতাম, কিন্তু এই প্রেরিতনীতি কলি-যুগের প্রারম্ভ হইতেই এই দেশে প্রবেশ করিয়া ইহাকে দুর্ব্বল করিয়া-ছিল। এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়াই আলেকজাণ্ডার হইতে আরম্ভ করিয়া মহম্মদ ঘোরী পর্য্যন্ত নানা বিদেশীয় পরাক্রান্ত নরপতি এই দেশে প্রবেশ করার চেষ্টা করিয়াছেন। উল্লেখ করা বাহুল্য যে, মহম্মদ ঘোরীর পূর্ব্বে বিদেশীয়গণের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। ঠিক কোন সময়ে এই দেশে প্রেরিত-নীতি প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা বলিবার উপায় নাই। আমাদের পুরাণ ও মহাভারতকেই আমরা প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করি। কারণ এই সকল গ্রন্থ কোনওরূপ পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট নহে। কিন্তু এই সকল গ্রন্থে কলিযুগের কোনও ইতিবৃত্ত বর্ণনা নাই। এই সময়ে প্রেরিত-নীতিরূপ অধর্ম্মেরই প্রাবল্য হইবে জানিয়া মহর্ষি বেদব্যাস এই সময়ের কোনও ইতিবৃত্ত রাখার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। কেবল এই সময়ে ভারতে শূদ্ররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া উল্লেখ করতঃ নন্দবংশীয় রাজগণের নাম করিয়াছেন। ইহাতে বোধ

হয় যে, এই সময় হইতে ক্ষত্রিয় রাজ্যের অন্ত হইয়া প্রেরিত-নীতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছিল। তথাপি এই সময়েও যতটুকু ধর্ম্মনীতি অবশিষ্ট ছিল, তাহার ফলেই গ্রীক পণ্ডিত মেগাস্থিনীস্ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। যদিও ভগবান বুদ্ধদেব চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র মহারাজ অশোকের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের রাজনীতিতে কোনও প্রভাব-বিস্তার করিতে পারে নাই। কেবল অশোকের সময়েই এই ধর্ম্ম ভারতের রাজনীতিকের প্রাণস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং এই সময় হইতেই ভারতবাসী তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তে রাজপ্রেরিত-নীতি দ্বারা পরিচালিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। যথা—

The third primary duty, laid upon men, was that of truthfulness. These three guiding principles are most concisely formulated in the second minor Rock Edict, which may be quoted in full :—

'Thus saith His Majesty' :

"Father and mother must be obeyed ; similarly respect for living creatures must be enforced ; truth must be spoken. These are the virtues of the law of piety, which must be practised. Similarly, the teacher must be reverenced by the pupil and proper courtesy must be shown to relations.

This is the ancient standard of piety—this leads to length of days, and according to this men must act."

V. A. Smith—History of India.

অনুবাদ :—মানুষের প্রতি অশোকের তৃতীয় কর্ত্তব্যাদেশ ছিল, সত্যবাদিতা সম্বন্ধে। অপর দুইটী আদেশসহ, এই তৃতীয় আদেশ দ্বিতীয় শিলালিপি-স্তম্ভে লিপিবদ্ধ ছিল। ইহা নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :—

এইরূপে মহারাজ বলিতেছেন :—পিতামাতার আদেশ উপদেশ মান্য করিবে। তদ্রূপ জীবে দয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। সত্য অবশ্য বক্তব্য। সৎকর্ম্মনীতির এই তিনটি নিয়ম অবশ্য পালনীয়। শিষ্যের পক্ষে গুরুর আদেশ অবশ্য মাননীয় এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি শিষ্টাচার অবশ্য প্রদর্শনীয়। ইহাই প্রাচীন সৎকর্ম্মনীতি; ইহা দ্বারা আয়ুবৃদ্ধি হয়। মানব ইহা অবশ্য মান্য করিবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, ইহা যদি প্রাচীন সৎকর্ম্মনীতিই হয়, তবে ইহার পুনরুল্লেখ এইখানে হইল কেন? রাজা কেন এই নীতির পুনঃ প্রেরণের আবশ্যকতা অনুভব করিলেন? ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হয়ত এই সময়ে হিন্দুর নৈতিক অধঃপতন হইয়াছিল। কিন্তু মেগাস্থিনীস্ তাহা বলেন না। বৌদ্ধরাজ্যে যতটুকু নীতি ছিল, তাহা অপেক্ষা নৈতিক কোনও হীনাবস্থা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের ছিল না। সুতরাং ইহার অন্য কারণ আছে। কারণ এই যে, এই সময় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের যজ্ঞবুদ্ধিমূলক-নীতি পরিত্যক্ত হইয়া, এক নিরীশ্বর নীতি-জ্ঞান দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহাই বস্তুতঃ বৌদ্ধের সৎকর্ম্মবাদ। অশোক এই নিরীশ্বর-সৎকর্ম্মবাদই তাঁহার শাসনবাক্যদ্বারা দেশে প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ সৎকর্ম্মবাদ মানবের কামনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকায় রাজশাসনেই তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইখানে প্রশ্ন উঠে যে, রাজা-নীতির অধীন, কি নীতি রাজার অধীন? চন্দ্রগুপ্তের সময়, রাজা নীতির অধীন থাকিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে প্রজাপালন

করিতেন। আর অশোকের সময়, নীতি রাজপ্রেরিত হইয়া রাজানুশাসনে প্রজাপালন হইত। সুতরাং ইহাই প্রেরিত-নীতি; ইহাই শূদ্ররাজ্যের লক্ষণ। নন্দবংশের রাজত্বকালেই, এই লক্ষণ এইদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কেবল মহামতি চাণক্য, চন্দ্রগুপ্তের সময়ে প্রাচীন শাস্ত্রানুসরণ-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে প্রবল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও প্রাচীন-নীতিজনিত ধর্ম্মপরায়ণতার যথেষ্ট হানি হইয়াছিল। যাহা হউক, ইহা দ্বারাই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া, ক্রমে অশোককে সমগ্র ভারতের একছত্রাধিপতি করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল।

অতএব প্রেরিত-নীতি আজ এই দেশে নূতন নহে। অশোকের ন্যায় রাজার প্রেরিত-নীতি প্রশংসনীয় হইলেও, অপরাপর অনেক হিন্দু রাজার, প্রেরিত-নীতিই দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই হিসাবে আমাদের ঐতিহাসিক বিচার হয় নাই বলিয়াই, আজ আমরা ইহা বুঝিতেছি না; কিন্তু ইহা অনুমান সিদ্ধ যে, এই সকল প্রেরিতনীতিই হিন্দুর নৈতিক অধঃপতন ঘটাইয়া ভারতে মুসলমানবিজয়ের কারণ ঘটাইয়াছিল। অনেকে আজকাল কলিযুগ কাহাকে বলে তাহা বুঝে না। বস্তুতঃ, এই প্রেরিতনীতিই কলিযুগের প্রধান লক্ষণ। এই নীতিতে কখন ভাল এবং কখন মন্দ ভাবে চলিয়া, মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া, বহু কথার দিকে যায় এবং সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারে না। ম্লেচ্ছদেশের বিপ্লবে মানুষ এই কারণেই কখনও সরকারপক্ষ ও কখন বিদ্রোহীপক্ষ অবলম্বন করে। আবার আমাদের দেশে এই কারণেই, প্রেরিতনীতিমূলে মানুষের কর্ত্তব্যবুদ্ধি নষ্ট হইয়া, জাতীয়শক্তির হীনতা হইয়াছিল। নীতিশাস্ত্র বলিতেছেন:—

আচার প্রেরকো রাজা হ্যেতৎকালস্তকারণম্।
যদি কালঃ প্রমাণং হি কস্মাদ্ধর্ম্মোঽস্তিকর্ত্তৃষু॥

শুক্রনীতি ১ম অধ্যায় শ্লোক ২২

অনুবাদ :—সদাচার ও কদাচার সমস্তই রাজা কর্ত্তৃক সমাজে প্রেরিত হয় এবং তাহাতেই কালের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি কালই প্রমাণ বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তবে ধর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব থাকে কোথায়?

বস্তুতঃ কথা সত্য। যদি কালকেই প্রমাণ বলিয়া সাব্যস্ত করতঃ তুমি কালানুসারে চলিতে থাক, তাহা হইলে যদি এক সময়, রাজশক্তি কর্ত্তৃক ভ্রান্তিবশতঃ সমাজে কতগুলি কদাচার প্রবর্ত্তিত হয়, তবে তোমার কর্ত্তব্য কি? এই কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া এইখানে বলা হইয়াছে যে, এবম্বিধক্ষেত্রে, কালকে অনুসরণ করিতে হইবে না। এইরূপ করিলে ধর্ম্মের কর্ত্তব্যতারূপটী নষ্ট হইয়া যায়। অতএব আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা বর্ত্তমানে কালানুসরণ করিব কি না, এইরূপ কোনও প্রশ্নই থাকে না। তবে প্রশ্ন থাকে যে, কালকে অতিক্রম করিব কি প্রকারে? তদুত্তরে নীতিশাস্ত্র পুনরায় বলিতেছেন :—

বিনা স্বধর্ম্মান্ন সুখং স্বধর্ম্মো হি পরং তপঃ।
তপঃ স্বধর্ম্মরূপং যৎ বর্দ্ধিতং যেন বৈ সদা॥
দেবাস্তু কিঙ্করাস্তস্য কিং পুনর্ম্মনুজা ভুবি?
সুদণ্ডৈর্ধর্ম্মনিরতাঃ প্রজাঃ কুর্য্যান্মহাভয়ৈঃ॥

অনুবাদ:—স্বধর্ম্ম বিনা মানবের কখনও সুখ হয় না, কেন না, স্বধর্ম্মই পরম তপস্যা। স্বধর্ম্মরূপ তপস্যা দ্বারা মানবের উন্নতি হয় বলিয়াই, স্বধর্ম্মকে একমাত্র তপস্যা বলা হয়। ইহা দ্বারা দেবতাও মানবের কিঙ্কর হয়, মানুষ ত দূরের কথা। অতএব রাজা সুদণ্ড প্রদান দ্বারা মহৎ ভয় প্রদর্শনক্রমে প্রজাকে ধর্ম্মনিরত করিবেন।

ম্লেচ্ছরাজত্ব আমাদের নূতন নহে

বলা বাহুল্য যে, নীতিশাস্ত্রের এই উপদেশ মান্য করা স্বধর্ম্মাবলম্বী রাজার কার্য্য। কিন্তু বর্ত্তমানে এই দেশে স্বধর্ম্মাবলম্বী রাজা নাই। বরং তৎপরিবর্ত্তে দেশে ম্লেচ্ছজাতীয় রাজার সাম্রাজ্যই প্রতিষ্ঠিত আছে। শাস্ত্রে যদিও সাধুপীড়া হওয়ার আশঙ্কায়, ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করা নিষিদ্ধ, তথাপি গত ৮০০ বৎসর যাবৎ, আমরা ম্লেচ্ছরাজ্যেই বাস করিতেছি। এই অবস্থায় শাস্ত্রের এই আদেশলঙ্ঘনজনিত পাপ, আমাদের পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার সম্যক সদ্ব্যবহার কিরূপে হইতে পারে? উল্লেখ করা বাহুল্য যে, মুসলমানরাজত্বকালে এই দেশে, এই সাধুপীড়া কখনও কখনও হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে সাধু বলিতে কেবল যে, সংসারত্যাগী সাধুগণকেই বুঝাইতেছে তাহা নহে। মুখ্যভাবে এই শব্দ দ্বারা, স্বধর্ম্মপালনকারী গৃহীগণ এবং ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থাদি আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণকেই বুঝায়। তারপর গৌণার্থে, ত্যাগী সন্ন্যাসীগণকেই বুঝায়। আশ্রমধর্ম্ম লুপ্ত হওয়ার পর, গৌণার্থ ই উজ্জ্বল হইয়া মুখ্যার্থ মলিন হইয়া গিয়াছে। মুসলমান রাজত্বে আশ্রমধর্ম্ম না থাকিলেও, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস নামক দুইটী আশ্রম, যাহা কলির প্রাবল্য সময়ে চতুরাশ্রমের পরিবর্ত্তে তন্ত্রশাস্ত্র কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহা ছিল এবং এই দুইটী আশ্রমে অবস্থিত স্বধর্ম্ম-পালনকারী মনুষ্যগণের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। এই সময় মুসলমান রাজাগণের ধর্ম্ম নষ্ট করার প্রবৃত্তি প্রবল থাকায়, এই সাধুগণ পীড়িত হইতেন এবং তজ্জন্য স্বধর্ম্মাবলম্বীগণের পক্ষে, প্রাণ দিয়া মুসলমান-সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য চেষ্টিত হওয়ারও কারণ হইয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের বর্ত্তমান রাজার অধিকার কালে, রাজপক্ষ হইতে

সাধুপীড়ার কোনও চেষ্টা নাই এবং যদিও সিপাহীযুদ্ধের সময়ে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ, রাজপক্ষকে অকারণ সন্দেহ করিয়া একটা সংঘর্ষণ বাঁধাইয়াছিল, তথাপি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের পর, এই সন্দেহ সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইয়া সাব্যস্ত হইয়াছে যে, রাজা আমাদের স্বধর্ম্মপালনে বাধাও দিবেন না এবং সহায়তাও করিবেন না। সুতরাং আমাদের ধর্ম্মরক্ষার ভার আমাদের উপরই রহিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে, সাধুপীড়ার যে শঙ্কামূলে ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই শঙ্কা আমাদের ইংরাজরাজত্বে নাই। এই সকল কারণে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য ব্যক্তিগত ও সম্ভব হইলে সমষ্টিগতভাবে, আমাদের স্বধর্ম্ম রক্ষা করা। এই বিষয়ে রাজার কোনও কর্ত্তব্যতা নাই। এমন কি এতদ্দেশে, শিক্ষাবিস্তারক্রমে এই স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটী ভাবস্রোত সৃষ্টি করতঃ, এই দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তার করা বিষয়েও, রাজপক্ষকে বাধা দেওয়ার অধিকার আমাদের নাই। ইংরাজী ১৮৫৮ সালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের সর্ত্তগুলি অবিচারে স্বীকার করিয়া এই বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তাহাতেই আমরাও ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি।

অতএব, বর্ত্তমানে আমাদের কেবল সহায়সম্পদহীনভাবে, তীব্র তপস্যা দ্বারা, স্বধর্ম্মরক্ষার কর্ত্তব্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই তপস্যার নাম অন্তর্ম্মুখীবৃত্তির সাধনা। ইহা দ্বারা অন্তরস্থ জন্তুভাব দূর করতঃ মনুষ্যত্বের জাগরণ হয়। এতদিন আমরা এই কর্ত্তব্যতার বিরুদ্ধে চলিয়াছি। কারণ আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, মনুষ্যত্বের পথ বিদেশেই আছে, এই দেশে নাই। কিন্তু বিদেশীয়-প্রণালী পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হওয়ায়, এখন বুঝিয়াছি যে, বিদেশীয়-সভ্যতা কেবল মানুষের জন্তুভাবই জাগ্রত করে, ইহাতে

সার পদার্থ কিছুই নাই। পরন্তু দাসত্ব ও দুঃখ ইহার অনিবার্য্য সহচর। এই জন্য আজ, এই গ্রন্থ লিখিয়া গ্রন্থকার তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বীগণকে, ধর্ম্মপথে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাকর্ষণ ইহার উদ্দেশ্য।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আজ ইংরাজীশিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বহুবর্ষব্যাপীপ্রভাবের ফলে, দেশের জনসাধারণের অন্তঃকরণ যে ভাবে বহির্ম্মুখী হইয়াছে, তাহাতে এই অন্তঃকরণকে অন্তর্ম্মুখী করা অসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অন্তঃকরণ বহির্ম্মুখী হইয়াছে কিসের জন্য। বলা বাহুল্য যে, একটা স্বার্থের লোভেই ইহা এইরূপ বহির্ম্মুখী হইয়াছে। দেশের লোক যদি বুঝিতে পারে যে, অন্তঃকরণকে অন্তর্ম্মুখী করাই তাহাদের স্বার্থ, তাহা হইলে, তাহারা কেন অন্তর্ম্মুখী হইবে না? অবশ্য ইহা বলা যাইতে পারে যে, সকলে ইহা বুঝিবে না। কিন্তু সকলের ইহা বুঝিবার প্রয়োজন নাই। যদি দেশের শ্রেষ্ঠ লোক, এই কথা বুঝিয়া অন্তঃকরণকে অন্তর্ম্মুখী করেন, তাহা হইলে ইতর ব্যক্তিগণ, তাহার অনুকরণ নিশ্চয়ই করিবে। বিশেষতঃ, দেশের সংস্কার ইহার অনুকূলে। যে শিক্ষিত উচ্চবর্ণের দৃষ্টান্তে দেশের মনোবৃত্তি বহির্ম্মুখী হইয়াছে, সেই শিক্ষিত উচ্চবর্ণের দৃষ্টান্তেই, ইহা অন্তর্ম্মুখী হইবে। অবশ্য ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাজশক্তি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাল, ইহার প্রতিকূল। কিন্তু বহির্ম্মুখীভাবে দেশোদ্ধারের জন্য কি তোমরা একটা তপস্যা করিতেছ না? যদি এই তপস্যা তোমরা অন্তর্ম্মুখীভাবে কর, তাহা হইলে দেখিবে যে, ইহাতে রাজভয় নাই ও পুলিশের রিপোর্ট অথবা লাঠির ভয় নাই। আছে কেবল প্রতিকূল অবস্থার সহিত একটা আন্তরিক সংগ্রাম। বহির্ম্মুখী সংগ্রামে জয় লাভ করিবার জন্য যদি তুমি আশা করিতে পার, তাহা হইলে এই অন্তর্ম্মুখী সংগ্রামে জয়লাভ,

তোমাদের হইবে না কেন ? বিশেষতঃ বহির্ম্মুখী সংগ্রাম, পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইতেছে। অন্তর্ম্মুখী সংগ্রামের অন্তরায় কেবল তোমাদের শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস ও শাস্ত্রকারগণের প্রতি অকারণ বিদ্বেষ। প্রেরিত-নীতিজনিত ভ্রান্তিবশে, তোমাদের এইরূপ হইয়াছে। এই বিদ্বেষবশতঃ, তোমরা প্রথমতঃ মনে করিয়া লইতেছ যে, শাস্ত্রকার জাতিভেদ করিয়া, কতকগুলি লোকের প্রতি অবিচার করিয়া রাখিয়াছেন। এই অবিচারের আমরা প্রশ্রয় দিব কেন ? বস্তুতঃ, এই অন্যায় কল্পনা ও ভ্রান্তসিদ্ধান্ত দূর করার জন্যই, এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে। ইহাতে যদি তোমার ভ্রান্তবিশ্বাস দূর হয়, তাহা হইলেই তুমি অন্তর্ম্মুখী হইবে, অন্যথা তাহার প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, তোমাদের বিশ্বাস যে, ভারতের অন্তর্ম্মুখী সভ্যতার কোনও শক্তি নাই। শক্তি থাকিলে, ভারতবর্ষ পরাধীন হইল কেন ? এই গ্রন্থে এই কথার যথাসাধ্য উত্তর দেওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র গ্রন্থেই পাকে-প্রকারে এই কথার উত্তর থাকিবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলেই বুঝিতে পারিবে যে, ইহা দ্বারাই মানব প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয় এবং এই স্বাধীনতাই তাহার ভিতরে শক্তি আনিয়া দেয়। ইহা পশুশক্তি নহে, চরিত্র-শক্তি। এই চরিত্রশক্তি সর্ব্বপ্রকার পশুশক্তির উপর এমন আধিপত্য করে যে, চরিত্রবান মনুষ্য-গণের সংখ্যাল্পতার দ্বারা, এই আধিপত্যের কোনও বাধা হয় না। এই কারণে, এই শক্তির উপর জগতে আর কোনও শক্তি নাই। যাগযজ্ঞ অন্তর্ম্মুখী-সঙ্কল্প আনয়ন করে, এবং এই অন্তর্ম্মুখী-সঙ্কল্প চরিত্র নির্ম্মাণ করে। এই চরিত্রই আবার শক্তি ও স্বাধীনতার জনক হয়। অন্যথা মনুষ্য স্বভাবের শক্তিতে দাস হয়। এই কারণে, পঙ্কে পতিত গরুর ন্যায়, ম্লেচ্ছদেশ চিরকাল দাসত্বরূপী পঙ্কে পতিত হইয়া রহিয়াছে এবং ম্লেচ্ছ-

জাতির বহুকথা গ্রহণ করিয়া, আমরা আজ দাসত্বের পথেই চলিয়াছি। পাশ্চাত্য জগতে অন্তর্ম্মুখী জ্ঞানের অভাব থাকায়, তথায় স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহার জ্ঞান যেমন নাই, দাসত্ব কাহাকে বলে, তাহার জ্ঞানও তেমন নাই। এই কারণে তথায় এক-একজন এক-একটা নীতি প্রেরণ করেন এবং এই দুর্নীতিরূপ পঙ্কে ডুবিয়া, পঙ্কে পতিত গরুর ন্যায়, মানুষ বৃথা শ্রম করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা আজ আমাদিগকে এই বৃথা শ্রমের পথ দেখাইয়াই বলিতেছে যে, হে ভারতবাসী, তোমরা তোমাদের প্রাচীন পথ ত্যাগ করিয়া এই ভোগের পথে আইস। আমাদের সভ্যতাতে যে জড়বিজ্ঞান আছে, তাহা তোমাদের সভ্যতাতে নাই। জড়বিজ্ঞান ভোগের পথ পরিষ্কার করে এবং মানুষকে একদিন পূর্ণতা প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া আশাও রাখে। এই অবস্থায় কেন বৃথা এই যাগযজ্ঞ, পূজা, অর্চ্চনা লইয়া পাগলের ন্যায় কালক্ষেপ কর? এইরূপে এই শিক্ষা আমাদিগকে একটা প্রলোভন দেখাইয়া, প্রেরিত-নীতির দিকে নিতেছে। ফলে, যে প্রেরিত-নীতি তাহাদিগকে দাসত্বরূপী পঙ্কে চিরকালের তরে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছে, সেই প্রেরিত-নীতিই আমাদের জন্য ব্যবস্থিত করিয়া, আমাদিগকে একটা দাসত্বরূপী পঙ্কে নিক্ষেপ করিতেছে। অনেকে মনে করেন যে, বিদেশীয় শাসনের ন্যায় দাসত্ব আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু ইহা ভুল। দাসত্ব-বিদেশীয় শাসনে নহে। ইহা প্রেরিত-নীতির মধ্যে। দেশীয় রাজশক্তিও যদি প্রেরিতনীতিতে শাসন করেন, তবে তাহাও দাসত্ব। মানবজাতির স্বাধীনতা এমন সূক্ষ্মসূত্রের প্রকৃতিতে গাঁথা রহিয়াছে যে, এই স্বাধীনতা কোথায়, তাহা বহির্ম্মুখী জ্ঞান দ্বারা বুঝা যায় না। অতএব নব্যতন্ত্রীর সহিত আমাদের তফাৎ এই যে, নব্যতন্ত্রী বিদেশীয়কে বিদেশীয় বলিয়াই আপত্তি করেন। আবার এই আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি বিদেশীয় কর্ত্তৃক প্রেরিত সভ্যতা ও রাজনীতি

গ্রহণক্রমে, দেশে প্রকৃত দাসত্ব আনয়ন করিতেছেন। পক্ষান্তরে, আমরা বিদেশীয়ের জন্মস্থান সম্বন্ধে কোনও আপত্তি করি না, কেবল তাঁহার সভ্যতাকে ভয় করি। কারণ ইহা বৌদ্ধনীতির ন্যায় একটা প্রেরিত-নীতি। এই ভয় হেতু এই নীতি আমরা গ্রহণ করিতে চাহি না। এই ভয়ের নিদর্শন আমাদের অস্পৃশ্যতা। এই অস্পৃশ্যতা বজায় থাকিলে, অশোকের রাজত্ব ও ইংরাজরাজত্বে আমরা কোনও প্রভেদ করি না। হিন্দু তাহার জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা ও আচাররাশি লইয়া, এই কারণেই রাজভক্ত আছে। আমরা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট বলিতে, ধর্ম্মনীতিমূলক গভর্ণমেণ্ট বুঝি। নব্যতন্ত্রী যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করিয়া প্রেরিতনীতিই দেশে স্থায়ী করার চেষ্টা করিতেছেন, তখন তিনি যে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কল্পনা করেন, তাহার ভিতরে বাস করা অপেক্ষা বলবান ইংরাজের আশ্রয়ে বাস করা আমরা অধিকতর বুদ্ধিমানের কার্য্য মনে করি। কেন না, নব্যতন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার পড়িলে, তিনি তাহা রাখিতে পারিবেন না। দলাদলিমূলে, ইহা আর এক বিদেশীয়ের হস্তে যাইবে।

এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি তাহাই হয়, তবে গ্রন্থকার পুস্তক লিখিতেছেন কেন? আজ যে সকল নীতি দেশে প্রেরিত হইতেছে, তাহাতে নব্যতন্ত্রীর হাত কোথায়? এই সকল নীতিও ইংলণ্ড হইতেই প্রণীত হইয়া আসিতেছে। এই অবস্থায় ইংরাজ দূর না হইলে গ্রন্থকারের ধর্ম্মনীতি থাকিবে কোথায়? প্রেরিতনীতিই যদি কলিযুগ হয়, তবে এই কলিযুগের হস্ত হইতে উদ্ধার নাই এবং দেশে ইংরাজ রাজত্ব থাকিলে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসারণও অবশ্যম্ভাবী। অতএব, অগ্রে ইংরাজকে দূর না করিলে, ধর্ম্মরক্ষা কখনও হইবে না। কিন্তু ইহা ভুল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ধর্ম্মনীতিতে চরিত্র অগ্রে নির্ম্মিত হইয়া বাহুবল তাহার পশ্চাদ্ভাবী হয়।

সুতরাং ইংরাজ রাজত্বে বাস করিয়াই আমাদিগকে চরিত্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। নব্যতন্ত্রী এই চরিত্র নির্ম্মাণের অন্তরায় বলিয়াই গ্রন্থ লিখিয়া অন্ততঃ কতক লোককে, চরিত্র সাধনার আবশ্যকতা উপলব্ধি করাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। এই বিষয়ে, কাল আমাদের পক্ষে সম্প্রতি অনুকূল হইয়াছে। সকলেই জানেন যে, রাজা আজকাল এই দেশে সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা নীতি প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। তাহার ফলেই বর্ণাশ্রমী এখন সনাতনী-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন রাজপ্রেরিতনীতি আমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিত, তাহাতে আমাদের কথা বলার সুযোগ হইত না। নব্যতন্ত্রীই আমাদের প্রতিনিধি সাজিয়া, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মত দিতেন। ৺রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া সর্দ্দা পর্য্যন্ত সকলেই, রাজার নিকটে হিন্দু সাজিয়া হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সেই পথ নাই। নব্যতন্ত্রী এখন আর আমাদের প্রতিনিধি নহেন। ভেদনীতি এই দেশে যে ভেদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতেই ধর্ম্মনীতির অনুকূলে আমাদের কথা বলার সুযোগ হইয়াছে। এই কথা বলার সুযোগ প্রসঙ্গেই এই পুস্তক লিখার কারণ হইয়াছে। প্রতি কথায় নব্যতন্ত্রী বলেন যে, আমাদের ধর্ম্মই ভেদের সৃষ্টি করিয়া, আমাদের পরাধীনতার কারণ হইয়াছে। এই জন্য তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, তিনি যাহাকে স্বাধীনতা বলেন, তাহা স্বাধীনতা নহে। ইহা দাসত্বের চরমাবস্থা। রাজাকেও এই গ্রন্থ দ্বারা আমাদের ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিবার সুযোগ দেওয়া গেল। গ্রন্থকার ইহাতে ফলাফলের অপেক্ষা রাখেন না। বর্ত্তমানে ধর্ম্মরক্ষা আমাদের রাজ-সাপেক্ষ নহে। ইহা রক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে আমাদের হাতে। রাজার হাতে ইহার ভার দিলে, তাঁহার প্রেরিত-নীতির দোষে ইহা বিকৃত হইয়া যাইবে।

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ॥

মনু ২য় অধ্যায় ৯৭ শ্লোক

অনুবাদ :—যাহারা বিষয় সেবায় একান্ত আসক্ত হইয়া দুষ্টভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের বেদাধ্যায়ন, দান, যজ্ঞ, নিয়ম ও তপস্যা কখনও সিদ্ধি হয় না।

কল্লুকভট্টিয় টীকা :—বেদাধ্যায়ন, দানযজ্ঞ নিয়মতপাংসি স্রগাদি বিষয়সেবাসঙ্কল্পশীলিনো ন কদাচিৎ ফল সিদ্ধয়ে প্রভবন্তি।

অস্পৃশ্যতা সাধনার ফল

কল্লুকভট্টের এই টীকায় 'বিপ্রদুষ্ট' ভাব, এই কথার অর্থ, বিষয়-সেবা সঙ্কল্পশীল মনুষ্যগণের ভাব বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাই আমাদের শাস্ত্রের সার কথা। নবম অধ্যায়ে বুঝাইয়াছি যে, কামনার প্রসারণমূলকসঙ্কল্পই বিষয়সেবাসঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প হইতে প্রেরিত নীতির উৎপত্তি হয়। সুবিধাবাদ, এই প্রেরিতনীতির মূল। এই নীতি যখন ধর্ম্মের রক্ষক হয়, তখন ধর্ম্মজ্ঞানহীন মনুষ্যগণ ধার্ম্মিক মনুষ্যকেও অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া, নিজের সুবিধামূলক কথা বলাইয়া ফেলে। আমাদের চক্ষের উপরই দেশে এই পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। শৈশবকালে দেখিয়াছি যে, গ্রামের চতুষ্পাঠীর পড়ুয়াগণ, গ্রামের ভদ্রলোকের বাড়ীতে আহার পাইতেন এবং কতিপয় পড়ুয়া-অধ্যাপকের বাটীতে থাকিতেন। যাঁহারা পড়ুয়াগণকে অন্ন দিতেন, তাঁহারা মনে করিতেন যে পুণ্য হইতেছে এইজন্য তাঁহারা অহঙ্কৃত হইতেন না এবং পড়ুয়াগণও অন্নদান গ্রহণ করা সত্ত্বেও একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেন। এদিকে অধ্যাপকগণ কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। নিজের

বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াই, আড়ম্বর ও চাকচিক্যবিহীন জীবনযাপন করিতেন। ইহার ফলে, দেশে অসাধারণ তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ অধ্যাপকের সংখ্যাধিক্য দেখা যাইত; কিন্তু আজকাল এই শ্রেণীর অধ্যাপক নাই। দেশের বিশিষ্ট বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ, District Board প্রভৃতি নানাস্থান হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া, রাজশক্তির পরিদর্শনের অধীনে একটা প্রেরিত-নীতির আশ্রয়ে চলিয়া গিয়াছেন। শঙ্কটকালে তাঁহাদের নিকট, শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা, পাওয়ার আশা করা যায় না। এমন কি তাঁহাদের প্রতিকার্য্যে, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার অভাব দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের অস্পৃশ্যতা বজায় থাকিলে, আমরা রাজভক্ত থাকিয়া, এই দেশে জীবনধারণ করিতে পারি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের ধর্ম্মের সহিত, প্রেরিত-নীতির এমন একটা বিরোধ আছে যে, প্রতিক্ষেত্রেই আমাদের সহিত এই নীতির দ্বন্দ্ব বাঁধিবার কারণ ঘটে। এই অবস্থায় প্রেরিত-নীতির রাজ্যে বাস করিতে গেলে, অস্পৃশ্যতা আমাদের আত্মরক্ষার একমাত্র অবলম্বন। ইহা যুদ্ধের স্থলবর্ত্তী। এই অস্পৃশ্যতা নানা প্রকারে, শাস্ত্রবিধিতে প্রকটিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে, শাস্ত্রানুসারে—অশাস্ত্রীয়-নীতি-প্রেরকের দান-গ্রহণ নিষিদ্ধ। ইহাও এক শ্রেণীর অস্পৃশ্যতা। ইহার দ্বারা প্রাচীন পণ্ডিতগণ, তাঁহাদের চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেন। কিন্তু আজ ইহা নাই বলিয়াই চরিত্রের এই স্বাতন্ত্র্যতাও নাই। বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদকে একটা Faculty-তে পরিণত করার চেষ্টা চলিতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরাজগণ, এইরূপ একটা Faculty-র চিন্তাও করিতে পারিতেন না। অথচ বর্ত্তমানে এই বিষয়ে, কবিরাজমহলে একটা বিশেষ আন্দোলন শোনা যাইতেছে। এই আন্দোলনের ফল যাহাই হউক না কেন, আয়ুর্ব্বেদ যদি একবার প্রেরিতনীতির অধীনে চলিয়া যায়, তাহা হইলে

ইহার ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত-স্বাতন্ত্র্য যে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। Faculty হইলে, আয়ুর্ব্বেদ এক প্রেরিতনীতির অধীন হইয়া যাইবে, এবং আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপকগণ পরিদর্শকগণের অধীন হইয়া, আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইবেন। তারপর ধীরে ধীরে, আয়ুর্ব্বেদই তাহার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া, এলোপ্যাথির একটা শাখাতে পরিণত হইবে। গ্রন্থকার স্বচক্ষে, বরিশাল জেলার অন্তঃপাতী ৺কবিরাজ ললিত মোহন দাসগুপ্তের এমন অদ্ভুত নাড়ীজ্ঞান দেখিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট এলোপ্যাথির সর্ব্বপ্রকার যন্ত্র পরাজিত হয়। যদিও কবিরাজদিগের মধ্যে, এইরূপ নাড়ীজ্ঞান অতি বিরল, তথাপি এই নাড়ীজ্ঞানের ন্যায়, এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আয়ুর্ব্বেদের রহিয়াছে যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলিই ইহার প্রাণ। এই প্রাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়ই, আয়ুর্ব্বেদ এ যাবৎ প্রেরিতনীতির অধীন ছিল না। কিন্তু এখন ইহা Faculty-তে পরিণত হইয়া গেলে, ইহার এই প্রাণ নষ্ট হইয়া যাইবে। এই অর্থে Faculty আমাদের অস্পৃশ্য বস্তু। আমরা বাহ্য-জাতির পক্কান্ন গ্রহণ করি না, এবং প্রতিক্ষেত্রে আমাদের ছুঁৎমার্গ আছে বলিয়াই, অন্ন-বিক্রয় আমাদের নিকট নিন্দিত, এবং হোটেল আমাদের অস্পৃশ্য। পক্ষান্তরে হোটেলই বাহ্যজাতির প্রাণ। ইহাতে তাঁহারা বিষয়সেবাসঙ্কল্পের চরিতার্থতা সাধন করিয়া, পারিবারিক জীবনকে উপেক্ষা করিতে শিক্ষা করেন। এদিকে এই বিষয়-সেবা-সঙ্কল্পকে অস্পৃশ্য রাখিয়াই, আমাদের পারিবারিক স্বাধীনতা রক্ষিত হইতেছে। এই স্বাধীনতায় সর্ব্বপ্রকার প্রেরিত-নীতি অস্পৃশ্য এবং নারীগণ গৃহদেবীর ন্যায় রক্ষণীয়া। ইহারা শৌচাচার-বিধি অনুসারে শাকান্ন রাঁধিয়া দিলেও, আমরা তাহা অমৃতবোধে আহার করি। আমাদের অস্পৃশ্য জাতিরও, এই পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য আছে। লক্ষ লক্ষ বাহ্যজাতীয়া নারীর মধ্যেও হিন্দুনারীকে চেনা যায় এবং

তাঁহার লজ্জাশীলতা অপরের দাম্ভিক, নির্লজ্জতাকে ধিক্কার দেয়। ঐ শঙ্খ, সিন্দূর ও আচাররাশি ইহার মূল, এবং অস্পৃশ্যতা এই বৈশিষ্ট্যের রক্ষক। ইহা না থাকিলে, আমরা বহুপূর্ব্বেই একটা দুর্ব্বল বাহুজাতিতে পরিণত হইয়া, সর্ব্বজাতির দাস নামে পরিচিত হইতাম।

অস্পৃশ্যতা ও রাজভক্তি

কেবল তাহাই নহে। এই অস্পৃশ্যতার বর্ম্মে আবৃত হইয়া, মুসলমান রাজত্বে ও ইংরাজ রাজত্বে, আমরা রাজভক্তি রক্ষা করিয়াছি। কোনও জাতিরই বাহুবল, চিরকাল সমান থাকে না। কিছুকাল হইল, যে হাবসী জাতি ইটালীকে পরাজিত করিয়াছিল, সেই হাবসীজাতিই আজ ইটালীর হস্তে পরাজিত হইয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে। এই কারণে আমাদের শাস্ত্রকারগণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই ধর্ম্মনীতিও একদিন প্রেরিত-নীতির হস্তে পরাজিত হইয়া, প্রেরিত-নীতি-সম্মত রাজাগণের অধীন হইবে। এই অবস্থায় ধর্ম্মনীতি কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে, ইহাই ছিল ঋষিগণের নিকট প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াই, তাঁহারা অস্পৃশ্যতাকে ধর্ম্মনীতির রক্ষকরূপে, এই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহা যুদ্ধের স্থলবর্ত্তী ও জগতের মতভেদের ভিতরে, একমাত্র শান্তি-রক্ষক। বাহু-জাতি গুরুতর মতভেদ হইলে, যুদ্ধ ও বিপ্লব ব্যতীত অন্য কোনও উপায় দেখে না। পক্ষান্তরে আমাদের ঋষিগণ, এইরূপ ক্ষেত্রেও শান্তিরক্ষার একটা পথ করিয়া গিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা সেই বিশিষ্ট পথ। এই পথে অবস্থিত থাকিলে, বাহুজাতির রাজত্বে বাস করিয়াও, নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যায়। অন্যথা প্রত্যেক মতভেদের ক্ষেত্রে, যুদ্ধ ও রক্তপাত অনিবার্য্য হইয়া উঠে। গত ৮০০ বৎসর যাবৎ, আমরা জাতিধর্ম্ম ও রাজভক্তি লইয়া, মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বে বাস করিতেছি। ধর্ম্মমত

কোনও বিরোধ উপস্থিত করে নাই। আজ বিপ্লববাদ শান্তিপরায়ণতার স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়াই দেশে অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন আন্দোলন উঠিয়াছে। অতএব চিন্তা করিয়া দেখ, অস্পৃশ্যতাই আমাদের এই দেশে, প্রেরিত-নীতির রাজত্বেও শান্তিরক্ষা করিয়াছে। অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন হইলে, যদি কখনও ধর্ম্মরক্ষা আমাদের প্রয়োজন বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তখন আমরা ধর্ম্মরক্ষা করিব, কি রাজভক্তি রক্ষা করিব, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই আসিয়া পড়িবে। রাজভক্তি রক্ষা করিতে গেলে, ধর্ম্মরক্ষা হইবে না এবং ধর্ম্মরক্ষা করিতে গেলে, রাজভক্তি রক্ষিত হইবে না। আন্দোলনকারিগণ আমাদের অস্পৃশ্যতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নাই। ইহা বাহ্যজাতির রাজত্ব ও রাজভক্তির সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করে। ইহা বর্জ্জন হওয়ামাত্রই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া, বাহ্যজাতিসমূহে ডুবিয়া যাইতে হইবে। অথবা তাহাদের সহিত, চিরবিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া, ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইবে।

এক্ষণে নব্যতন্ত্রী প্রশ্ন করিতে পারেন যে, তবে কি আমাদিগকে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে? এই নিশ্চেষ্টতা উৎপাদক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইলেও আমাদের পক্ষে, দেশ বিদেশে যাইয়া শিক্ষার উন্নতি ও অর্থোন্নতি করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, চরিত্রহীন ও সংহতিশক্তিহীন মনুষ্যের পক্ষে, এই তথাকথিত শিক্ষার কোনও মূল্য নাই। আর্থিক-উন্নতিও ইহাতে সমষ্টিগত কোনও উপকার করে না। এই জগতে পার্শী ও ইহুদী সমাজে, শিক্ষা বিষয়ক যোগ্যতা অল্প নহে। ইহারা দেশ-বিদেশে যাইতেছেন এবং আর্থিক-উন্নতিও ইহাদের যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সংহতিশক্তিহীনতাপ্রযুক্ত কোনও স্থানেই ইহাদের আধিপত্য নাই। এমন কি প্রচুর অর্থ থাকা সত্বেও, ইহারা জগতে অনাদৃত। হিন্দুর সংহতিশক্তি তাহার শাস্ত্রীয় চরিত্রের

উপর নির্ভর করে। এই চরিত্র যতদিন পর্য্যন্ত নির্ম্মিত না হইয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত, 'সিন্ধুনীরে বা ভূধর শিখরে' কোনও স্থানেই তাঁহার উন্নতি নাই। প্রতিক্ষেত্রেই সে অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইবে। এই আশঙ্কায়ই বলিতেছি যে, ধীরভাবে ইংরাজের সুশাসনের অধীনে থাকিয়া অস্পৃশ্যতা দ্বারা, নিজের জাতি-ধর্ম্ম রক্ষা কর ও চরিত্র-নির্ম্মাণ কর। তারপর উন্নতির পথ পরে দেখিবে। হয়ত চরিত্রের বলে উন্নতি আপনিই আসিবে। এখন 'সিন্ধুনীরে বা ভূধর শিখরে' যাইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা গ্রহণ করতঃ, উন্নতির চেষ্টা দেখিলে তোমার মধ্যে দশ বিশজন, কি শতজন হয়ত অর্থশালী হইয়া, ভোগের স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে সমগ্র জাতির সংহতিশক্তি নষ্ট হইবে। তুমি ধনী থাকিলেও অবশিষ্ট সমস্ত সমাজ, বন্ধনহীন কুলীমজুরে পরিণত হইয়া, জগতে মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে, এবং তোমার পুত্রগণ কখনও অর্থহীন হইলে, তাহারা সম্মানিতবৃত্তির অভাবে অপরের বাড়ীতে ব্যাণ্ড বাজাইয়া খাইবে। আর পুরস্কারের মধ্যে ধনী হওয়া সত্বেও, জগতের শক্তিশালী-জাতিসমূহ, তোমাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবে। অতএব ইংরাজকে দেশ হইতে দূর করিয়া, ধর্ম্মরক্ষা করার প্ররোচনা দেওয়ার নিমিত্ত, এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে না। বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষই ইংরাজকে যোগ্য মনে করিয়া, এই দেশে রাজা হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন! তারপর তাঁহারা, তাঁহাকে রাজা স্বীকার করিয়াও গিয়াছেন। এখন ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিলে ফল হইবে অন্তর্ব্বিপ্লব ও রক্তপাতমূলক দুর্ব্বলতা। ইংরাজ চলিয়া গেলেও, এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া অন্য জাতি দেশের রাজা হইয়া বসিবে অথবা বিদ্রোহিতা করিলে, ইংরাজই আমাদিগকে নির্ম্মূল করিয়া চলিয়া যাইবেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রের দ্বারা, ইংরাজ আমাদের

নিকট আবদ্ধ। অন্য কেহ রাজা হইলে, তাঁহাকে এইরূপ বাক্যে আবদ্ধ করা সহজ হইবে না। বিশেষতঃ ইংরাজ তাঁহার বাক্য রক্ষা করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে সনাতনপন্থীর কিছু বলিবার নাই। ইংরাজ যে শোষন করিতেছেন, তাহা করিতে জাপানও কসুর করিবে না। এই সকল কথা কাপুরুষের হৃদ্‌কম্পনের ফল নহে। অভিজ্ঞতার সাবধান বাণী। নব্যতন্ত্রীগণ অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা লইয়া যেমন ইংরাজের সহিত জীবনসংগ্রামে নামিয়াছেন, তেমনই এক আত্মপরিচয়হীনতা লইয়া ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। ইংরাজ আমাদের জাতিধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলে, তাঁহাকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র স্মরণ করাইয়া দিলেই চলে। কিন্তু যেখানে দেশের লোকের ভিতরে আত্মবিস্মৃতি আসে সেইখানে, 'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি' এই মহাবাক্যের সার্থকতা হইবে এই আশঙ্কা হয়। প্রতিক্ষেত্রেই নব্যতন্ত্রীর অকৃতকার্য্যতা ও নৈরাশ্যপূর্ণ অবস্থা দেখিয়া, দেশ আজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। এই কারণে শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রয়োগে দেশকে পথে আনিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই, এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে। সাম্প্রদায়িকতাকে বিভক্ত করিয়া ইংরাজ আমাদিগকে এই বিষয়ে সুযোগ দিয়াছেন। এই কারণে আমরা আজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। যদি এই সুযোগ না হইত, তাহা হইলে নব্য-তন্ত্রীর কথাই আমাদের কথা বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। ৺রাজা রামমোহন রায়ের আমল হইতে তাহাই হইয়া আসিতেছিল। ইহাতে নব্যতন্ত্রী একদিকে যেমন আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করার সুযোগ পাইয়াছিলেন, অপর দিকে তেমন সমগ্র দেশকে একটা মিথ্যা জীবন-সংগ্রামে নিক্ষেপ করিয়া, ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছিলেন। সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারা দেশকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং এই দেশে কোনও জাতির

অস্তিত্ব নাই, এই ঘোষণা করিয়া ইংরাজ সত্যেরই ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঘোষণার পর নব্যতন্ত্রী সমগ্র দেশের প্রতিনিধি হইয়া কথা বলিতে পারিবেন না এবং তাঁহারা সমাজসংস্কার চাহিলেই, কিছু এই সংস্কার সমগ্র দেশের প্রার্থিত বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে না। এই কারণে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করার জন্যই ভগবান্ স্বয়ং ইংরাজজাতির বুদ্ধিকে চালনা করতঃ, এই সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা করাইয়াছেন। অন্যথা নব্যতন্ত্রীর চেষ্টায়, সনাতন-ধর্ম্ম এই দেশে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইত। নব্যতন্ত্রী বলেন যে, ইহাতে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবে মুসলমানের প্রাধান্য বৰ্দ্ধিত হইবে। কিন্তু মুসলমান যদি হিন্দুর জাতিধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাধান্য দিতে হিন্দুর কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না। মুসলমানরাজার অধীনে বাস করিয়াও সে অভ্যস্ত আছে। তবে এই ক্ষেত্রে হিন্দুর এক গুরুতর কর্ত্তব্যতা আছে। মুসলমান রাজত্বে বাস করিয়া সে ধর্ম্মের পথে না যাইয়া, কেবল জীবনরক্ষারই চেষ্টা করিয়াছে। এই কারণে, ধীরে ধীরে সে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজজাতির অনুসরণ করিয়াছে। বর্ত্তমান নব্যতন্ত্রী তাহার এই অনুকরণপ্রিয়তারই উত্তরাধিকারী। পার্শী-ভাষা শিক্ষা করিয়া, যদি সে রাজসেবাকেই জীবনের সার মনে না করিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকুলে কখনও ৺রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় পুরুষের উৎপত্তি হইত না এবং শাস্ত্র সংস্কার ও সমাজ সংস্কার কখনও নব্যতন্ত্রীর জীবনের মূলমন্ত্র হইত না। ইহাতে গুহ্য কথা এই যে, এই সময়ে হিন্দুর স্বধর্ম্মে আস্থা লোপ হইয়া গিয়াছিল, এবং পরধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া, জীবন-সমস্যার সমাধান তাঁহার মূলমন্ত্র হইয়াছিল। জীবিকালাভ ও বৈষয়িক উন্নতি বিষয়ে প্রেরিতনীতি গ্রহণ ইহার কারণ। বস্তুতঃ, এইখানেই তৎসময়ের হিন্দুর ভ্রম হইয়াছিল। অবশ্য প্রেরিতনীতির রাজ্যে বাস

করিতে হইলে, প্রত্যেকের পক্ষে তাহা বর্জ্জন করা অসম্ভব। সুতরাং মুসলমান রাজত্বে কয়জন ইহা বর্জ্জন করিয়া, কয়জন ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার হিসাব-নিকাশ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এইখানে কেবল আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, বর্ত্তমানে যে ভাগ-বাঁটোয়ারানীতি দেশে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা কিরূপভাবে আমরা গ্রহণ করিব? কিন্তু এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে, শাস্ত্রে আমাদের যে ধর্ম্মনীতি কথিত হইয়াছে, তাহা রাজনীতি হিসাবে কোন্ শ্রেণীতে পড়ে তাহা আমাদের দেখা আবশ্যক। সকলেই বলেন যে ইহা ধর্ম্মনীতি মাত্র। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ হইবে কেন? এইরূপ একটা যুক্তিমূলেই মুসলমান রাজত্বে, আমরা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমানের প্রেরিতনীতি গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং আজও এই যুক্তিমূলেই ইংরাজের প্রেরিত-নীতি গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট ধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছি। কিন্তু ইহা আমাদের ভ্রম। এই দেশে ধর্ম্মনীতি রক্ষার জন্য, এমন এক বিশিষ্ট রাজনীতি ইহার পৃষ্টপোষকরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে যে, তাহাতে রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষে ধর্ম্মনীতির অনুসরণই রাজনীতি। ইহা কিরূপ তাহা ক্রমে বলিতেছি।

দ্বাদশ অধ্যায়

অপ্রেরিত হিতকর নীতি

নীতিশাস্ত্র বলিতেছেন :—

> অপ্রেরিত হিতকরং সর্ব্বরাষ্ট্রং ভবেদ্ যথা।
> তথা নীতিস্তু সন্ধার্য্যা নৃপেনাত্ম হিতায় বৈ ॥

অনুবাদ :—রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া যে নীতি রাজাপ্রজা উভয়ের পক্ষে হিতকর হয়, তদ্রূপ নীতিই রাজা আত্মহিতের জন্য ধার্য্য করিবেন।

কথার উদ্দেশ্য এই যে, এমন নীতি রাষ্ট্রে ধার্য্য হইবে যাহার ফলে, প্রজার রাজভক্তি নীতির স্বভাবেই স্বভাবসিদ্ধ হইয়া, রাজাপ্রজা উভয়ের পক্ষে হিতকর হয়। জগতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই কথার ব্যাখ্যা দুরূহ। প্রথমতঃ, পাশ্চাত্য রাজনীতি বলেন যে, প্রজা তাহাদের প্রতিনিধিগণের সাহায্যে যে হিতকর নীতি (Principle) ধার্য্য করিয়া দিবে, তাহাই গ্রহণপূর্ব্বক রাজা রাজ্যশাসন করিবেন। কিন্তু ইহা অপ্রেরিত হিতকর নীতি নহে। কেন না, ইহা রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত হয় না। প্রজা তাহার হিত বুঝিয়া এই নীতি প্রেরণ করে। তারপর পরিণামে ইহাতে রাজা-প্রজা কাহারও হিত হয় না। এমন কি পরিণামে প্রজাই নষ্ট হইয়া যায়। ফলতঃ, ইহাতে রাজা যেমন প্রজার দাস হয়, প্রজাও তেমন সমষ্টির দাস হইয়া দেশে একটা সার্ব্বজনীন-দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। এই কারণে আমাদের দেশে কাম-প্রেরিত (Actuated by the desires either of the king or of the people) নীতিমাত্রই প্রেরিত-নীতি। ইহা রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলে যেমন

রাজ্যে দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রজা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেও তেমন রাজ্য মধ্যে দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। একভাবে দেখিতে গেলে মানবের কোনও স্বাধীনতা নাই। সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও মল-মূত্রের বেগের অধীন। প্রতিক্ষেত্রে প্রকৃতির অধীন থাকায় বন্ধন তাঁহার জন্মগত উপহার। এই উপহার লইয়াই সে ইহজগতে আসিয়াছে, এইজন্য ঋষিগণ স্বাধীনতার নাম দিয়াছেন মুক্তি। ইহার প্রথম স্তরে, মানুষ পরস্পরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হয়, এবং দ্বিতীয় স্তরে, জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। বৈরাগ্য-সাধনের পথই এই উভয় প্রকার মুক্তির পথ। কবিবর রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াই লিখিয়াছেন, "বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।" বস্তুতঃ, আমাদের দেশে বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণীর মুক্তির সাধনাই আছে, প্রথম শ্রেণীর মুক্তির সাধনা নাই। এইজন্য কবিবর মনে করিয়াছেন যে, শাস্ত্রকার বুঝি কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীর মুক্তির পথই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা নহে। শাস্ত্রকার প্রথম শ্রেণীর যে মুক্তির পথ বলিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই সর্ব্বসাধারণের মুক্তি হয়। এই পথই সর্ব্বসাধারণের পথ। দ্বিতীয় পথ যে, তাঁহার ও আমার জন্য নহে, তাহা আমরা জানি। বস্তুতঃ, মুক্তিশব্দ দ্বারা যে, মানবের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, উভয় প্রকার স্বাধীনতাকে বুঝাইয়াছে, তাহা অনেকেই এ দেশে বুঝিতেছেন না। এই শব্দটী অত্যন্ত ব্যাপক এবং বৈরাগ্যসাধনপ্রসঙ্গেই যে আমাদের সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বুঝাও একটু কঠিন। শাস্ত্রকারের ভাবটী সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন না করিলে, এই ব্যবস্থা বুঝা যায় না, এবং একবার ম্লেচ্ছভাবের ভাবুক হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্বাধীনতা মনে করিলে, শাস্ত্রীয় ভাব অনুভব করা কঠিন হইয়া পড়ে। আজকাল মুক্তি শব্দটী বোধগম্য না হওয়ার ইহাই কারণ।

কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, প্রথমতঃ সুখ কাহাকে বলে তাহা একবার বুঝিতে চেষ্টা কর। আমাদের দর্শনশাস্ত্র বলেন যে, আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখ জগতে আছে, তাহার নিবৃত্তি হইলেই সুখ হয়। কিন্তু এই তিন প্রকার দুঃখও আমাদের জন্মবন্ধনের ফল। এইজন্য দুঃখ মাত্রই বন্ধনাত্মক। পরবশে থাকিলে মানুষ দুঃখী হয়, এবং আত্মবশে থাকিলে সে সুখী হয়। এইজন্য যে ব্যক্তি যত অধিক আবদ্ধ, সেই ব্যক্তি তত অধিক দুঃখী। সুতরাং সমাধান হইতেছে যে, মানবের এই বন্ধন যখন মোচন হয়, তখনই সে সুখী হয়। অর্থাৎ যে কর্ম্মের দ্বারা তাহার বন্ধন মোচন হয়, সেই কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম এবং অবশিষ্ট সকল কর্ম্ম অকর্ম্ম বা বিকর্ম্ম। এইরূপে ধর্ম্ম-সাধনা, সুখ ও মোক্ষের মূল এবং বিষয়সাধনা দুঃখ ও বন্ধনের মূল। উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইবে যে, ঋষিগণ যাহাকে সুখ বলেন, তাহা স্বাধীনতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুক্তি শব্দে চরম স্বাধীনতাকেই বুঝায়। ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হইলেই মানুষ স্বাধীন হয়, এবং স্বাধীনতা হইতেই তাহার সুখ হয়।

অতএব দেখা যায় যে, আমাদের ধর্ম্মসাধনাই স্বাধীনতার সাধনা। পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্মসাধনা এক বস্তু এবং স্বাধীনতার সাধনা আর এক বস্তু। এই জন্য পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত নরনারী, ধর্ম্মসাধনা ও স্বাধীনতার সাধনা কিরূপে একই কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা বুঝেন না; আবার এই কথাটী না বুঝিলে কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা বুঝা যায় না, এবং কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা না বুঝিলে, তাহার শুভ প্রয়োগ হওয়ার উদ্দেশ্যে এই দেশে কিরূপে জাতিভেদ হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বন্ধন মানবের জন্মগত উপহার। এই উপহার ভগবান্ আমাদিগকে জন্মবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াই দিয়াছেন। এই

আবদ্ধতার মূল আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার ভিতরে, গমনাগমনের ভিতরে রহিয়াছে। রোগ হইলে গমনাগমনও আমরা করিতে পারি না। এমন কি, শিশু অবস্থায় আমরা ক্ষুধিত হইলে ক্রন্দন করিয়া আমাদের পরনির্ভরশীলতা, মাতাকে জ্ঞাপন করি। এই জ্ঞাপন করার হেতু এই যে, শিশু মাতাকে আত্মা হইতে পৃথক জ্ঞান করে না। তারপর, বিছানায় মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া তাহার পরনির্ভরশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখায়। বলা বাহুল্য যে, ইহাই তাহার দুঃখ। কিন্তু মাতা স্নেহের বশে বক্ষের দুগ্ধ দিয়া এবং মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া, এই দুঃখ দূর করেন। এই জন্য শিশুর স্বাধীনতা তাহার মাতৃস্নেহের ভিতরে রহিয়া গিয়াছে। কেন না, মাতৃস্নেহ তাহার আবদ্ধতাজনিত দুঃখ দূর করে। এই দুঃখ দূর করার মধ্যে দুইটী বস্তু নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ, মাতা তাহাকে স্তন্যদুগ্ধ প্রদানক্রমে তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণাজনিত দুঃখ দূর করেন এবং মল-মূত্র পরিষ্কার ও ঔষধাদিপ্রয়োগদ্বারা তাহার রোগাদিজনিত দুঃখ নিবারণ করেন।

এক্ষণে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ বড় হইলেও তাহার এই দুইটী বন্ধন থাকিয়া যায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণার বন্ধন সে কখনও ছাড়াইতে পারে না, এবং মলমূত্র পরিত্যাগ ইত্যাদিজনিত ক্লেশকর ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থাও তাহার আজন্মকাল লাগিয়া আছে। তদুপরি শীত নিবারণ ইত্যাদি নিমিত্ত বস্ত্রের আবশ্যকতা ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত গৃহাদির আবশ্যকতা, তাহার সর্ব্বদাই আছে। শিশু যেমন মাতৃস্নেহ না পাইলে এই দুইটী বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইতে পারে না, মানুষ বড় হইলেও তেমন, পরের সাহায্য ব্যতীত এই দুইটী বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না। শিশুর পক্ষে মাতৃস্নেহই একাধারে দুই প্রকার কার্য্য করে। প্রথমতঃ, এই স্নেহ তাহার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে এবং

দ্বিতীয়তঃ, এই স্নেহই বেতনধারী ভৃত্যের ন্যায় তাহার স্বাস্থ্য রক্ষা করে। কিন্তু বয়স্ক মনুষ্যের বন্ধনমোচন এত সহজে হয় না। এইজন্য এই প্রশ্নের সমাধানপ্রসঙ্গেই, পাশ্চাত্য জাতির সহিত আমাদের শাস্ত্রকারগণের মতভেদ। পাশ্চাত্য জাতি তথাকার সমাজজনিত স্বাভাবিক দাসত্বের ফলে মনে করেন যে, মানুষই মানুষকে তাহার দাস করিয়া বন্ধন করে। এইজন্য তথায় মানবের বন্ধনমোচনের উপায় জীবনসংগ্রাম। পক্ষান্তরে, আমাদের শাস্ত্রকার মনে করেন যে, প্রকৃতিজনিত বন্ধনই মানবের প্রকৃত বন্ধন। এই কারণে অন্তর্ম্মুখী বৃত্তির সাধনাই, এই বন্ধন মোচনের উপায়। এই সাধনা দ্বারা মানবহৃদয় মাতৃবৎ স্নেহাত্মক হয়। আমাদের বন্ধনের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বন্ধন, ক্ষুধাতৃষ্ণা, মলমূত্র ও শীতাতপের বন্ধন। উপযুক্ত ধন থাকিলে এই বন্ধন হইতে মুক্তি হয়। যদৃচ্ছা চলিতে পারিলেই এই বন্ধন হইতে মুক্তি হয় না। আজিকালিকার প্রগতিপরায়ণা নারী ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারিলেই সুখিনী। কিন্তু তাহার পেটে যদি অন্ন না থাকে, তবে কি তিনি সিনেমা দেখিয়া সুখিনী হন? কখনই নহে। সুতরাং স্বাধীনতা ধনগত, কর্ম্মগত নহে। বর্ত্তমান কালের অবস্থা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, মানবের স্বেচ্ছাচারমূলক জীবনসংগ্রাম দ্বারা এই ধন কেন্দ্রীভূত হইয়া, কখনও কতকগুলি ধনিকের নিকট এবং কখনও বা সমাজতন্ত্রবাদীর সামাজিক শক্তির নিকট আবদ্ধ হইয়া, মানুষকে একটা কেন্দ্রীয় শক্তির দাস করিয়া দেয়। অসন্তোষ এই দাসত্বের সাধারণ লক্ষণ। ধনিক প্রথা-বিশিষ্ট-সমাজে, দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা, এই অসন্তোষের কারণ; এবং সমাজতন্ত্রবাদী সমাজে, কেন্দ্রীয় শক্তির অবিচার ও পক্ষপাত এই অসন্তোষের কারণ। এই জন্য সমগ্র জগৎ আজ এই ধনের আবদ্ধতামূলক দাসত্বের জ্বালায় অধীর। ধন যেখানে মানবের হস্তে আবদ্ধ, সেইখানেই দাসত্ব। ধন

মুক্ত না থাকিলে স্বাধীনতাও নাই। মনে কর তোমার বাড়ীতে একটী আম্রবৃক্ষ আছে। ইহার ফল পাকিলে কি তুমি সমস্ত পাও? কখনই নহে। কতক পোকায় খায়, কতক পক্ষীতে খায়। পক্ষী যখন রাত্রিকালে ইহাতে শয়ন করে, তখন সে মনে করে বৃক্ষটী তাহার। এইরূপে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ সকলেই আমাদের ধান্যক্ষেত্রগুলিকে তাহাদের নিজস্ব সম্পত্তি মনে করে। অতএব জগতের কোনও বিষয়ই মানবের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। এইজন্য একটী ভোগ্যবস্তুতেও, মানবের অধিকার নাই। অধিকারবোধ কেবল অহঙ্কারজনিত ভ্রান্তি। যেদিকে চাও সেইদিকেই দেখিবে যে, সমস্ত সম্পত্তি শ্রীভগবানের। প্রকৃতির ক্রিয়াতে ইহাদের বিন্যাস ব্যবস্থা হয় এবং প্রকৃতির ক্রিয়াতেই মানব ইহাদিগকে পাইতে আকাঙ্খা করে। তুমি যে সম্পত্তিকে "আমার" "আমার" মনে কর, তাহা তোমার অহঙ্কারজনিত ভ্রান্তি। কিন্তু মরিয়া গেলে কিছুই তোমার সঙ্গে যায় না। আবার জন্মকালেও কিছু লইয়া আস নাই। অনেক সময় আশা পূর্ণ না করিয়াই মরিয়া যাও। এই কারণে বুঝা যায় যে, বিষয়গুলি তোমারও নহে, তাহারও নহে, পশু-পক্ষীরও নহে। এক অনির্ব্বচনীয়া প্রকৃতি ইহার বিন্যাসকর্ত্রী, এবং অনির্ব্বচনীয়া প্রকৃতিই ইহাদের সহিত তোমার ও পশুপক্ষীগণের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্রী। এই অবস্থায় যে বিষয়রাশিতে কোনও জীবেরই কোনও অধিকার নাই, তাহাতে 'আমার' 'আমার' বোধ করিয়া আদর্শ নির্ম্মাণ করতঃ তন্মূলে একটা নবজীবন কল্পনা করার তোমার অধিকার কোথায়? তুমি বলিতে পার যে, এইগুলির উপর আমার অধিকার থাকিবে না কেন? ইহাদিগকে পাইবার জন্য আমার স্বাভাবিক আকাঙ্খা জন্মে এবং পাইলে, এই সকল বিষয় দ্বারাই আমি সুখ পাই। এই অবস্থায় আমি মনে করি যে, আমার ভোগের জন্যই

বিষয়গুলি তাহাদের রূপ-রস-গন্ধ ও স্পর্শ লইয়া জগতে বিন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু ইহা ভুল। যেখানে অধিকার থাকে সেইখানে সুখও নিরবচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। কিন্তু বিষয় লাভে তোমার সুখ কোথায়? বরং ইহাতে দুঃখের মাত্রাই অধিক থাকে। যদি বল যে, এই দুঃখ পূর্ণতা-লাভের জন্য কল্পিত, তাহা হইলেই স্বীকার করিলে যে, যাহা পূর্ণতার প্রতিকূল তাহাই দুঃখাত্মক। সুতরাং দুঃখটা পূর্ণতাবিরোধী অনধিকার-চর্চ্চার ফল। অধিকার শব্দের যদি কোনও অর্থ থাকে, তাহা হইলে তাহা সুখকে অবাধ করিবে এবং দুঃখকে বাধা দিবে। ধর, পৈতৃক সম্পত্তিতে তোমার ন্যায্য অধিকার আছে বলিয়া তুমি মনে কর। এই অধিকারবোধের অর্থ এই যে, এই সম্পত্তি ভোগ করার জন্য তোমার কোনও বাধা থাকিতে পারে, এই কল্পনাই তুমি কর না। যে মুহূর্ত্তে এক প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া তাহাতে বাধা দেয়, সেই মুহূর্ত্তেই ঐ বাধা প্রশমিত না হওয়া পর্য্যন্ত, তোমার অধিকারবোধ খর্ব্ব হইয়া যায়। বস্তুতঃ, বিষয় ভোগ করার জন্য কাহার কতটুকু অধিকার আছে, তাহা মানবের স্বভাবগত ভোগে কণ্টক দিয়া প্রকৃতিই মানবকে বুঝাইয়া দেন। প্রত্যেকেই ভাল জিনিষটা নিজে পাইতে চায় এবং অপরে তাহাতে হিংসায় মরে। এই হিংসাই মানবকে বুঝাইয়া দেয় যে, মানব ভোগের অধিকারী নহে, কর্ম্মের অধিকারী। ভোগের অধিকার থাকিলে মানুষ একে অন্যের ভোগে কখনই হিংসা করিত না। কথা এই যে, বিধাতা এই জগতে বিষয়রাশিকে বিন্যস্ত করিয়া জগদ্বাসী প্রাণীর ভোগের নিমিত্ত এক তহবিল নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে কে কত ভোগ করিবে তাহা তিনিই প্রাণীর কর্ম্মানুসারে নির্ণয় করিয়া দেন। এই অবস্থায় কে কত ভোগের অধিকারী, তাহা মানুষ নির্ণয় করিতে পারে না। সে কেবল একটা বিষয়সেবাসঙ্কল্প লইয়া ভ্রান্তভাবে নিজের জীবনের

একটা আদর্শ নির্ম্মাণ করে, এবং তন্মূলে বিধাতার তহবিলে হস্তক্ষেপ করে। ইহাতেই জীবন সংগ্রাম হইয়া দাসত্বের উৎপত্তি হয়। প্রথমতঃ দেখ, ঐ লাঙ্গলবাহী কৃষক ফসল উৎপাদন না করিলে কাহারও বাঁচিবার উপায় থাকে না এবং কৃষকও রাজা কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইলে ফসল উৎপাদন করিতে পারে না। তারপর রাজাই বল আর কৃষকই বল, কেহই শ্রমিকের সেবা না পাইলে সুস্থ অবস্থায় থাকিতে পারে না। মানবপ্রকৃতির এই অবস্থার দরুণই কৃষক, শ্রমিককে দাস করিতে চায়, এবং শ্রমিকও কৃষককে দাস করিতে চায়। সর্ব্বোপরি রাজা—সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন বলিয়া, সকলকেই দাস করিতে চাহেন। এইরূপে তাঁহারা যখন ধনকে নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করিতে সঙ্কল্পিত হন, তখনই ধন আবদ্ধ হয়। ধনের এই আবদ্ধতাই জীবনকে সংগ্রামে পরিণত করিয়া ইহাকে একটা দাস-জীবনে পরিণত করে। সুতরাং স্বাধীনতা আবদ্ধতার ভিতরে নাই। আমাদের শাস্ত্রকার বলেন যে, প্রকৃতির এই বন্ধনশীলতার ভিতরেই এমন একটা মুক্তিপরায়ণতা বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহা ঐ মাতৃস্নেহের ভিতরে দেখা যায়। এই স্নেহ স্তন্যদুগ্ধের কর্ষণ ও দানের দ্বারা যেমন কৃষকের কার্য্য করে, তেমনই ইহা সেবাপরায়ণতা দ্বারা শ্রমিকের কার্য্য করে। আবার মার্জ্জারাদি হইতে শিশুকে রক্ষা করিয়া ইহা রাজার কার্য্য করে। বলা বাহুল্য যে, যুগপৎ এই তিন কার্য্যই শিশুর দুঃখমোচনের কারণ হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, মানুষ যদি মাতৃবৎ স্নেহাত্মকভাবে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করে, তাহা হইলে কেহ কাহারও দাস হয় না এবং এই পরনির্ভরশীলতাই আত্মনির্ভরশীলতাতে পরিণত হইয়া জীবনসংগ্রামকে দূর করিয়া দেয়। ধনের মুক্তাবস্থাই স্বাধীনতা। এইখানে স্বাধীনতাটা কোথায় তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখ। শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন্যও

মাতার ক্রোড়ই একমাত্র ধন। মাতৃস্নেহ এই ধনকে এমনভাবে উন্মুক্ত রাখে যে শিশু যখন ক্রন্দন করে, তখনই সে ইহা প্রাপ্ত হয়। এদিকে স্নেহই মাতাকে বলিয়া দেয় যে—স্তন্যদুগ্ধই বল, আর তোমার ক্রোড়ই বল, কিছুই তোমার নিজের বস্তু নহে। ইহারা ঈশ্বরদত্ত ধন। এই ধন শিশুর জন্যই ভগবান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। স্নেহ যখন মাতৃহৃদয়ে এই জ্ঞান জন্মাইয়া মাতা দ্বারা শিশুকে স্তন্যদান ও আশ্রয় দান করায়, তখন এই দুইটী ধনের একটা মুক্তাবস্থাই হয়। ধনের এই মুক্তাবস্থায় ভগবান্ ইহার মালিক থাকেন, অপর সকলের মালিকী ইহাতে অস্বীকৃত হন। ধন কাহারও দাস নহে। মানুষই ধনের দাস। এই অবস্থায় মানুষ কখনও ধনের মালিক হইতে পারে না। এই কারণে সে যখন ইহার মালিকীর দাবী করিয়া ইহাকে আপনার জ্ঞানে কেন্দ্রীভূত ও আবদ্ধ করে, তখনই সমাজে দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যখন সে ইহাতে আমার-আমার বোধ করে না এবং স্বোপার্জ্জিত বিত্তকেও বিশ্বের রক্ষার নিমিত্ত ভগবানের দান বলিয়া মনে করে, তখন ধন কেন্দ্রীভূত হইলেও তাহা আবদ্ধ হয় না ; পরন্তু এই ধন স্ত্রীপুত্র, পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া দানযজ্ঞমূলে সর্ব্বত্র বিলি হইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া শিশুর স্বাধীনতার ন্যায় বিশ্বের স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। এইরূপে আমাদের শাস্ত্রকার সমাজে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া—ইহাতে মাতৃবৎ-স্নেহাত্মকভাবমূলক পরার্থপরতার মধ্যে মানব-স্বাধীনতার বীজরূপী ধর্ম্মনির্ণয়ক্রমে এই দেশে এক বিশিষ্ট স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। সেই স্বাধীনতামূলেই আমাদের জাতীয় জীবন নির্ম্মিত হইয়া সেই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাপককর্ম্মগুলি, সনাতনধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মাতৃস্নেহরূপিণী প্রকৃতির প্রেরণা ইহার বীজ বলিয়া ইহা অপ্রেরিত-হিতকর-নীতি। শুক্রাচার্য্য এই ধর্ম্ম-

নীতিই রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত রাখার নিমিত্ত প্রত্যেক রাজাকে উপদেশ করিয়াছেন। এই শ্লোকে "আত্মহিতায়" কথা দ্বারা রাজাগণকে বুঝান হইয়াছে যে, হে রাজন্যমণ্ডলী! তোমাদের নিজের হিতের জন্যই আমি এই উপদেশ করিতেছি। অন্যথা একবার যদি নিজে স্বার্থপর হইয়া প্রজার স্বার্থপরতার প্রশ্রয় দাও, তাহা হইলে পরিণামে তোমার রাজ্যে বিপ্লব অনিবার্য্য।

এইখানে রাজন্যমণ্ডলীরপক্ষ হইতে আপত্তি হইতে পারে যে, তবে কি আমাদিগকে বৈরাগী হইতে হইবে? কিন্তু তাহা নহে। বৈরাগী হইতে হইলে 'সর্ব্বরাষ্ট্রং' কথা ব্যবহৃত হইত না। সমগ্র রাষ্ট্র কখনও এক যোগে বৈরাগী হয় না এবং মাতা আপন পুত্রের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন বলিয়া তিনিও সন্ন্যাসিনী নহেন। এইখানে মানবজীবনের প্রতি একটা পরার্থপরতামূলক দৃষ্টিভেদই কথিত হইয়াছে। যাগযজ্ঞ ইহার মূল। প্রথমতঃ 'বিষয় আমার নহে' এই কল্পনাই মানুষকে বুঝাইয়া দেয় যে, মানবের মধ্যে পরস্পর দ্বেষের ভাব একটা পাপ। এই বোধ তাহাকে ঈশ্বরের শরণাগত করে। তখন মানুষ ঈশ্বরের উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের যোগ্য হয় এবং এই যোগ্যতা হেতু, সে তাহার ভোজ্য অন্নও তাঁহাকে না দিয়া খাইতে চাহে না। ইহাতেই সে বুঝিতে পারে যে, ধন মাত্রই ভগবদ্দত্ত। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ইহা আমার হাতে আসে নাই। বিশ্বের প্রয়োজনে আমি ইহা বিলি করার কর্ত্তা হইয়াছি। ইহা দ্বারা যজ্ঞই আমার কর্ম্ম। আমি কেবল প্রসাদের অধিকারী মাত্র। এইরূপে ভোগটা মানবের নিষ্কণ্টক হইয়া তাহাকে কর্ম্মে অভ্যস্ত করে। তারপর কর্ম্ম তাহাকে ইন্দ্রিয়সংযমে অভ্যস্ত করিয়া তাহার অহঙ্কার বিদূরিত করে। তখন সে বুঝিতে পারে যে, জগৎ রণক্ষেত্র নহে, ইহা কর্ম্মক্ষেত্র।

অতএব "বিষয় আমার নহে" এই কথা আমাদিগকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেয় না। ইহা প্রথমতঃ আমাদিগকে দ্বেষ, হিংসা, পরিত্যাগ করাইয়া সমাজের ভোগরাশিকে নিষ্কণ্টক করে। দেখ, তুমি ভোগ করিতেছ দেখিলে যদি আমি কষ্ট বোধ করি এবং আমি ভোগ করিতেছি দেখিলে তুমি যদি কষ্ট ভোগ কর, তাহা হইলে বুঝা গেল যে, ভোগ নিষ্কণ্টক নহে। বিষয়গুলিকে যদি বিশ্বনাথের সম্পত্তি বলিয়া মনে করিয়া লও এবং যাহা পাও তাহাই যদি তুমি তাঁহার উদ্দেশে ত্যাগ করিয়া ভোগ কর তাহা হইলে কর্ম্মই তোমাকে দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে অভ্যস্ত করিবে এবং দ্বেষ বস্তুটা সমাজে নিন্দিত হইয়া সমাজের ভোগটা নিষ্কণ্টক হইবে। যদি সমষ্টিগত বৈষয়িক উন্নতির কোনও ভিত্তি থাকে, তবে ইহাই সেই ভিত্তি।

অধিকারবোধ ও কর্ত্তব্যতা

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এইখানে মানবজীবনের উপর একটা দৃষ্টিভেদ কল্পিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, তুমি নিজের অধিকার কতটুকু তাহা চিন্তা করিও না। এই চিন্তার কোনও পার নাই। কারণ এই জগতে বিধাতার যে তহবিল আছে, তাহা হইতে কতটুকু তোমার ভোগ্য, তাহার হিসাব তোমার নিকট নাই। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলের জন্য বিধাতার এই তহবিল রহিয়াছে। এই তহবিল হইতে যাহাই তুমি গ্রহণ কর না কেন, তাহাতেই তুমি চোর সাব্যস্ত হইবে। মাতা যদি নিজের স্তন্য নিজে পান করেন, তবে তিনি যেমন চোর, তুমিও তেমনি চোর। বিধাতা এই চুরির প্রশ্রয় দিতে চাহেন না বলিয়াই একের ভোগে অপরের হিংসা হইয়া, জগতে জীবনসংগ্রাম হয়। বস্তুতঃ জীবনসংগ্রাম মানুষের কর্ম্ম নহে, ইহা দস্যুর কর্ম্ম।

মানুষের কর্ম্ম ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া অন্তরে একটা মাতৃবৎ-স্নেহাত্মক ভাব জাগ্রত করা। অন্যথা স্বার্থবুদ্ধি আসিয়া জীবনকে সংগ্রামে পরিণতকরতঃ ধনকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে এবং ধনের এই আবদ্ধতামূলে সমাজে দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, যিনি মানুষকে ধন পাওয়াইয়া দেওয়ার জন্য কৃপাদ্বারা দ্রবীভূত হন, তিনিই ধর্ম্ম। কথার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহার অর্চ্চনা হইলে মানবমনের স্বার্থবুদ্ধি প্রশমিত হইয়া, তাহাতে একটা প্রেমের ভাব জাগ্রত হয়, তিনিই ধর্ম্ম। এই প্রেমই মানুষকে কৃপা দ্বারা দ্রবীভূতকরতঃ ধনকে কাহারও অধীন হইতে দেয় না, পরন্তু ইহাকে মুক্ত রাখিয়া সর্ব্বত্র বিলি হইয়া যাওয়ার কারণ ঘটায়। সকলের প্রতি প্রেমের ভাব সত্য ও ন্যায়পরতার উৎপত্তি করে, এবং এই সত্য ও ন্যায়পরতামূলে প্রত্যেকে প্রয়োজনীয় ধন প্রাপ্ত হয়। কেহ অনাবশ্যকরূপে ধন প্রাপ্ত হইয়া জীবনকে অযথা ব্যয়বাহুল্যসম্পন্ন করার প্রশ্রয় পায় না, এবং প্রত্যেকের সুখে প্রত্যেকে সুখী হয়।

অতএব যিনি অর্চ্চিত হইয়া মানবমনে মাতৃবৎ-স্নেহাত্মকভাব জাগ্রত করেন তিনিই ধর্ম্ম। কেন না, তাঁহার অর্চ্চনামূলেই সত্যাদি ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এই কারণে সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী পরমেশ্বরের অর্চ্চনা দ্বারা ধনকে মুক্ত রাখিয়া, মানবজাতির স্বাধীনতা রক্ষাই প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য। এই অর্থে ঈশ্বরের আরাধনাত্মক-কর্ম্ম ব্যতীত মানবের আর কোনও কর্ম্ম নাই। আমাদের শাস্ত্রে এই সকল ঈশ্বর আরাধনাত্মক কর্ম্মের নাম যজ্ঞ। এই কারণে গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মনোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

গীতা ৩য় অধ্যায় ৯ শ্লোক।

অনুবাদ :—মনুষ্য ভগবদারাধনাত্মক কর্ম্ম না করিয়া অন্যথা অনুষ্ঠান করিলে তাহার কর্ম্মবন্ধন হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি সেইজন্য ফল কামনা রহিত হইয়া ভগবানের সেবাত্মকযজ্ঞার্থকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান কর।

ইহাই মানবের কর্ত্তব্যতা। এই কর্ত্তব্যতায় বিষয়ভোগে মানবের কোনও অধিকার নাই। ইহা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার উপর নির্ভরক্রমে তাঁহার অর্চ্চনাই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যতামূলেই "মুক্তসঙ্গ" কথা ব্যবহৃত হইয়া, ফলাশাবর্জ্জিতভাবে যজ্ঞ করার ব্যবস্থা এই শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে আমি খাইব কি? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

গীতা ৩য় অধ্যায় ১৩ শ্লোক

অনুবাদ :—যাঁহারা যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। যে পাপাত্মা পুরুষগণ কেবল নিজের জন্যই পাক করিয়া থাকে, তাঁহারা পাপই মাত্র ভোজন করিয়া থাকে।

শাঙ্করভাষ্য :—দেবযজ্ঞাদীন্নির্ব্বর্ত্ত্য তচ্ছিষ্টমশনমমৃতাখ্যমশিতুং শীলং যেষাং তে যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈশ্চুল্ল্যাদি পঞ্চসূনা কৃতৈঃ। প্রসাদ হিংসাজনিতৈশ্চান্যৈঃ। যে ত্বাত্মম্ভরয়ো ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপং। স্বয়মপি পাপাঃ। যে পচন্তি পাকং নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি। আত্মকারণাদাত্মহেতোঃ।

অস্যার্থ :—দেবযজ্ঞাদিকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া তদবশিষ্ট অমৃতাখ্য অন্ন-ভক্ষণশীল মনুষ্যগণকে যজ্ঞশিষ্টাশী সাধু বলা যায়। এই সাধুগণ সর্ব্ব পাপ হইতে অর্থাৎ চুল্ল্যাদি পঞ্চসূনাকৃত প্রমাদ-হিংসাজনিত সর্ব্বপ্রকার

পাপ হইতে মুক্ত হয়। যাহারা আত্মম্ভরি অর্থাৎ কেবল নিজের জন্য পাক করিয়া খায়, তাহারা পাপ ভোজন করে।

৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও এই দেশে উচ্চ শ্রেণীর প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে গৃহদেবতা দেখা যাইত। এই গৃহদেবতা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যবস্থার পঞ্চমহাযজ্ঞের শেষ নিদর্শন। পঞ্চযজ্ঞ যথা :—

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাশক্তিং ন হাপয়েৎ॥

মনু ৪র্থ অধ্যায়, ২১ শ্লোক

বেদাধ্যয়ন ও সন্ধ্যোপাসনাদির নাম ঋষিযজ্ঞ। অগ্নিহোত্রাদি দেবযজ্ঞ।

বলি বৈশ্বদেব ভূতযজ্ঞ। অন্নাদি দ্বারা অতিথিসৎকারের নাম নৃযজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধতর্পনাদি পিতৃযজ্ঞ। এই সমুদয় যথাশক্তি সম্পন্ন করিবে, কখনও পারত্যাগ করিবে না।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ না করিয়া প্রাচীন কালের বর্ণাশ্রমী-গৃহস্থ ভাত খাইতেন না। বৌদ্ধ বিপ্লবের পর আশ্রমধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া, এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ লুপ্ত হইয়াছিল। তারপর পুনরায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে, যদিও এই সকল যজ্ঞ কতক কতক আচরিত হইত, তথাপি আশ্রমধর্ম্ম আর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, এই সকল যজ্ঞ লুপ্ত হইয়া স্থাপিত গৃহ-দেবতা মাত্র অবশিষ্ট ছিল। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের উদ্দেশ্য প্রমাদ হিংসা-জনিত পঞ্চসূনাদি পাপের নিবৃত্তি। পঞ্চসূনা পাপ যথা :—

গৃহস্থদিগের উদূখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভী ও ঝাঁটা—এই পাঁচ প্রকার জীবহিংসার স্থান আছে। ইহাদিগকে সূনা বলে। সূনা শব্দের অর্থ বধের স্থান। এই জীবহিংসা, প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতাবশতঃ হইয়া থাকে এবং অবস্থানুসারে এই অনবধানতাও মানবের অনিবার্য্য।

এই অনিবার্য্য পাপের নিবৃত্তি নিমিত্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা। সন্দেহ-বাদী এইখানে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ইহা যখন অনিবার্য্য, তখন আবার ইহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে কেন? এবং হইলেই বা পঞ্চ মহাযজ্ঞের দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? বস্তুতঃ এই সম্বন্ধে অনেক বিচার হইয়াই স্থির হইয়াছে যে, হিংসা সকল ক্ষেত্রেই মানুষের পক্ষে পাপ। আলোচ্যক্ষেত্রের হিংসা মানবের জীবনরক্ষার জন্য অনিবার্য্য সন্দেহ নাই। তথাপি পশুপক্ষীর জীবনরক্ষামূলক হিংসায় পাপ না থাকিলেও মানুষের পক্ষে তাহা আছে। আজ এই হিংসা অনিবার্য্য, কাল ঐ হিংসা অনিবার্য্য এইরূপ চিন্তা দ্বারা অন্তর নৃশংস হইয়া উঠে। এই নৃশংসতাই পাপ। চিত্তের এই নৃশংসতা দূর করার জন্যই সংসারীর পক্ষে ঈশ্বরনিষ্ঠা আবশ্যক। এই ঈশ্বরনিষ্ঠা লইয়া যদি তুমি পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা সর্ব্বদা নিজের চরিত্র শোধনে ব্যস্ত থাক, তাহা হইলে দেখিবে যে, জগতে তোমার বন্ধু ব্যতীত শত্রু নাই। প্রত্যেকেই ইহাতে আহার করিতে আসিয়াছে। সুতরাং জীবন তোমার সংগ্রাম নহে। ইহা প্রেমের জীবন। এই প্রেমের জীবনের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ভগবানের প্রসাদ ব্যতীত, অন্য কিছু গ্রহণ করার কোনও অধিকার মানবের নাই। এইরূপ চিন্তা মানবমনে উদয় হইয়া সে নির্লোভ হয়। এই নির্লোভ অবস্থায়, বিষয়গুলি তাহার দায়। যথা:—

এষ স্ত্রী-পুংসয়োরুক্তো ধর্ম্মো বো রতিসংহিতঃ।
আপদ্যপত্যপ্রাপ্তিশ্চ দায়ভাগং নিবোধত॥

মনু ৯ম অধ্যায় ১০৩ শ্লোক॥

অনুবাদ:—স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর অনুরাগযুক্ত যে ধর্ম্ম এবং অপুত্রত্ব ও আপৎকালীন পুত্রীকরনাদি যে ধর্ম্ম তাহা বলিলাম। এক্ষণে দায়ভাগ শ্রবণ কর।

এই শ্লোকের দায়ভাগ শব্দের ব্যাখ্যায় মেধাতিথি বলিতেছেন :—"দায় ধর্ম্মস্য বিভাগঃ দায়ভাগঃ" অর্থাৎ দায়রূপী ধর্ম্মের বিভাগই দায়ভাগ। সুতরাং এইখানে দায়িত্বরূপী ধর্ম্মের বিভাগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কথাটা পরবর্ত্তী আর একটী শ্লোকে আরও পরিষ্কার হইয়াছে।

এবং সহবসেয়ুর্ব্বা পৃথগ্বা ধর্ম্মকাম্যয়া
পৃথগ্বিবর্দ্ধতে ধর্ম্ম স্তস্মার্দ্ধর্ম্ম্যা পৃথক ক্রিয়া ॥

মনু ৯ম অধ্যায় ১১১ শ্লোক।

এইরূপে অবিভক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ একত্রে বাস করিবে। অথবা ধর্ম্মকামনায় পৃথক্ বাস করিবে। কেন না, পৃথক্ হইলে ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়, এইজন্য পৃথক্ হইয়া ক্রিয়া করাই ধর্ম্ম। এই শ্লোকে একান্নবর্ত্তী পরিবার অপেক্ষা, পৃথক্ পরিবারই প্রশংসিত হইয়াছে। কিন্তু আজকাল যে যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলি নিন্দিত হইতেছে, সেই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া পৃথক্ হওয়ার ব্যবস্থা এইখানে প্রদত্ত হয় নাই। এই শ্লোকের টীকায় কল্লুভট্ট বলিতেছেন—"এবমবিভক্তাভ্রাতরঃ সহ সংবসেয়ুঃ যদি বা ধর্ম্ম কামনয়া কৃতবিভাগাঃ পৃথগ্বসেয়ুঃ যস্মাৎ পৃথকগবস্থানে সতি পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চমহাযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানাদ্ধর্ম্মস্তেষাং বর্দ্ধতে তস্মাদ্বিভাগক্রিয়া ধর্ম্মার্থা। তথা চ বৃহস্পতি এক পাকেন বসতাং পিতৃদেব দ্বিজার্চ্চনং একং ভবেদ্বিভক্তানাং তদেব স্যাদ্‌গৃহে গৃহে।

অস্যার্থ :—এই প্রকারে অবিভক্ত ভাবে ভ্রাতৃগণসহ একত্রে বাস করিবে। যদি বা ধর্ম্ম কামনায় কৃতবিভাগ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বাস কর, তাহা হইলে পৃথগবস্থানে পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইয়া, তোমাদের ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে। এইজন্য বিভাগ ক্রিয়া ধর্ম্মার্থ।

এই সম্বন্ধে বৃহস্পতি বলিয়াছেন. যে, এক-পাকে যাহারা বসতি করে, তাহাদের পিতৃঅর্চ্চন, দেবার্চ্চন, দ্বিজার্চ্চন সমস্ত একই হইয়া থাকে; আর পৃথক্ হইলে তাহা গৃহে গৃহেই হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দায়ভাগটা স্বার্থের বিভাগ নহে, কর্ত্তব্যের বিভাগ এবং এই বিভাগই ধর্ম্ম বৃদ্ধির কারণ। তুমি যদি মনে কর যে, ঈশ্বর আমারই জন্য এই ভোগরাশি সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাঁহার পুত্রস্বরূপে এইগুলিকে আমার প্রাণপণে চাহিতে হইবে, তাহা হইলে তোমার দৃষ্টিটা কেবল ধনের দিকেই যায়, কর্ত্তব্যের দিকে যায় না, এবং তাহাতে সংযমের লেশমাত্রও থাকে না। ফলে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হয়। আর যদি মনে কর যে, এই ধন পাইয়া আমার কেবল দায়িত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র, তাহা হইলেই সংযম আসিয়া ধনটাকে দায়িত্বের অনুপাতে প্রার্থনা করিয়া লয়, এবং সেই সংযম হইতে ভ্রাতৃপ্রেম অক্ষুন্ন থাকিয়া যায়।

স্বাধীনতার পারিবারিক স্বরূপ—

যজ্ঞপূতঃ মাতৃবৎ-স্নেহাত্মক হৃদয় এই ভ্রাতৃপ্রেমের মূল। ইহাতে ভ্রাতা ভ্রাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে অভয় প্রদান করে, এবং সর্ব্ববিষয়ে ভ্রাতৃসেবা দ্বারা তাহার স্বার্থকে নিরাপদ রাখে। স্নেহ তাহাকে বলিয়া দেয় যে, আমি ভ্রাতার সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিব না এবং কোনও ক্ষেত্রেই তাহাকে বঞ্চনা করিব না। ভ্রাতৃসেবা দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করিব, এবং সন্তুষ্ট হইলে তিনি দাদার বুদ্ধিতে আবির্ভূত হইয়া, যাহা আমাকে দেওয়াইয়া দেন তাহাই ভোগ করিব। এইরূপে বিষয়গুলিকে দায়গণ্যে ভ্রাতৃহস্তে ভ্রাতৃস্বার্থ নিরাপদ ও স্বতঃসিদ্ধ থাকে। স্বার্থের এই স্বতঃসিদ্ধতাই স্বাধীনতা। ইহার কারণ এই যে, ধন এইখানে কাহারও

হস্তে আবদ্ধ নহে। ইহা মুক্ত থাকিয়া স্নেহাত্মক হৃদয়ের প্রেমধারা বর্ষণ-মূলে, সত্যাদি ধর্ম্ম দ্বারা জগৎকে পোষণ করে। ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার যে সম্বন্ধ, পিতা-পুত্রে, পতি-পত্নীতে, মাতাপুত্রে, ভ্রাতা-ভগিনীতেও সেই সম্বন্ধ। একই কর্ত্তব্যসূত্র ধর্ম্মবন্ধনরূপে মানুষকে মানুষের সহিত আবদ্ধ করিয়া, সম্বন্ধানুসারে একের স্বার্থ অপরের সেবাধর্ম্মরূপী কর্ত্তব্যতা দ্বারা, নিরাপদ ও স্বতঃসিদ্ধ হয়। যেখানে এই নিরাপদ ও স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা নাই, সেইখানেই জীবন সংগ্রাম হইয়া দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে মানব-স্বাধীনতা—সেবাত্মক, সংগ্রামাত্মক নহে। সেবা-ধর্ম্ম দ্বারা সত্যাদি ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় বলিয়া, সত্যাদিধর্ম্মই মানবস্বার্থকে স্বতঃসিদ্ধ করিয়া স্বাধীনতার উৎপত্তি করে। অতএব দেখা যায় যে, সত্য, ন্যায় প্রভৃতি ধর্ম্মের বীজ আমাদের মাতৃস্নেহের ভিতরে রহিয়া গিয়াছে। এই স্নেহ আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, হে মানব! এই জগতে আসিয়া যদি তুমি প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তি চাও, তাহা হইলে অন্তরে মাতৃবৎ স্নেহাত্মকভাব জাগ্রত করিয়া, সত্যাদি ধর্ম্মের জাগরণ কর। তাহা হইলে একের সহানুভূতি দ্বারা অপরের দুঃখ দূর হইবে। মানুষ অহঙ্কার বশে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইতে চায়, কিন্তু রোগ হইলে এই পা তাহার অচল হইয়া যায়। সুতরাং সহানুভূতি ও মমত্ববোধ মানবের দুঃখ দূর হওয়ার মূল। এই সহানুভূতি ও মমত্ববোধ আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, তুমি সত্য কথা বল এবং স্বার্থচিন্তা বিরহিত হইয়া পরের দুঃখ মোচন কর। এই নীতি কাহারও কর্ত্তৃক প্রেরিত নহে, এবং ইহা সর্ব্বজনের পক্ষে হিতকর বলিয়া, ইহা অপ্রেরিত হিতকর নীতি। এই নীতিই সমগ্র রাষ্ট্রে প্রচলিত করার জন্য ভগবান শুক্রাচার্য্য উপদেশ করিতেছেন। ইহাই মানবের স্বাধীনতা।

আচারই ধর্ম্ম

ধর্ম্মনীতিই অপ্রেরিত হিতকর নীতি

তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্ম্ম শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ বুঝাইতে যাইয়া, মহাভারত হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছিল, তাহাতে একটী কথার ব্যাখ্যা করা হয় নাই। এইজন্য এই শ্লোকটী এইখানে পুনরায় উদ্ধৃত করা হইল।—

ধনাৎ স্রবতি ধর্ম্মো হি ধারণাদ্বেতি নিশ্চয়ঃ।
অকার্য্যানাং মনুয্যেন্দ্র স সীমান্তকরঃ স্মৃতঃ॥

এই শ্লোকে "অকার্য্যানাং মনুয্যেন্দ্র স সীমান্তকরঃ স্মৃতঃ", কথাটীর এ যাবৎ ব্যাখ্যা করা হয় নাই। অকার্য্য কাহাকে বলে, তাহা না বুঝা পর্য্যন্ত, ইহার সীমা কোথায় তাহা বুঝা যায় না। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে, জীবন-সংগ্রামই অকার্য্য এবং আমাদের আচার বা যজ্ঞার্থ কর্ম্মগুলিই কার্য্য। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, অন্তরে যজ্ঞবুদ্ধির আবির্ভাব হইলেই অকার্য্যের সীমা নির্দ্ধারিত হয়। ধর্ম্মরূপী ভগবান্ আমাদের অন্তরে থাকিয়া প্রবৃত্তিরূপে এই সীমা নির্দ্ধারণ করেন। ইহাতে মনে হইতে পারে যে, যদি তাহাই হয় তবে পাশ্চাত্য দেশে যে ব্যক্তিত্বের (Individuality) প্রভাব আছে, তাহাই সত্য এবং শাস্ত্র মিথ্যা। ৺রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে, তিল তিল করিয়া দেশে এই বুদ্ধিই প্রবল হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভুল। ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি কর্ম্মক্ষেত্রে জীবন-সংগ্রামের উর্দ্ধে যাইতে পারে না। কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিতে গেলেই জীবনের একটা আদর্শ এই বিচারবুদ্ধিকে পরিচালিত করে। ইহার ফলে জীবনের একটা

বাঞ্ছিত অবস্থার সহিত উপস্থিত কার্য্যের সম্বন্ধ বিচারমূলে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ হয়। এই আদর্শটীর স্বরূপ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা স্বার্থবুদ্ধিরই একটা বাঞ্ছিত স্বরূপ। এই রূপটী প্রত্যেকে ব্যক্তি-গতভাবে দর্শন করে বলিয়া, একের কর্ত্তব্যবুদ্ধির সহিত অপরের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির সামঞ্জস্য হয় না এবং তন্মূলে একে অন্যকে প্ররোচনা (Propa-ganda) দ্বারা নিজ কর্ত্তব্যবুদ্ধির অনুগামী করার চেষ্টা করে। ফলে ইহাতে অকার্য্যের সীমা নির্দ্ধারিত না হইয়া, একটা জীবন-সংগ্রাম দ্বারাই কর্ত্তব্যবুদ্ধির ক্রিয়ারম্ভ হয়। তারপর এই ক্রিয়ার ফলে অকার্য্য সকল সাধিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, বিপ্লববাদী ও অহিংস-অসহযোগী উভয়েই ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ছিলেন। ইহাই বর্ত্তমান ভারতবাসীর জীবনের বাঞ্ছিত অবস্থা। কিন্তু এই অবস্থা কল্পনার মধ্যেও হিংস ও অহিংস বিপ্লববাদী—উভয়ের আদর্শ বিভিন্ন ছিল। তারপর আদর্শের এই বিভিন্নতা হেতু, কর্ত্তব্যবুদ্ধিও বিভিন্ন হইয়া পড়িল এবং এই বিভিন্ন কর্ত্তব্যবুদ্ধিমূলে বিভিন্ন প্ররোচনা চলিল। এই প্ররোচনার ফলে, উভয়েই দলবদ্ধ হইয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা আনিতে লাগিলেন। হিংস-বিপ্লববাদী, খুন-ডাকাতি দ্বারা রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা আনিলেন এবং পিতামাতার উপদেশকে ব্যর্থ করিয়া যুবক-যুবতীকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। ইহাই সামাজিক বিশৃঙ্খলা। পক্ষান্তরে, অহিংস-বিপ্লববাদী অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন দ্বারা রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিলেন, এবং প্ররোচনা দ্বারা পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ঘটাইলেন। সর্ব্বোপরি উভয় দলের কর্ম্মফলে, নারীজাতি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সমাজে গুরুতর বিশৃঙ্খলা আনিলেন। এই উচ্ছৃঙ্খলতামূলে দেশে যে সকল কার্য্য হইয়াছে, তাহা দেখিলে ও শুনিলে সমাজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই সকল কার্য্যকে যদি কেহ

জাতীয়তার প্রয়োজনমূলক অনিবার্য্য দোষ বলিয়া সমর্থন করেন, তাহা হইলে তদুত্তরে তাঁহাকে বলা যাইতে পারে যে, মহাশয়, আপনার দোষ-গুণজ্ঞান আদৌ নাই। কারণ দোষ যেখানে এইভাবে সমর্থিত হয়, সেইখানে কার্য্যাকার্য্য বিবেক থাকিতেই পারে না। আর যদি কেহ এই সকল কার্য্যকে অকার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম জিজ্ঞাস্য হইবে যে, দেশের কল্যাণরূপ সদুদ্দেশ্যজনিত কার্য্য সমূহের ফলে দেশে এইরূপ অকার্য্য সাধিত হইল কেন? বস্তুতঃ এই প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারিবেন না। জগতের গত ইতিহাস এবং বর্ত্তমানকালের ঘটনাবলী আলোচনায় দেখা যায় যে, আলেকজাণ্ডার হইতে আরম্ভ করিয়া, হিট্‌লার, মুসোলিনী পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই দেশের কল্যাণের জন্য কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন, এবং পরিণামে তাঁহাদের দ্বারা অকার্য্যসকলই সাধিত হইয়াছে। আমাদের দেশের হিংস ও অহিংস উভয় শ্রেণীর বিপ্লববাদীর কার্য্যও তদ্রূপ। এই অবস্থায় ইহা অবধারিত সত্য যে, ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধিমূলে কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় হইতে পারে না। অন্যথা অন্ততঃপক্ষে ইহাদের একজনের দ্বারাও কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের শাস্ত্রকার যজ্ঞার্থকর্ম্মকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়া, জীবন-সংগ্রামকে অধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যাকার্য্য বিচার, উপস্থিত একটা কার্য্যোপলক্ষে ব্যক্তিগত নির্দ্ধারণের দ্বারা হইতে পারে না। মৌলিক নীতির উপর কার্য্যাকার্য্যের বিচার নির্ভর করে। এই মৌলিক নীতি শ্রীভগবান্ নিম্নোক্ত শ্লোকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন :—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—২য় অধ্যায়, শ্লোক ৬২, ৬৩।

অনুবাদ :—মনের দ্বারা বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি হইতে কামনা, ও কামনা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধ হইতে সংমোহ এবং সংমোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম জন্মিয়া থাকে। স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মনুষ্য স্বয়ং বিনষ্ট হয়। এই মহাবাক্যের সহিত আলোচ্য দৃষ্টান্তটীর অবস্থা চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের আলোচ্য হিংস ও অহিংস বিপ্লববাদীগণ উভয়ই প্রথমতঃ দেশের মঙ্গল কামনায় ধ্যানস্থ হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কি উপায়ে এই দেশের উদ্ধার হইবে। তখন ভারতসাম্রাজ্যরূপী বিষয়ের সহিত ইহাদের সঙ্গ হইয়া, এই সাম্রাজ্যলাভের একটী কামনা হইল। ইহার নাম কাম। এই কাম হইতে এইরূপ একটী ক্রোধের উদ্রেক হইল যে, বিদেশীয়গণ এই দেশের সারবস্তু লইয়া যাইবে কেন? এই ক্রোধের ফলে মোহ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বলিয়া দিল যে, এই শোষণকার্য্য যে প্রকারে হউক প্রতিরুদ্ধ করিতে হইবে। তখন স্মৃতিবিভ্রম আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিপক্ষের স্বরূপ ভুলাইয়া দিল, এবং ভ্রান্তিবশতঃ বুদ্ধিনাশহেতু তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না যে, কিরূপ আয়োজন লইয়া এবম্বিধ প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধে নামিতে হয়। তারপর যুদ্ধে নামিয়া যে ফল হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন।

সুতরাং এই যুদ্ধের যে ফল হইয়াছে তাহাকে অকার্য্যের ফল বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। ভারতসাম্রাজ্যরূপী বিষয়ের ধ্যান হইতে এই সকল অকার্য্যের আরম্ভ হইয়াছে, এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলায়

ইহাদের পরিণতি হইয়াছে। কিন্তু তথাপি দেশের কেহই এখন পর্য্যন্ত এই ধ্যানকে অকার্য্য বলিয়া মনে করেন না। কারণ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি এই ধ্যানের অতীত হইয়া কোনও বিষয় চিন্তা করিতে পারে না। এই কারণেই বলিতেছিলাম যে, জগতের এই কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি জীবনসংগ্রামরূপী পাপের অতীত হইতে পারে না। তারপরে এই দুর্ণীতিই সর্ব্বপাপের উৎপত্তি করে। প্রতি-ক্ষেত্রেই জীবনের একটা কল্পিত সুখকর অবস্থা চিন্তা করিয়া মানুষ কর্ম্ম করে এবং এই সুখকর অবস্থা আনিতে যাইয়া অকার্য্য সকল সম্পন্ন করে। ইদানীং জার্ম্মানীতে হের্ হিট্‌লার যে সকল অকার্য্যসাধন করিয়াছেন তাহারও উদ্দেশ্য, দেশে একটী সুখকর অবস্থা আনায়ন করা। এইখানে প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন যে, হিট্‌লারের কার্য্যগুলিকে আমরা অকার্য্য বলিব কি প্রকারে? এই সকল কার্য্যদ্বারাই আজ জার্ম্মানী পুনরায় এই জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদিগকেও এইরূপ অকার্য্য করিয়াই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তদুত্তরেই মনু বলিয়াছেন যে, ইহা মস্তকোত্তলন নহে; পঙ্কে পতিত গাভীর পদোত্থোলন। আমরাও এইরূপ দাসত্ব-পঙ্কে নিমুর্জ্জিত হইয়া যখন হিংস ও অহিংস উভয় প্রকার বিপ্লববাদ অবলম্বন করিয়াছিলাম, তখন এইরূপ একটা পদোত্থলন চেষ্টাই হইয়াছিল। কিন্তু পরাজয় হেতু তাহাও হইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে হিটলার তাঁহার পদোত্থলন কার্য্যে জয়লাভ করিয়াছেন। কিন্তু অপর তিন পদঃপঙ্কে ডুবিয়া রহিয়াছে। তাহার ফল পরে ফলিবে।

এককথা ও বহুকথার ব্যাখ্যা

বস্তুতঃ, বিষয়ধ্যানের ফল যে দাসত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। যজ্ঞবুদ্ধি এই ধ্যানের সীমানির্দ্ধারণক্রমে

অকার্য্যসকলের সীমা নির্দ্ধারণ করে। এই যজ্ঞবুদ্ধি হইতে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই ধর্ম্ম বা আচার। ব্যক্তি তাহার জীবনের সুখকর অবস্থার কল্পনা ছাড়াইতে পারে না বলিয়া, তাহার দ্বারা ধর্ম্ম নির্ণয় হয় না। কাম তাহার শত্রু। এই শত্রু জ্ঞানকে আবৃত করিয়া মানুষকে অজ্ঞানতারূপ পঙ্কে ডুবাইয়া দেয়। ইন্দ্রিয়-সংযম ও মনের সংযম দ্বারা বুদ্ধির অতীতভাবে বুদ্ধিতে অবস্থিত পরমাত্মার ধ্যান এই কাম পরাজয়ের উপায়। এইজন্য শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ব্যবসয়োত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

গীতা ২য় অধ্যায় ৪১ শ্লোক।

অনুবাদ:—হে কুরুনন্দন! নিষ্কাম কর্ম্মযোগে কেবলমাত্র ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই থাকে। আর সকাম কর্ম্মযোগীগণের বুদ্ধি, বহুশাখাবিশিষ্ট হইয়া অনন্তরূপ ধারণ করে।

এইরূপে আত্মতত্ত্বের ব্যবসায়ী সাধকগণের বুদ্ধি এককথামূলক এবং অব্যবসায়ী বিষয়বুদ্ধি বহুকথামূলক। ব্যবসায়ীগণ এককথার ব্যবসা করিয়া:—

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

গীতা ২য় অধ্যায় ৪৬ শ্লোক।

এইরূপ নিগৃহীতচিত্ত পুরুষ রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত স্ববশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিলেও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।

এই প্রসাদভাবসম্পন্ন পুরুষগণের কর্ণে নিত্যসত্যরূপী বেদ, নাদরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম নির্ণয় করাইয়া দেন। এই বেদই আমাদের এককথার মূল। বেদধ্বনি অবলম্বনে এই দেশের পারম্পর্য্য ক্রমাগত সাধুমহাত্মাগণ ধর্ম্মনির্ণয় করিয়া, নিজের জীবনে যে সকল আচার পালন করতঃ, অন্তরে মাতৃবৎ স্নেহাত্মকভাব জাগ্রত রাখিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, সেই সকল আচারের নামই ধর্ম্ম। যথা :—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেগরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যোধর্ম্মস্তন্নিবোধত ॥

মনু ২য় অধ্যায় ১ম শ্লোক।

অনুবাদ :—হে মহর্ষিগণ! আপনাদের জিজ্ঞাসিত ধর্ম্মের মধ্যে প্রধান ধর্ম্ম আত্মজ্ঞান কথিত হইল। এক্ষণে তাহার অঙ্গস্বরূপ সংস্কারাদি-ধর্ম্ম প্রতিপন্ন করিবার মানসে ভগবান্ মনু সামান্যতঃ ধর্ম্মের লক্ষণ কহিতেছেন, আপনারা অবধান করুন। বেদপ্রতিপাদ্য অপবর্গাদি শ্রেয়ঃ-সাধন কর্ম্মসমূহকে ধর্ম্ম বলা যায়; যে ধর্ম্ম রাগদ্বেষবিহীন সাধুবিদ্বানেরা একান্তে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন। আর বেদ প্রতিপাদ্য পাপ-সাধন ক্রিয়াকলাপকে অধর্ম্ম বলা যায়। মেধা তিথি কৃত ভাষ্য যথা,—

বিদ্বাংসঃ শাস্ত্রসংস্কৃতমতয়ঃ প্রমাণ—
প্রমেয়স্বরূপবিজ্ঞান কুশলাঃ। তে চ
বেদার্থবিদো বিদ্বাংসো নান্যে। যতো
বেদাদন্যত্র ধর্ম্মং প্রতি যে গৃহীত প্রামাণ্যাস্তে
বিপরীতপ্রমাণপ্রমেয় গ্রহনাদবিদ্বাংস এব।
এতচ্চ মীমাংসাতত্ত্বতো নিশ্চীয়তে।
সন্তঃ সাধবঃ প্রমাণপরিচ্ছিন্নার্থানুষ্টায়িনো

হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারার্থায় যত্নঃবন্তঃ। হিতাহিতঞ্চ দৃষ্টং প্রসিদ্ধং। অদৃষ্টঞ্চ বিধিপ্রতিষেধলক্ষণং। তদমুষ্ঠানবাহ্যা অসন্তঃ উচ্যন্তে। অত উভয়মত্রোপাত্তং জ্ঞানমনুষ্ঠানঞ্চ। বিদ্যমানতাবচনঃ সচ্ছব্দো ন সংভবত্যানর্থক্যাৎ যদ্ধি যেন সেব্যতে তত্তেন বিদ্যমানানৈব। সেবানুষ্ঠানশীলতা। ভূতপ্রত্যয়েনানাদিকালপ্রবৃত্ততামাহ। নায়মষ্টকাদিধর্ম্মোঽদ্যত্বে কেনচিৎ প্রবর্ত্তিত ইতরধর্ম্মবদেতদেব নিত্যশব্দেন দর্শয়তি যাবৎ সংসারমেষধর্ম্মঃ। বাহ্যধর্ম্মাস্তু সর্ব্বে মূর্খদুঃশীলপুরুষ প্রবর্ত্তিতা কিয়ন্তং কালং লব্ধাবসরা অপি পুনরন্তর্ধীয়ন্তে। নহি ব্যামোহো যুগসহস্রানুবর্ত্তী ভবন্তি। সম্যগজ্ঞানবিদ্যয়া সংচ্ছন্নমপি তৎক্ষয়ে নির্ম্মলতামবৈতি ; ন হি তস্য নির্ম্মলতয়া ছেদঃ সম্ভবতি ইতি। অদ্বেষ রাগিভিরিদং ধর্ম্মানুষ্ঠানে দ্বিতীয়কারণম্। ব্যামোহঃ পূর্ব্বমুক্তঃ। অনেন লোভাদয় উচ্যন্তে রাগদ্বেষপ্রহাণস্য আবশ্যকতা প্রদর্শনার্থত্বাৎ। লোভেন মন্ত্রতন্ত্রাদিষু প্রবর্ত্তয়ন্তি। অথবা রাগদ্বেষো লোভোঽন্তর্ভূতঃ। আত্মনি যে ভোগোপযোগাশয়েন জীবিতুমসমর্থা লিঙ্গধারনাদিনা জীবন্তি। তদুক্তং ভস্মকপালাদিধারণং নগ্নতা কাষায়ে চ বাসসি বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকেতি। দ্বেষো বিপরীতানুষ্ঠানকারণম্। দ্বেষপ্রধানা হি নাতীবং তত্ত্বাবধারণে সমর্থা ভবন্ত্যতোঽধর্ম্মমেব ধর্ম্মত্বেনাধ্যবস্যন্তীতি। অথবোভাবপি রাগদ্বেষৌ তত্ত্বাবধারণে প্রতিবন্ধকৌ। সত্যামপি কস্যাঞ্চিচ্ছাস্ত্রবেদন মাত্রায়াং লব্ধেঽপি বিদ্বদ্ব্যপদেশে রাগদ্বেষবত্তয়া বিপরীতানুষ্ঠানং সংভবতি। জানানা অপি যথাবচ্ছাস্ত্রং কস্যচিদ্দেষ্যস্যোপঘাতায় প্রিয়স্য চোপকারায় কৌটসাক্ষ্যাদ্যধর্ম্ম সেবন্তে তেষাং বেদমূলমেবানুষ্ঠানমিত্যশক্য নিশ্চয়ং কারণান্তরস্য রাগদ্বেষলক্ষণস্য সংভবাদতস্তৎ প্রতিষেধঃ। অত্রচোচ্যতে সদ্ভিরিতি সচ্ছব্দঃ সাধুতাবচনো বর্ণিতঃ। কীদৃশী চ সাধুতা তস্য যদি রাগদ্বেষাভ্যামধর্ম্মে প্রবৃত্তি সংভাব্যতে তস্মাদদ্বেষরাগিভিরিতি ন

বক্তব্যম্। এবং তর্হি হেতুত্বেনোচ্যতে। যতোরাগাদি বর্জ্জিতা অতঃ সন্তো ভবন্তি। রাগদ্বেষপ্রধানত্বাভাবশ্চাত্র প্রতিপাদ্যতে। ন সর্ব্বেন সর্ব্বতোভবে যোগ্যাবস্থাগতস্যহেতোর্নিরন্বয়মুচ্ছিদ্যতে। তথা চ শ্রুতি ন হি বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়া প্রিয়য়োরপহতিরস্তীতি। রাগো বিষয়োপভোগগৃধ্নুতা তৎপ্রতিষেধব্যাপারো দ্বেষঃ লোভোমাৎসর্য্যমসাধারণ্যেন স্পৃহাপরস্য চৈতন্মাভূদ্বিভবোঽপ্যস্যাপীতি চিত্তধর্ম্মা এতে। অথবা চেতনা বৎস্থ স্ত্রীসুত সুহৃদ্বান্ধবাদিষু স্নেহো রাগঃ লোভোপোঽত চেতনস্য ধনাদিষু স্পৃহা। হৃদয়েন হৃদয়শব্দেন চিত্তমাচষ্টে। অনুজ্ঞানঞ্চ হৃদয়স্য প্রসাদঃ। এষাহি স্থিতিরন্তহৃদয়বর্ত্তীনি বুদ্ধ্যাদিতত্ত্বানি। যদ্যপি বাহ্যহিংসায়াংঽভক্ষ্য ভক্ষণাদিষু মূঢ়া ধর্ম্মবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে তথাপি হৃদয়াক্রোশনং তেষাং ভবতি। বৈদিকে ত্বনুষ্ঠানে পরিতুষ্যতি মনঃ। তদস্য সর্ব্বস্যায়মর্থঃ। ন ময়া তাদৃশো ধর্ম্ম উচ্যতে যত্রৈতে দোষাঃ সন্তি কিন্তু য এবংবিধৈর্মহাত্মভিরনুষ্ঠীয়তে স্বয়ঞ্চ যত্র চিত্তং প্রবর্ত্তয়তি বা। অত আদরাতিশয় উচ্যমানেষু ধর্ম্মেষু যুক্তা। এতদ্ধৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতইত্যনেনোচ্যতে। অথাপ্যয়ং ন্যায়ো "মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থাঃ" ইতি তদপ্যত্রৈবাস্তি। বিদ্বাংসোহ্যত্র নিষ্কামাঃ প্রবৃত্তিপূর্ব্বা অনিন্দ্যাশ্চ লোকে। অথাপ্রামানিকী প্রবৃত্তিঃ সাপি বেদপ্রামাণ্যাৎ সিদ্ধৈবেতি। সর্ব্বপ্রকারং প্রবৃত্ত্যাভিমুখ্যমনেন জন্যতে।

মেধাতিথি কৃত ভাষ্যের ব্যাখ্যা :—

বিদ্বান বলিতে শাস্ত্রদ্বারা সংস্কৃতমতি পুরুষগণকে বুঝায়। যাঁহারা প্রমাণ এবং প্রমেয় পদার্থের স্বরূপনির্ণয়কুশলী তাঁহাদিগকেই শাস্ত্রসংস্কৃতমতি পুরুষ বলা যায়। শাস্ত্র বলিতে বেদকে বুঝায়। সুতরাং যাঁহারা বেদার্থবিদ তাঁহারা বিদ্বান। প্রমাণ বলিতে বেদকে বুঝায় এবং প্রমেয় বলিতে পরব্রহ্মকে বুঝায়। অতএব, বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞানী

পুরুষ ব্যতীত, অপর কেহই প্রমাণ প্রমেয় বিজ্ঞান কুশল নহেন। এই কারণে বেদার্থবিদ ব্যক্তিই বিদ্বান; অপর নহে। কেন না, যিনি বেদ ব্যতীত অন্য স্থান হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করেন, তিনি বিপরীত প্রমাণ ও প্রমেয়গ্রহণহেতু অবিদ্বান বলিয়া গণ্য হন। ইহাই মীমাংসা ও তত্ত্ব অবলম্বনে নিশ্চিত হইয়াছে। সৎ বলিতে সাধুগণকে বুঝায়। যাঁহারা বেদ প্রমাণ অনুসারে, এই প্রমাণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থানুষ্ঠায়ী, এবং হিতপ্রাপ্তি ও অহিত পরিহারে যত্নবান, তাঁহারাই সাধু। হিত এবং অহিতদৃষ্টপদার্থও প্রসিদ্ধ। বিধি এবং নিষেধ লক্ষণবিশিষ্ট হিতাহিতই দেখা যায় না। এই বিধিনিষেধ লক্ষণবিশিষ্ট হিতাহিত যাহারা অনুষ্ঠান করে না, তাহারাই অসাধু বলিয়া গণ্য হয়। অতএব এইখানে বিদ্বান ও সাধু এই দুই শব্দের দ্বারা, জ্ঞান এবং অনুষ্ঠান উভয়কে বুঝাইয়াছে। সৎ শব্দ দ্বারা সৎকর্ম্মে বিদ্যমানতা বুঝাইয়াছে। ইহাই সেবানুষ্ঠানশীলতা। ভূতপ্রত্যয়দ্বারা অনাদিকাল যাবৎ এই সেবানুষ্ঠান-শীলতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। এই অষ্টকাদি ধর্ম্ম অর্ব্বাচীন-কালে কাহারও কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এই অষ্টকাদি ধর্ম্ম ব্যতীত, অপরাপর সমস্ত ধর্ম্ম অর্ব্বাচীনকালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কারণে এই শ্লোকে নিত্য শব্দ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যতদিন যাবৎ সংসার আছে ততদিন যাবৎই ধর্ম্মও আছে। বাহ্য ধর্ম্মগুলি বেদজ্ঞানহীন পুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া কিছুকাল সংসারে থাকে এবং তৎপর অন্তর্ধান হইয়া যায়। কখনও সহস্র সহস্র যুগব্যাপী হয় না। পক্ষান্তরে, এই ধর্ম্ম কোন কোন সময় সম্যকরূপ অজ্ঞানতা ও অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও, তৎক্ষয়ে নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। নির্ম্মল বলিয়াই এই ধর্ম্মের উচ্ছেদ হয় না। অদ্বেষরাগী শব্দটী ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তির দ্বিতীয় কারণ। এসকল কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাগদ্বেষ কথা দ্বারা লোভের উদয়

বুঝান হইয়াছে। রাগদ্বেষসম্পন্ন পুরুষগণ লোভী হইয়া থাকে। অনেকে ধনলোভে মন্ত্রতন্ত্রে প্রবৃত্ত হয়; অথবা রাগদ্বেষই লোভের অন্তর্ভুক্ত। নিজে যে ব্যক্তি উপার্জ্জন করিয়া, ভোগসুখে জীবনযাপন করিতে পারে না, সেই ব্যক্তি অনেক সময়ে সাধুচিহ্ন ধারণ করিয়া জীবন-ধারণ করে। ভস্মকপালাদি ধারণ, গৈরিকবসন পরিধান ইত্যাদি বুদ্ধি, পৌরুষহীন ব্যক্তিগণের জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ এই ভণ্ড-সাধুগণের প্রতি বিদ্বেষবশতই সাধুতার বিপরীত অনুষ্ঠান করেন। দ্বেষপ্রধান ব্যক্তিগণ তত্ত্বাবধারণে সমর্থ হয় না। এই কারণে, অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে। ফলতঃ, ইহাতেই অনেকে সমাজে প্রচলিত অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখিয়া এবং ভণ্ড সাধুগণের আধিক্য দেখিয়া, ধর্ম্মত্যাগ করিয়া বসে। এই সকল কারণে রাগ, দ্বেষ উভয়ই তত্ত্বাবধারণে প্রতিবন্ধক বলিয়া বুঝিতে হইবে। অবশ্য কেহ কেহ কিঞ্চিন্মাত্র শাস্ত্রজ্ঞান হেতু নিজেকে বিদ্বান মনে করিয়া, রাগদ্বেষমূলে বিপরীতানুষ্ঠান করে। অনেকে শাস্ত্র জানিয়াও, দ্বেষ্যব্যক্তির অনিষ্টকারণার্থ এবং প্রিয়ব্যক্তির উপকারার্থ, মিথ্যা সাক্ষ্যদান করিয়া অধর্ম্মের সেবা করে; তাহাদের বেদমূলকধর্ম্মানুষ্ঠানের শক্তি নাই, ইহা নিশ্চয়। পরন্তু রাগ লক্ষণবিশিষ্ট কারণান্তরের প্রভাব হেতু এই শ্রেণীর রাগদ্বেষসম্পন্ন পুরুষগণের আচরিত ধর্ম্মকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলা যায় না। এইখানে সৎকর্ম্মেমতি যাহার আছে তাহাকেই সাধু বলা হইয়াছে। যদি রাগদ্বেষবশতঃই কাহারও অধর্ম্মে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার সাধুতা কিরূপ? এইকারণে রাগদ্বেষ-বর্জ্জিত ব্যক্তিকেই এইখানে সাধু বলা হইয়াছে। তাহাতে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, রাগদ্বেষের অভাবই সাধুতা। সকলে রাগদ্বেষের অভাবের যোগ্যতাবস্থায় আসিয়া ইহাদের উচ্ছেদসাধনে সমর্থ হয় না। শ্রুতিও বলিতেছেন যে, শরীরধারী মনুষ্যের পক্ষে প্রিয়াপ্রিয়ভাব পরিত্যাগকরণে

সামর্থ্য দেখা যায় না। রাগ বলিতে বিষয়োপভোগ গৃধ্নুতা বুঝায়। আর এই গৃধ্নুতা দেখিয়া তাহা নিবারণের ইচ্ছাজনিত একটা বিরাগের নাম দ্বেষ। অসাধারণ লোভ ও মাৎসর্য্যসম্পন্ন ও স্পৃহাপর ব্যক্তি, যখন অপরের বিভব দেখিয়া তাহার এই বিভব না হউক, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করে, তখন এই চিত্তধর্ম্মকেই দ্বেষ বলা যায়। আর চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির স্ত্রী-পুত্র-সুহৃদ-বান্ধবাদিতে যে স্নেহ জন্মে, সেই স্নেহমূলে লোভের দ্বারা হতচেতন হইয়া, তাহার অধর্ম্মাদিতে যে স্পৃহা জন্মে তাহার নাম রাগ। হৃদয়শব্দ দ্বারা চিত্তকে বুঝায়। হৃদয়ের অনুজ্ঞান বলিতে চিত্তপ্রসাদকে বুঝায়। এই সকলই হৃদয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী বুদ্ধ্যাদির তত্ত্ব। যদিও অনেক সময় মূঢ়ব্যক্তিগণ ধর্ম্মবুদ্ধিতে বাহুহিংসা ও অভক্ষ্য ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি তাহাদের ভিতরে বিবেকের দংশন হয়। কিন্তু বৈদিক অনুষ্ঠানে মন পরিতুষ্ট হয়। ইহাই এই সকল কথার অর্থ। আমি এমন ধর্ম্ম বলিতেছি না, যাহাতে কোনও দোষ আছে। পরন্তু এবম্বিধ সাধুমহাত্মাগণ দ্বারা যাহা সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে এবং স্বয়ংও অনুষ্ঠান করিতে গেলে যাহাতে চিত্ত প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই বলিতেছি। মনুর এই সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, এই ধর্ম্ম সর্ব্বাবস্থায়ই আদরণীয়। অথবা হৃদয় বলিতে বেদকে বুঝায়। হৃদয় যখন ভাবনার অতীত হয়, তখনই সেই হৃদয়ে বেদ অবস্থিত হন। ইহা দ্বারা ইহাই উপপন্ন হইল যে, যদি কোনও ব্যক্তি আগ্রহের সহিত এই ধর্ম্ম অবিচারে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ইহা সঙ্গতই হইবে। হৃদয়ের প্রসাদ কথা দ্বারা এই কথাই বুঝান হইয়াছে। সুতরাং এইখানে এই ন্যায়ই প্রতিষ্ঠিত হইল যে, মহাজনগণ যে পথে গিয়াছেন তাহাই মানবের পথ। এই শ্লোকে বিদ্বান ইত্যাদি কথা দ্বারা নিষ্কাম প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ও লোকে-অনিন্দিত মনুষ্যগণকে বুঝাইয়াছে। তাঁহাদের যে সকল সাধু-

প্রবৃত্তি তাঁহাদের কর্ম্মের দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যদি কেহ বেদ-প্রমাণে না পান, তাহা হইলেও ঐ সকল প্রবৃত্তি বেদপ্রমাণসিদ্ধ। সর্ব্বপ্রকার সাধু প্রবৃত্তির অভিমুখী অবস্থার জনক বেদই বটে।

শাস্ত্রবিধিই ধর্ম্ম

ইহার নাম সাধ্বাচার। ইহারই ভিতরে সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতা রহিয়া গিয়াছে। ইহা ত্যাগ করিলে মানুষ দাস হয়। এই কারণে ম্লেচ্ছদেশে চিরদাসত্ব বিরাজমান। আমাদের দেশে স্বাধীনতা (Liberty) কথা প্রচলিত নাই, কারণ এই শব্দ অত্যন্ত ভ্রান্তি উৎপাদক। এই শব্দের দ্বারা স্বেচ্ছাচারই মানবের কর্ত্তব্য এইরূপ ভ্রান্তি হয়। অথচ স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারাই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বাধীনতা বলিতে ধনের মুক্তাবস্থাকে বুঝায়। ধন কাহারও হস্তে আবদ্ধ থাকিলে মানুষের স্বাধীনতা থাকে না। কর্ম্মঘটিত স্বাধীনতা (Liberty) একটা মিথ্যা কল্পনা। ক্ষুধা তৃষ্ণার অধীন মানব, এই স্বাধীনতা কখনও লাভ করিতে পারে না। ধন মুক্ত থাকিয়া যখন মাতার স্তন্যদুগ্ধের ন্যায় মানবের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করে, তখনই মানবসমাজে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধ্বাচারমূলে সমাজের মায়ামমতা দ্বারা ধনের বণ্টন হইয়া এই মাতৃ-স্নেহের কার্য্য হয়। কর্ম্মের উচ্ছৃঙ্খলতা ইহার চৌরবুদ্ধিবশতঃ ধনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, এই স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া দেয়। এই কারণে, এই বিশিষ্ট স্বাধীনতার নাম ধর্ম্ম। ইহা জগৎকে ধারণ করে বলিয়া, ইহার ন্যায় সাধনার বস্তু জগতে আর দ্বিতীয় নাই। নীতিশাস্ত্রে ইহার নাম অপ্রেরিত-হিতকর-নীতি; ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার নাম সাধ্বাচার বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, এবং গীতাতে ইহার নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। যথা—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাহপি চ তে ন প্রসিধ্যেদ কর্ম্মণঃ॥
গীতা তৃতীয়োঽধ্যায়, শ্লোক ৮

বঙ্গানুবাদ :—তুমি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর। কেন না, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীর-যাত্রাই নির্ব্বাহিত হইবে না।

শাঙ্করভাষ্যম :—যত এবমতঃ নিয়তমিতি নিয়তং নিত্যং শাস্ত্রোপদিষ্টম্। যো যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকৃতঃ ফলায়চাশ্রুতং তন্নিয়তং কর্ম্ম। তৎকুরুত্বম্। হে অর্জ্জুন! যতঃ কর্ম্ম জ্যায়োহধিকতরং ফলতঃ। হি যস্মাদ্কর্ম্মণোহকরনাদনারম্ভাৎ। কথং? শরীর যাত্রা শরীরস্থিতিরপি চ তে তব ন প্রসিধ্যেৎ প্রসিদ্ধিং ন গচ্ছেদকর্ম্মনোহকরণাৎ। অতো দৃষ্টঃ কর্ম্মাকর্ম্মনোরর্থ বিশেষোলোকে।

অতএব, নিত্য কর্ম্মের অর্থ মনুকথিত সাধ্বাচার বা শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম। এই কর্ম্মগুলি ইন্দ্রিয়-সংযমমূলে ধনকে মুক্ত রাখিয়া সর্ব্ব মানবের জীবিকা নিরাপদ করিয়া দেয়। এইজন্য শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বলিয়াছেন যে, "হে অর্জ্জুন, তুমি শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্যকর্ম্মগুলি সম্পাদন কর। তাহা হইলেই তোমার জীবিকা নিরাপদ [হইবে। অন্যথা সমাজে দারিদ্র্য ও বেকারসমস্যা আসিয়া তোমার শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যাঘাৎ ঘটাইবে।"

এই কথাগুলি না বুঝিয়াই আজকাল অনেকে গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম বুঝিতে পারে না। বস্তুতঃ এই সকল নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্দেশ্য সমাজে সুখশান্তি প্রতিষ্ঠাদ্বারা মানবের মুক্তির পথ পরিষ্কার করা। কেহ কেহ বলেন যে, অনেকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন না করিয়াই যখন ভগবৎ ভক্তি লাভ করিয়াছেন, তখন আমি কেন আচার পালন করিতে যাইব?

এইখানে ভ্রান্তি এই যে, যাঁহারা আচার পালন না করিয়াও ভগবৎ ভক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের দ্বারা বৈষয়িক কোন উন্নতি হয় না, হয়ত কেবল নিম্নস্তরের ভক্তিই লাভ হয়। পক্ষান্তরে আচারবান ব্যক্তির দ্বারা বৈষয়িক উন্নতি ও মুক্তি উভয়ের পথই পরিষ্কার হয়। এই জন্য শ্রীভগবান্ পুনরায় ১৬শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন :—

যঃ শাস্ত্রবিধিমৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিম্॥

অনুবাদ :—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পারিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করে, সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ সুখ বা মোক্ষ তাহার কিছুই হয় না।

বস্তুতঃ, সিদ্ধি দুই প্রকার। ইহলোকে ধনগত স্বাধীনতাজনিত সুখ, ও পরলোকে স্বর্গসুখ প্রথম শ্রেণীর সিদ্ধি, এবং মোক্ষ দ্বিতীয় শ্রেণীর সিদ্ধি। উভয় সিদ্ধি শাস্ত্রবিধি পালনের ফল। এই শাস্ত্রের নাম বেদ এবং আমাদের মন্বাদি স্মৃতি, বেদমূলক বলিয়া এই সকল স্মৃতিকেও শাস্ত্র বলা যায়। যথা :—

বেদোঽখিলোধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মন স্তুষ্টিরেব চ॥

মনু ২য় অধ্যায় ৬ শ্লোক।

অনুবাদ :—এক্ষণে ধর্ম্মে প্রমাণ কহিতেছেন, সমস্ত বেদ, বেদবেত্তা মন্বাদি স্মৃতি, তাঁহাদিগের ব্রহ্মণ্যতা প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার শীল, সাধুদিগের সদাচার এবং আত্মতুষ্টি এই সমুদয় ধর্ম্মে প্রমাণ হয়।

আত্মতুষ্টি শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভাষ্যকার মেধাতিথি বলিয়াছেন :—আত্মনস্তুষ্টিরেব চ ধর্ম্মমূলমিত্যনুষজ্যতে বেদবিদাং সাধুনামিতি চ। নৈব তেষামধর্ম্ম আত্মাপরিতুষ্যতি যথা বিষঘ্নীমেবৌষধী নকুলোদশতি নান্যম অত উচ্যতে নকুলো যাং যাং দশতি সা সা বিষঘ্নীতি।

অর্থাৎ আত্মতুষ্টি ধর্ম্মের মূল। ইহা দ্বারা বেদবিৎ সাধুগণের আত্মতুষ্টি বুঝাইয়াছে। অধর্ম্ম তাহাদের আত্মাকে তুষ্ট করিতে সক্ষম হয় না। যেমন নকুল বিষঘ্ন ঔষধকে দংশন করে, অন্যকে নহে। এইজন্য বলা হয়, যেখানে যেখানে নকুল দংশন করে, সেইখানে সেইখানে বিষঘ্নী-ঔষধ আছে; সাধুর আত্মতুষ্টিমূলে ধর্ম্ম নির্ণয়ও তদ্রূপ। এক্ষণে এই স্থলে প্রশ্ন হইবে যে, বেদ কাহাকে বলে এবং বেদবিৎ সাধু পাওয়া যাইবে কি প্রকারে? তদুত্তরে মেধাতিথি তাঁহার মনুভাষ্যে বলিয়াছেন:—"স বেদো বিশিষ্টঃ শব্দরাশিরপৌরুষেয়োঃ মন্ত্র ব্রাহ্মণাখ্যোঽনেক শাখাভেদ ভিন্নো।" অর্থাৎ মন্ত্র ব্রাহ্মণাখ্যানে আখ্যাত অপৌরুষেয় বিশিষ্ট শব্দরাশির নাম বেদ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই বেদ পারম্পর্য্য ক্রমাগত অসংখ্য সাধুমহাত্মার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া এই দেশে প্রচলিত হইয়াছে। কোনও পুরুষের এই ধ্বনি নহে বলিয়া এই বেদ ব্রহ্মবাক্য। ইহা অনেক শাখাভেদদ্বারা ভিন্ন বলিয়া অনন্ত। ইহাই ধর্ম্মের মূল। কেন না অপৌরুষেয় বলিয়া এই বেদ অভ্রান্ত। এই কারণে বেদার্থ অবগত হইয়াই ধর্ম্ম নির্ণয় করিবে। কিন্তু এই বেদ অচিন্ত্য ও অপ্রমেয়। ইহার কোনও কোনও শাখা এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং মন্ত্র সকলের অর্থবোধের জন্যও উপযুক্ত গুরু বর্ত্তমানে বিরল হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল যাঁহারা ইংরাজী শিখিয়া বেদের ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের প্রধান দোষ এই যে, সমাজের একটা সুখদায়ক অবস্থা তাঁহারা নিজের ইচ্ছানুরূপ কল্পনা করিয়া নেন এবং বেদের যে অর্থ তাঁহাদের এই কল্পনার অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা, সেই অর্থই তাঁহারা গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভারতের মঙ্গলচিন্তায় যেমন ইহাদের কথা অগ্রাহ্য, বেদার্থ গ্রহণেও তেমন ইহাদের কথা অগ্রাহ্য। পক্ষান্তরে, প্রাচীন বেদার্থবিদগণের এই দোষ না থাকায়,

পুরুষানুক্রমে আমাদের পিতৃপিতামহ, প্রাচীন বেদার্থবিদগণের কথা মান্য করিয়া সুখ-শান্তিতে এই দেশে বাস করিয়া গিয়াছেন। এই অর্থে স্মৃতিশাস্ত্রই বেদার্থবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এই সকল স্মৃতিমধ্যে আবার মনুস্মৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য। যিনি বহু বেদ শাখাধ্যায়ী শিষ্য ও বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ সহ বেদ আলোচনা করিয়া, বেদস্মরণমূলে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই মনুর স্মৃতিই এখন ব্যবহারিক হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

তথাপি বেদপাঠ কিংবা স্মৃতি আলোচনাদ্বারা সকলে ধর্ম্মনির্ণয় করিতে পারে না। কারণ বেদবিহিত কর্ম্ম ও স্মৃতি ব্যবস্থিত আচারে অভ্যস্ত ব্যক্তি সম্মুখে না থাকিলে, ব্যবস্থিত কর্ম্মে খুব অল্প লোকেরই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য সাধুগণ কর্ত্তৃক আচরিত কর্ম্মরাশি সম্মুখে রাখিয়া শীলবান সাধুকে প্রত্যক্ষ না করিলে, কাহারও বিহিত কর্ম্মে আস্থা থাকে না। আজকাল আমাদের শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে অনাস্থার ইহাই কারণ। এইজন্য সমাজে সাধু প্রস্তুত করাই বর্ত্তমানে আমাদের কর্ম্ম।

এই উদ্দেশ্যে স্মৃত্যুক্ত আচারসকল নিজ জীবনে পালন করিয়া, এই সকল আচার পালনের ফল ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে আমাদিগকে জড়বিজ্ঞান পরীক্ষার (Experiment) ন্যায় পরীক্ষা করিতে হইবে। সুখের বিষয়, এই পরীক্ষাও এই দেশে বহুকাল যাবৎ হইয়া গিয়াছে।

এই পরীক্ষায় দৃষ্ট হইয়াছে যে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়ও আমাদের পিতৃপিতামহ এই আচারগুলি যতদূর রক্ষা করিয়াছিলেন; তাহাই সমাজের মধ্যে একটা শক্তি সঞ্চিত করিয়া, আলেকজাণ্ডারের ন্যায় পাশ্চত্য জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহারথীকে প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই শক্তি মানবের মাতৃবৎ স্নেহাত্মকচরিত্রমূলক শক্তি। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম দ্বারা এই চরিত্র গঠিত হয় বলিয়া, ইহা যজ্ঞশক্তি এবং সত্যাদি ধর্ম্মমূলে এই শক্তি ফুটিয়া উঠে বলিয়া, ইহা চরিত্রশক্তি।

অতএব সমাজের চরিত্রশক্তিই শাস্ত্রবাক্যের অব্যর্থতা বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া বর্ত্তমানে আমাদিগকে শাস্ত্রোক্ত যোগ্যতার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বেদের অর্থ লইয়া বৃথা তর্ক যাঁহারা করেন, তাঁহারা এই যোগ্যতালাভের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করতঃ সমগ্র মানব-জাতির সর্ব্বনাশ করেন। যে অর্থে স্মৃতিতে ধর্ম্ম নির্ণয় হইয়াছে, সেই অর্থের অনুসরণ করিলেই দেখা যাইবে যে, স্মৃত্যুক্ত জাতিভেদের দ্বারা মানবসমাজে ধনের একটা মুক্তাবস্থা জন্মে এবং তাহাতেই প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীনতা জন্মিয়া, মানবসমাজ সুখী হয়। কার্য্যক্ষেত্রে যাহার প্রয়োগ নাই, তদ্রূপ বেদার্থ বিচার দ্বারা কেবল মূর্খের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন হয় মাত্র। এইরূপ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনকারীব্যক্তি বর্ত্তমানে জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, প্রকৃত পক্ষে অনাশ্রিত শূদ্র বা ম্লেচ্ছ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উপসংহার

অতএব যে সকল কর্ম্ম করিলে সংসারের প্রতি মানবের অজ্ঞান দৃষ্টিমূলক আমার-আমার ভাব ক্রমে দূর হইয়া, বিষয়রাশিকে দায় স্বরূপ জ্ঞান হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের দ্বারা সংসারের প্রতি দৃষ্টি পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া, ইহা মানবের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করে, আপতঃ মধুর কোনও কর্ম্ম নির্দ্দেশ করে না। এই কারণে বিধি ও নিষেধ লক্ষণবিশিষ্ট জ্ঞানদৃষ্টিকারক ধর্ম্ম ব্যবস্থার নাম শাস্ত্র। জ্ঞানী ও সাধু ব্যতীত অপর কাহারও সংসারের প্রতি জ্ঞানদৃষ্টি জন্মে না। আমাদের শাস্ত্র এই হেতুতেই সাধ্বাচারের সমষ্টি। বর্ত্তমান কালের আইনকানুন ও বিধিনিষেধ লক্ষণবিশিষ্ট। কিন্তু এই সকল বিধিনিষেধ সংসারের প্রতি জ্ঞানদৃষ্টিমূলক নহে। আইনকর্ত্তাগণ বিষয়রাশির প্রতি আমার-আমার বোধমূলে আইন সঙ্কলন করেন। পক্ষান্তরে শাস্ত্রকারগণ, স্বার্থ-সম্বন্ধ-বিহীন হইয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়য়াছেন। শাস্ত্রের সহিত আইনের প্রভেদ এইখানে। প্রভেদ নিতান্ত সামান্য নহে। স্বার্থপ্রেরিত আইনকানুন মানব সমাজে দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত করে এবং অপ্রেরিত-হিতকর শাস্ত্র ব্যবস্থা ইহার দ্বিবিধ মুক্তির পথ পরিষ্কার করে। অনেকে মনে করেন যে, শাস্ত্র ব্যবস্থায় স্ত্রী-শূদ্রের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা ভুল। দ্বিতীয় খণ্ডে এই কথা প্রমানিত করিয়া, জাতিভেদ ও নারী ধর্ম্মমূলে, কি প্রণালীতে মানবজাতির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা প্রমাণিত করা যাইবে। মানবের স্বাধীনতা ধনগত, ইহা কর্ম্মগত উশৃঙ্খলতা নহে। যে জ্ঞান লইয়া আমাদের ঋষিগণ এই ধনগত

স্বাধীনতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানমূলেই ভারত সমগ্র জগতের জ্ঞানের গুরু। ভারতবাসীর যদি কোন যোগ্যতা থাকে, তবে এই গুরুর আসন প্রাপ্তির যোগ্যতাই তাহার যোগ্যতা। কিন্তু সমগ্র জগত এখন ভারতের এই যোগ্যতা লাভের অন্তরায়। ভারতবাসীর পক্ষে জগতের সহিত যুদ্ধ করিয়া এখন এই যোগ্যতালাভ অসম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজ, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীকে এই যোগ্যতালাভে বাধা প্রদান না করার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সুতরাং সমগ্র ম্লেচ্ছদেশের মধ্যে ইংরেজই ভারতবাসীর একমাত্র প্রতিশ্রুত-বান্ধব। এই কারণে ইংরেজ রাজত্বে শান্তিতে বাস করিয়া, এই যোগ্যতার পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। ম্লেচ্ছদেশসুলভ যোগ্যতার পথ আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। কোন পরীক্ষায়ই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। দেশে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন মীমাংসা করিয়া, এই পরীক্ষায় আমরা কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। পরন্তু 'পঙ্কে পতিত গরুর ন্যায়' অনন্ত পাপ-পঙ্কেই ডুবিতে থাকিব। পক্ষান্তরে, সাধ্বচারমূলক যোগ্যতার পথে আমাদের এই অন্তরায় নাই। আমরা যদি আজ এই পথ অবলম্বন, করিয়া সাধ্বাচারের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যাই, তাহা হইলে পুরুষানুক্রমিক চেষ্টায় একদিন কৃতকার্য্য হইব। বিপরীত পথে চেষ্টা করিলে কখনই কৃতকার্য্য হইব না। এই পথ আমাদের সনাতন পথ। পিতৃপিতামহ এই পথে চলিয়া একদিন কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বপুরুষের কৃতকার্য্যতাই আমাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতেছে। আজিকালিকার উপন্যাস ও সাময়িক পত্রিকাগুলি পাশ্চাত্য জীবন-সংগ্রাম নীতির সংস্কাররাশকে, সমাজে এমন ভাবে বদ্ধমূল করিয়াছে যে, এই সকল সংস্কারকে ঠেলিয়া আমাদের পক্ষে শাস্ত্রের আলোক উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, শাস্ত্রগুলি যে

প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে এবং তাহাতে যেরূপ সংক্ষিপ্তভাবে তত্ত্বগুলি গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে, তাহাতে আজিকালিকার প্রচারপরায়ণ (Propagandism) প্রণালীতে অভ্যস্ত মনুষ্যের পক্ষে শাস্ত্রের আলোক হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। এইজন্য আমরা আমাদের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসকেও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখি। আমরা যে ইতিহাস পাঠ করি তাহা জীবনসংগ্রামের ইতিহাস। পক্ষান্তরে পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে যে ইতিহাস আছে, তাহা যজ্ঞ-বুদ্ধির সাধনার ইতিহাস। পারম্পর্য্য ক্রমাগত ধারায় পিতৃ-পিতামহ এই ইতিহাসকে যে ভাবে বুঝিয়াছেন, সেই ভাবটী হৃদয়ঙ্গম না হইলে, এই ইতিহাসও বিশ্বাস করা যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলা যায় যে, আমরা যে ইতিহাস পাঠ করি তাহা কতকগুলি মানুষের পশুশক্তির ইতিহাস। পক্ষান্তরে পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতে যে ইতিহাস আছে, তাহা একটা জাতির মনুষ্যত্ব সাধনার ইতিহাস। এই জন্য একের সহিত অপরের সামঞ্জস্য নাই। তুমি যদি মহাভারতের মধ্যে জীবনসংগ্রামের ইতিহাস চাও, তবে তুমি তাহা পাইবে না। পাইবে যুধিষ্ঠিরাদির ধর্ম্ম সাধনার চেষ্টা, ও দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক তদ্বিষয়ে বাধা প্রদান এবং তন্মূলক যুদ্ধের ইতিহাস। কাজেই ইহা বুঝিতে তোমার ভ্রম হয়। গ্রীক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, কোনও হিন্দু কখনও মিথ্যা কথা বলে, এমন কথা তিনি শুনেন নাই। তাঁহার ন্যায় বিদেশীয় পণ্ডিতের এই উক্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার সময়েও এই দেশে পাণ্ডব প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ্যের ভগ্নাবশেষ ছিল। ইহা লুপ্ত হইয়া এমন হইয়াছে যে, ত্রিবর্গ সাধন বা সংসার-সাধন বলিয়া কোনও পদার্থ ভারতবর্ষে ছিল, তাহাই কেহ বিশ্বাস করিতে চাহেন না। বস্তুতঃ আজকাল আমাদের চিন্তা শক্তির এমন হ্রাস হইয়াছে যে, যাহা পাশ্চাত্য ভাবের

সহিত মিলে না, তাহাই আমরা অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দেই। সৌভাগ্যক্রমে, মেগাস্থিনিস্ প্রভৃতি ভ্রমণকারীগণ, এই দেশের আর্য্য মহাত্মাগণের সংসার-সাধনার প্রমাণ দিতেছেন বলিয়া, আমাদের বুঝিবার পথ হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য-প্রণালী ব্যতীতও এই দেশে একটা স্বতন্ত্র সংসার-সাধনপ্রণালী ছিল। যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমূলে পূর্ব্বাপর এই দেশে এই সাধনপ্রণালী না থাকিত, তাহা হইলে মেগাস্থিনিস্ এই দেশের সমাজের এই অবস্থা দেখিতেন না। অনেকে বলেন যে, জাতি ভেদই আমাদের পরাধীনতার কারণ। কিন্তু যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে মেগাস্থিনিসের সময়ই আলেকজেণ্ডারের বিজয়ী বাহিনীর সমক্ষে হিন্দু তিষ্ঠাইতে পারিত না এবং মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে সিলিউকস্ পরাজিত হইয়া ভারত বিজয়ের আশা ত্যাগ করিতেন না। প্রকৃত কথা এই যে, মেগাস্থিনিসের সময়ে হিন্দুর যে চরিত্র ছিল, তাহার অনেক অধঃপতন মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে হইয়াছিল। কেন এইরূপ হইয়াছিল তাহার আভাষ পূর্ব্বে দিয়াছি। তুমি নিজের জীবনের দিকে চাহিয়া দেখ। দিনের মধ্যে এক সময়ে তোমার ধর্ম্মভাব বেশ জাগ্রত হয়; কিন্তু আর এক সময়ে তুমি কুচিন্তা ব্যতীত আর কিছুই কর না। সমাজও তদ্রূপ ভাবে উন্নত ও অবনত হয়। ফলতঃ দেশের ধর্ম্মবুদ্ধি লুপ্ত হইয়াই যে এইরূপ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমূলক সংসার-সাধন-প্রণালী মিথ্যা নহে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"এক পারে উদয় গিরি অপর পারে ললিত গিরি, মধ্যে স্বচ্ছ সলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। গিরি শিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে, সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত, ধান্য বা হরিৎ ক্ষেত্রে চিত্রিত, পৃথ্বী অতিশয়

মনোমোহিনী দেখা যায়। শিশু যেমন মায়ের কোলে উঠিলে মাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী দেখে, মনুষ্যও পর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি (বর্ত্তমান আল্‌তিগিরি) বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি (বর্ত্তমান নাল্‌তিগিরি) বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশে অট্টালিকা, স্তূপ এবং বৌদ্ধমন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দন বৃক্ষ, আর মৃত্তিকাপ্রোথিত ভগ্নগৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক, বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তর গঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই চারিটী কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল্ স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়। কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইন্‌বর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চিনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না।

আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিত গিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারি দিকে যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া হরিদ্বর্ণ ধন্যক্ষেত্র, মাতা বসুমতির অঙ্গে বহু যোজন বিস্তৃতা পীতাম্বরী শাড়ী। তাহার উপর মাতার অলঙ্কার স্বরূপ, তালবৃক্ষ শ্রেণী—সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ, সরল, সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীল সলিলা বিরূপানদী নীল-পীত-পুষ্পময় হরিৎ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া বহিতেছে, সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। তা যাক—চারি পাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর মূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল, এই দিব্য—পুষ্পমাল্যাভরণ ভূষিত,

বিকম্পিত চেলাঞ্চল প্রবৃদ্ধ-সৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলন স্বরূপ পুরুষ মূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপ-প্রেম-গর্ব্ব-সৌভাগ্য স্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা পীবর যৌবন ভারাবনত দেহা—

"তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণী প্রেক্ষনা নিম্ননাভিঃ—"

এই সকল স্ত্রী মূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষৎ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমার-সম্ভব, শকুন্তলা, পানিনি, কাত্যায়ণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক; এই সকলই হিন্দু-কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার? তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

সীতারাম ৪৬৩ পৃ

সমাপ্ত